রেনেসাঁস ও সমাজমানস

অরবিন্দ পোদ্দার

রেনেসাঁস ও সমাজমানস

উচ্চারণ  কলকাতা ৭০০০৭৩

Renaissance O Samajmanas : Arabinda Poddar

প্রথম প্রকাশ / ৬ আশ্বিন ১৩৭৭ ॥ ২৩ সেপ্টেম্বর ১৯৭০

প্রকাশক / রণজিৎকুমার দেব
উচ্চারণ ২/১ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট কলকাতা ৭০০০৭৩
প্রচ্ছদ / মলয়শঙ্কর দাশগুপ্ত
মুদ্রক / প্রিন্টস্মিথ ১১৬ বিবেকানন্দ রোড কলকাতা ৭০০০০৭

পূর্বকথা

বিভিন্ন সময়ে রচিত ও প্রকাশিত, একটি প্রবন্ধ অপ্রকাশিত, কয়েকটি রচনা বর্তমান গ্রন্থে সংকলিত হলো। বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্য পাঠকমাত্রেরই দৃষ্টিগোচর হবে ; এগুলোকে একই সঙ্গে সংগ্রথিত করার একমাত্র যুক্তি হলো—একই সময়-সীমায় রচনাগুলো প্রসারিত, যে সময়টাকে সচরাচর রেনেসাঁস-এর উন্মেষ, বিবর্ধন, পরিণতি বলে গ্রহণ করা হয়ে থাকে। এই বৈশিষ্ট্যের দরুণ সব ক'টি প্রবন্ধের মধ্যে ভাবগত সাদৃশ্য অথবা একই মনোভঙ্গির সাহিত্যিক স্ফুরণ, অথবা একই প্রশ্নের আলোড়ন লক্ষ্য করা যাবে।

যে সব পত্রিকা-সম্পাদক এবং গ্রন্থ-সম্পাদক ঐ প্রবন্ধগুলো রচনার জন্য আমাকে উৎসাহিত করেছিলেন, এই অবকাশে তাঁদের সকলকে আন্তরিক সাধুবাদ জানাই। আর সাধুবাদ জানাই প্রকাশক ও তাঁর সহকর্মীদের।

অরবিন্দ পোদ্দার

বিষয়সূচী

লেখকের অন্যান্য গ্রন্থ :

বঙ্কিম মানস

মানবধর্ম ও বাংলা কাব্যে মধ্যযুগ

রবীন্দ্র মানস

ইংরেজী সাহিত্য পরিচয়

উনবিংশ শতাব্দীর পথিক

রবীন্দ্রনাথ / রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব

আধুনিক বুদ্ধিজীবী ও সংগ্রামী চেতনা

রামমোহন / উত্তরপক্ষ

রবীন্দ্রনাথ / শতবর্ষ পরে

RENAISSANCE IN BENGAL :
Quests and confrontations

RENAISSANCE IN BENGAL :
Search for Identity

বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সহ

রবীন্দ্রনাথের কিশোর সাহিত্য

বাংলার রেনেসাঁস / চারিত্র বৈশিষ্ট্য

বাংলায় উনবিংশ শতাব্দীতে যে অভূতপূর্ব সামাজিক আলোড়ন নতুনভাবে ইতিহাসের গতিপথ নির্ণয় করেছিল, তাকে রেনেসাঁস আখ্যায় ভূষিত করা যায় কি যায় না এ প্রশ্ন আজও উত্থাপিত হয় এবং এর বিচিত্র অভিব্যক্তির গুণগত চরিত্র এখনও এক বিতর্কিত বিষয়। এই জিজ্ঞাসা ও বিতর্ক নিঃসন্দেহে বুদ্ধিমার্গীয় সজীবতার লক্ষণ; এর উৎস হলো চতুর্দশ, পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীর ইতালির অভিজ্ঞতার সঙ্গে পরিচয় এবং সেই সূত্র অনুসারে এর পর্যালোচনা। কিন্তু সমান্তরাল রেখানুগ চিন্তা আদর্শের অনুসরণে অথবা যুক্তি-বিচারে সর্বদা সুসমঞ্জস হয় না; কারণ, পরিবেশ ও সাংস্কৃতিক পশ্চাদপট এই দুই ক্ষেত্রে এক নয়, ভিন্ন ভিন্ন। তাছাড়া, উপস্থিত গরজেরও বিভিন্নতা প্রত্যক্ষ করা যায়; যার ফলে গুণগত তাৎপর্যে সম্পূর্ণ নতুন এক আন্তর সম্পর্কের উদ্ভব ঘটে। সুতরাং, ইওরোপ থেকে ভারতবর্ষে. অথবা ইতালি থেকে বাংলাদেশে, সাদৃশ্যের সমান্তরাল টানার যুক্তিধারা পরিহার করাই যুক্তিসম্মত; এবং বাংলার বিশিষ্ট, স্ব-মহিম, অভিজ্ঞতার উপরই আলোচনা নিবদ্ধ রাখা সঙ্গত। অবশ্য, আলফ্রেড ফন্ মারটিন-এর বিশ্লেষণ অনুসরণ করে এই অভিজ্ঞতাকে রেনেসাঁস-টাইপ[১] রূপে গ্রহণ করার কোনই আপত্তি থাকতে পারে না।

যে কোন দৃষ্টিমার্গ থেকেই হোক না কেন, এর মূল্যায়নের সময় একটি সহজাত বৈশিষ্ট্য—যা একে ইতালীয় অভিজ্ঞতা থেকে স্বতন্ত্র করে রেখেছে—সর্বদা স্মরণ রাখা প্রয়োজন। তা হল এই: মধ্যযুগের ইতালিতে যা সংঘটিত হয়েছিল তা হল একটি সজীব গতিশীল সভ্যতার উপর একটি মৃত সভ্যতার অভিঘাত, যার ফলে মানবিক অভিব্যক্তির বিভিন্ন ক্ষেত্রে নতুন নতুন ব্যাপ্তি অর্জনের অনুপ্রেরণা সে লাভ করেছিল। মানবিক বিবর্তনের ইতিহাসে এবংবিধ অভিঘাত অজানা নয়। অধ্যাপক টয়েনবী তাঁর 'এ স্টাডি অব হিষ্ট্রী' গ্রন্থে বিস্তৃত উদাহরণ সহ এ বিষয়টি নিয়ে পর্যালোচনা করেছেন। পক্ষান্তরে অষ্টাদশ শতকের শেষ দশক-গুলোতে এবং উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকগুলোতে বাংলাদেশে যা সংঘটিত হয়েছিল তা হল, গুণগত বৈশিষ্ট্যে স্বতন্ত্র প্রাচ্যের একটি সভ্যতার উপর পাশ্চাত্যের একটি গতিশীল সভ্যতার অভিঘাত; ঐ প্রাচ্য সভ্যতাটিকে যদি মৃত না-ও বলা যায়, বলতেই হয় অনড় ও গতিহারা। এই অভিঘাত ছিল

আগ্রাসনের, সামরিক বিজয়ের, অবশ্যম্ভাবী অচ্ছেদ্য ফলশ্রুতি। পরিশেষে, তা এমন এক অভাবনীয় সাড়া জাগিয়ে তোলে, এমন আশ্চর্য গতি ও প্রগতির পথ ধরিয়ে দেয় যা কি প্রাচ্যসমাজের রূপান্তরের নিয়ম, কি স্তব্ধ প্রশান্ত জীবন পদ্ধতি, কোন দিক থেকেই চিহ্নিত বা অবধারিত ছিল না।

একথা স্বীকার্য যে, সামরিক আগ্রাসনের মাধ্যমে সাংস্কৃতিক সংঘাত পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার বিশ্বজোড়া ব্যাপ্তির একটি অপরিহার্য অঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। বস্তুত, পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে যেসব সমাজ গতি হারিয়ে অবলুপ্তির পথে অগ্রসর হচ্ছিল, অথবা যে সব সমাজ আদিম উৎপাদন পদ্ধতি ও এর নির্দিষ্ট সীমায় নিশ্চিন্তে আবদ্ধ ছিল, সে সব সমাজে বিদেশী আক্রমণ রূপান্তরের প্রধান হাতিয়ার রূপে বিগত কয়েকশ' বছর ধরে ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করে আসছে। ঐসব সমাজ বিকাশের নিজস্ব সম্ভাবনাময়তা হারিয়ে ফেলেছিল, এবং নতুন প্রযুক্তিবিদ্যা ও উৎপাদন পদ্ধতি উদ্ভাবন না-করতে পেরে এক অবরুদ্ধ স্থিতাবস্থার মধ্যে অস্তিত্বের গ্লানি বহন করছিল। বাণিজ্যাভিসার, ধনতান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থা এবং সর্বশেষে সাম্রাজ্যবাদী বিস্তৃতির মাধ্যমে পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার যে বিশ্বজোড়া আধিপত্য তা আত্মপ্রতিষ্ঠার পথে অগণিত জাতি, দেশ ও গোষ্ঠীর জাতীয় চরিত্র ও স্বাধীনতা বিলুপ্ত করে দিয়েছে। কিছু সংখ্যক প্রাচীন সভ্যতা একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে, কোন চিহ্নই আর অবশিষ্ট নেই, আবার কোন কোন সভ্যতা ও জাতি নতুনতর প্রয়াস ও কর্মোদ্যমে সঞ্চালিত হয়েছে, অজানা অচেনা বিকাশের পথে ধাবিত হয়েছে, এবং পরিণামে পুনরায় আত্মপরিচয় এবং স্বাধীনতা অর্জন করেছে।

বিদেশী আগ্রাসন ও দস্যুতার পথে এক দেশের ধনসম্পদ কিভাবে দেশান্তরে চলাচল করেছে, কিভাবে, ঐ অবাঞ্ছিত পথেই, বিভিন্ন দেশের মধ্যে অচ্ছেদ্য আর্থনীতিক এবং এমনকি রাজনৈতিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে, এবং লুঠেরা "স্বদেশে" কিভাবে শিল্পবিপ্লব সংঘটিত হয়েছে, ব্রুক্স্ অ্যাডাম্স এই প্রক্রিয়ার বিশেষ সন্তোষজনক বিশ্লেষণ দান করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন, বণিকবৃত্তি কিভাবে তার সহযোগী দস্যুতা ও লুণ্ঠনের সাহায্যে আমেরিকার স্বর্ণ ইওরোপে হরণ করে নিয়ে আসে, এবং ব্যবসায় ও পণ্যবিনিময়ের মাধ্যমে তা ইওরোপ থেকে ভারতবর্ষ এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অন্যান্য দেশে সঞ্চিত হয়; এবং হাজার হাজার মানুষের গৃহকোণে লুক্কায়িত ঐ স্বর্ণই আবার কিভাবে বণিকদের জাহাজে ভর্তি হয়ে ইংল্যাণ্ডে ফিরে আসে, এবং শিল্পবিপ্লবের জন্য অতিশয়

জরুরী অর্থের যোগান দেয়।[২] কিন্তু ধনসম্পদের এবংবিধ চলাচল লুণ্ঠিত দেশগুলোকেও অভূতপূর্বভাবে নাড়িয়ে দিয়ে যায়। এভাবে ভারতবর্ষ সম্পর্কে মার্ক্স-এর একটি বিশেষ উক্তির অনুসরণে বলা যায়, ইওরোপের প্রাণবন্ত গতিশীল সভ্যতা প্রাচীন অবরুদ্ধ সভ্যতাগুলোকে উজ্জীবিত করার গরজে ইতিহাসের এক অচেতন হাতিয়ার রূপে আবির্ভূত হয়; সূত্রপাত হয় রেনেসাঁসের। অবশ্য, এই রেনেসাঁসকে তার ইওরোপীয় দোসরের স্বীকৃত বৈশিষ্ট্য থেকে স্বতন্ত্রভাবে বিচার করতে হবে।

আলোচ্য পর্বে বঙ্গদেশও একই রূপান্তর প্রবাহের মধ্য দিয়ে বিবর্তিত হয়েছে। ইওরোপের বিভিন্ন লুঠেরা-বণিক জাতিসমূহের, বিশেষত পর্তুগাল, ফ্রান্স, হল্যাণ্ড এবং ইংল্যাণ্ড, আগ্রাসন দিয়ে এর আরম্ভ এবং চূড়ান্ত পর্যায়ে ভারতবর্ষে বৃটিশ সাম্রাজ্যের পত্তনে এর পরিসমাপ্তি।

পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার মানুষেরা ভারতবর্ষে যে সভ্যতা ও জীবনধারায় সম্মুখীন হয়েছিল, তার এবং বিশেষ করে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধে বাংলার সমাজ-সংস্কৃতির চারিত্র্য বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে মতভেদের অস্তিত্ব ও কারণ থাকা সম্ভব। বিশেষত স্যার টমাস মুনরোর বহু উদ্ধৃত উক্তিটি যদি স্মরণে রাখা যায়। তিনি বলেছিলেন, "সভ্যতাকে যদি দু দেশের মধ্যে বিনিময় যোগ্য পণ্য হিসেবে গণ্য করা যায়, তাহলে আমি এবিষয়ে সুনিশ্চিত যে ইংল্যাণ্ড এই পণ্যটি আমদানী করে লাভবান হবে।" মুনরো নিশ্চয়ই বঙ্গদেশের ঐতিহ্যশীল শিল্প ও কারুশিল্প ইত্যাদির নিদর্শন দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন; এবং এখানকার বাসিন্দাদের জীবন সম্পর্কে অতি প্রশান্ত অনাসক্ত মনোভঙ্গির মধ্যে আবিষ্কার করে থাকবেন অপরিমেয় মাধুর্য। নব আবিষ্কারের এই বিস্ময়বোধ তাঁকে এই জিজ্ঞাসায় কখনও ব্যাকুল করেনি যে, এই সভ্যতা কেন 'আত্মপ্রকাশের নতুন দিগন্ত ও উপকরণের সন্ধান পায় নি। বস্তুত, ভারতবর্ষে, বিশেষত বাংলায়, কেন বাণিজ্যিক ধনবাদ প্রতিষ্ঠা লাভ করেনি তা এখনও সঠিক বিশ্লেষণের অপেক্ষা রাখে। কারণ, একথা সুবিদিত যে, বাংলার এবং মহারাষ্ট্রেরও, বণিক সম্প্রদায় আভ্যন্তরীণ ও বহির্দেশীয় বাণিজ্যের মাধ্যমে সুপ্রাচীন হিন্দু আমল থেকে সুরু করে মুসলমান আমল পার হয়ে বৃটিশ যুগের পূর্বাহ্ণ পর্যন্ত বিপুল ধনদৌলত সঞ্চয় করেছিল। বংশানুক্রমিক ভাবেই এই বাণিজ্য প্রবাহিত ছিল। তা ছাড়া, প্রাচীন কাল থেকেই ব্যবহারিক বিজ্ঞানচর্চার একটি ঐশ্বর্যশীল ঐতিহ্য বহমান ছিল; রসায়ন, গনিত, জ্যোতির্বিদ্যা ইত্যাদি বিজ্ঞানের চর্চা ছিল। অন্য কথায়,

সুস্থির ও স্বাভাবিক নিয়মে আধুনিক সভ্যতার অঙ্গাবরণ ধারণ করার ও উপকরণ বিকাশের বিষয়গত ও বুদ্ধিমার্গীয় পরিবেশের অস্তিত্ব এখানে ছিল। কিন্তু, তৎসত্ত্বেও কি কারণে তা ঘটল না, কেন বিজ্ঞান ও অর্থনৈতিক বিকাশ শুরু হয়ে গতি হারিয়ে ফেলল, ভারতবর্ষের সামাজিক ইতিহাসের এ একটি গুরুতর এবং অমীমাংসিত প্রশ্ন।

ভারতের তৎকালীন নিস্পন্দ অস্তিত্বকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে শ্রীঅরবিন্দ একে ভাটার লগ্নে অতীতের সর্বশেষ তলানি বলে গণ্য করতে বলেছিলেন, বলেছিলেন, জাতীয় মহত্বের জোয়ারের সঙ্গে সম্পর্কিত করেই কেবল এর তাৎপর্য উপলব্ধি করা সম্ভবপর।[৩] এই অভিমতের বিস্তৃত বিশ্লেষণ ও পরিপূরণ করতে গিয়ে তিনি অধ্যাত্ম সাধনার সূত্র দ্বারা নিয়ন্ত্রিত রেনেসাঁসের ঐশ্বর্যের কথা উল্লেখ করেছিলেন। জাতীয় ঐতিহ্যের প্রতি ভালবাসার দৃষ্টিকোণ থেকে এই মূল্যায়ন যুক্তিবহ হতে পারে। কিন্তু, তৎকালে অস্তিত্বশীল নৈতিক কলুষ ও সাংস্কৃতিক অবনমনকে যদি স্বীকার না করা হয় তাহলে ইতিহাসের ব্যাখ্যা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। ঐ কলুষ ও অবনমন অতিশয় প্রকট ছিল, এবং সামাজিক অস্তিত্বকে তা এমনভাবে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল যে বোধবুদ্ধিমননের দ্বার অবরুদ্ধ, জীবন গতিহীন, রূপান্তরের সম্ভাবনা নিঃশেষিত হয়ে পড়ে। এইরূপ পরিস্থিতিতে জীবনসাধনার লক্ষ্যও সমাজের রুদ্ধ-দ্বার কাঠামোর সঙ্গে পূর্ণ সঙ্গতি রেখে নিরূপিত হতে থাকে। সকলেই জানেন, অদৃষ্টবাদ, কর্মবাদ ইত্যাদি এবং নিষ্কাম নিস্পৃহভাবে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুর উপভোগ—এই আদর্শ একটা আত্মক্ষয়ী শূন্যতা ও হতচেতন মনোভঙ্গিকে লালন করে। বর্তমান লেখক অন্যত্র প্রাসঙ্গিক আলোচনায় প্রতিপন্ন করেছেন যে, জীবনসাধনার এই লক্ষ্য ব্যক্তির জীবন রূপায়ণে তার নিজস্ব ভূমিকাকেই কার্যত অস্বীকার করে।[৪]

রুদ্ধদ্বার বাংলা তথা ভারতবর্ষীয় সমাজের বুদ্ধিমার্গীয় ঐতিহ্য আগ্রাসী পাশ্চাত্যের বুদ্ধিমার্গীয় ঐতিহ্য থেকে গুণগত বিচারে ছিল সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। পাশ্চাত্য আদর্শকে বলা হয়েছে নির্বাধ, অভিজ্ঞতানির্ভর, গবেষণালব্ধ, আবার আধিবিদ্যকও বটে; তা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের নিয়ামক, এখনও পর্যন্ত অজ্ঞাত, সূত্রগুলোকে জানার জন্য উৎসুক। এডওয়ার্ড শিল্‌সের ভাষায়, এই ঐতিহ্যে একটি অস্মিতার অস্তিত্ব, সুনির্দিষ্ট অস্মিতার ভুবন স্বীকৃত; বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অচ্ছেদ্য অঙ্গ হওয়া সত্ত্বেও অস্মিতার এই ভুবন বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে অধিকার, পর্যালোচনা ও বুদ্ধিগত করার সময় আপন ভুবনের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করে চলে।[৫] পক্ষান্তরে,

ভারতীয় ঐতিহ্যের লক্ষ্য হলো, অস্মিতাকে বিনাশ করার জন্য সতত সচেষ্ট থাকা এবং সে পথে ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্লীন শক্তির সঙ্গে আত্মিক মিলনসাধন। বিশ্বচরাচরব্যাপ্ত সেই শক্তি সর্বত্র এবং জীবনের প্রতি পদক্ষেপে ক্রিয়াশীল। সেই ঐতিহ্য মানুষকে তার অস্মিতার ভুবন অস্বীকার করার শিক্ষাই দিয়ে এসেছে। ফলে, অবক্ষয়ের মুহূর্তে, কোন প্রকার সৃষ্টিশীল উদ্যম ও উদ্যোগ পরিকল্পিত ও গৃহীত হয়নি। এই সামগ্রিক জীবনদর্শনের সঙ্গে বর্ণপ্রথা শাসিত সমাজ কাঠামোর দুর্লঙ্ঘ্য অন্তরায়গুলোর কথাও স্মরণীয়। ঐ কাঠামো গ্রামীণ সমাজের উৎপাদন ব্যবস্থায় দায়দায়িত্বের বিভাগকে যুগ যুগ ধরে একই অপরিবর্তনীয় ভাবে উজ্জীবিত রেখে ব্যক্তিমানসে উদ্যমশীলতার স্ফুরণ ঘটতে দেয়নি, আর সমাজকেও দেয়নি রূপান্তর-ধর্মী গতিশীলতা। অথচ কালান্তরের মুখে উন্নততর সামাজিক পরিবেশ সৃষ্টির জন্য তার প্রয়োজন ছিল আত্যন্তিক। ভারতবর্ষে যথাসময়ে বাণিজ্যিক মূলধন এবং এরই পরিণতিতে শিল্পভিত্তিক ধনবাদ কেন বিবর্ধিত হয়নি, পূর্বোক্ত সমাজ-সাংগঠনিক বৈশিষ্ট্য সম্ভবত তার বহুবিধ কারণের মধ্যে অন্যতম। উৎপাদন ব্যবস্থার রূপান্তর হয়নি বলেই যুগোপযোগী সমাজ বিবর্তনও অনুপস্থিত।

এই সমাজই পাশ্চাত্যের আগ্রাসনের ফলে অকস্মাৎ তার চিরস্থির ঐতিহ্যের আশ্রয় থেকে উৎক্ষিপ্ত হয়; জীবনের নিরুপদ্রব প্রবাহ বিঘ্নিত হয়, মানবিক ভুবন হয় বিপর্যস্ত। এই আবর্ত এবং শ্বেতচর্মী আগন্তুকের আধিপত্যের নিরন্তর সচেতনতা থেকে আসে অনিবার্য সাড়া, যা রেনেসাঁস অভিধায় আখ্যাত।

॥ দুই ॥

ঔপনিবেশিকবাদ-সাম্রাজ্যবাদ বস্তুত এই রেনেসাঁসের অধিপতি বিধাতা। এর উৎপত্তি, বিবর্ধন এবং অবক্ষয়—সর্বস্তরেই ঔপনিবেশিকতার সর্বগ্রাসী পক্ষ সুবিস্তীর্ণ ছিল। বাণিজ্যিক দিক থেকে ভারতবর্ষকে যদৃচ্ছ শোষণ করার জন্য ঔপনিবেশিকতাবাদ-সাম্রাজ্যবাদ এদেশের ভৌগোলিক আকৃতিতে রূপান্তর ঘটায়, দেশের দূরদূরান্ত স্থলপথ, রেলপথ, ডাক-তার, ইত্যাদি ব্যবস্থার দ্বারা সংযুক্ত হয়; ফলে আবির্ভূত হয় এমন এক গতিশীলতা যা তৎকালীন সমাজ-মানসের নিকট ছিল সম্পূর্ণ অভূতপূর্ব। এই গতিশীলতা একদিকে যেমন দিগন্তপ্রসারী, অন্যদিকে তেমনি শীর্ষাভিমুখী; কেননা, বর্ণপ্রথা নিয়ন্ত্রিত বাধা-নিষেধ, বর্ণভেদে বৃত্তিভেদ, ইত্যাদি যেসব ঐতিহ্যবাহী অনুশাসন প্রচলিত ছিল,

তা গতির জোয়ারে ধীরে ধীরে অবলুপ্তির পথে অগ্রসর হয়। এর আত্যন্তিক গরজ বিপুল জনসমষ্টির পিতৃপুরুষের বাস্তুভিটা ত্যাগ এবং দেশের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে লোক চলাচলের প্রাত্যহিক ঘটনার মধ্যেও প্রত্যক্ষ। এই গতিশীলতাকে শোষণ ও বুদ্ধিমার্গীয় বশংবদতার ঔপনিবেশিক জোয়ালে আবদ্ধ করার জন্য বিদেশী শাসকগণ অবিলম্বে তার সর্বাধিক শক্তিশালী ও কার্যকর অস্ত্র প্রয়োগ করে—সেটা হলো ইংরেজি ভাষা। ইংরেজি ভাষাই হলো পাশ্চাত্ত্য সংস্কৃতির উপর থেকে নীচে গড়িয়ে পড়ার অবলম্বন।[৬] এই পথেই বিদেশী ভাবাদর্শ ও উদ্দীপনা সামাজিক প্রাঙ্গণের স্তরে স্তরে ছড়িয়ে পড়ার নিরন্তর প্রবাহ উৎপন্ন হয়, এই প্রবাহে ইংরেজি ভাষার আধিপত্য ছিল অনিবার্য ও অপরিহার্য। নবোদ্গত সমাজ-প্রগতির নায়কগণ প্রথমে অতিশয় কায়ক্লেশে ঐ ভাষায় অভ্যস্ত হয়ে ওঠে, পরে আসে সাবলীলতা, আরও পরে ঐ ভাষায় কথাবলায় বিকৃত আনন্দ; পরিশেষে স্বীকার করে নেয় এর প্রতি নিরঙ্কুশ বশংবদতা। বস্তুত, বাংলার রেনেসাঁস এমন এক ভাষায় অভিব্যক্তি লাভ করে যা তার স্বাভাবিক রক্তে-চেনা ভাষা নয়।

ইংরেজির এই সুপ্রতিষ্ঠিত প্রাধান্যের কয়েকটি স্তর উল্লেখ করা যাক: মেকলে তাঁর শিক্ষাবিষয়ক প্রস্তাবে (ফেব্রুয়ারী, ১৮৩৫) এভাবে প্রশ্নটি উত্থাপন করেছিলেন, "আমার মনে হয় সকল প্রশ্নের গোড়ার প্রশ্ন হল, কোন্ ভাষা শিক্ষা সর্বাধিক মূল্যবান?" স্বভাবতই তাঁর নিজস্ব পছন্দ ছিল ইংরেজি। এই ভাষা নির্বাচনের সমর্থনে তিনি লেখেন, "ভারতবর্ষে ইংরেজি হল শাসক শ্রেণীর মাতৃভাষা। সরকারী দপ্তরে এদেশের অভিজাত শ্রেণীর লোকেরা এই ভাষায় কথা বলেন। প্রাচ্যের সমগ্র সমুদ্র উপকূলে এই ভাষারই ব্যবসা-বাণিজ্যের ভাষা রূপে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সম্ভাবনা। ‥ আমরা আমাদের সাহিত্যের সহজাত উৎকর্ষতার কথাই বিবেচনা করি, কি এই দেশের বিশেষ পরিস্থিতির কথাই বিবেচনা করি, দেখা যাবে এই সিদ্ধান্তই যুক্তিপূর্ণ যে সমস্ত বিদেশী ভাষার মধ্যে ইংরেজিই হল আমাদের এ দেশীয় প্রজাদের নিকট সর্বাধিক উপযোগী।" বেন্টিঙ্ক মেকলের 'মনোভাব'-এর সঙ্গে সম্পূর্ণ ঐক্যমত প্রকাশ করেন, এবং পরে (মার্চ, ১৮৩৫) ইংরেজি শিক্ষার স্বপক্ষে লেখেন, "আমার অভিমত এই যে, ভারতবর্ষের অধিবাসীদের মধ্যে ইওরোপীয় সাহিত্য ও বিজ্ঞানের প্রসার বৃটিশ সরকারের লক্ষ্য হওয়া উচিত; এবং শিক্ষার জন্য বরাদ্দ করা সমুদয় অর্থ কেবলমাত্র ইংরেজি শিক্ষার জন্য ব্যয় করাই সর্বাপেক্ষা মঙ্গলজনক।"[৭] এভাবে

ইংরেজির উপর গোড়াতেই অত্যধিক গুরুত্ব আরোপিত হয়, এবং অচিরেই সামাজিক মনোভূমিতে এটা অনুভূত হতে থাকে যে, ইংরেজিতে পর্যাপ্ত ব্যুৎপত্তি ভিন্ন দায়িত্বপূর্ণ সরকারী পদে অধিষ্ঠিত হওয়া যাবে না।

যাদের জন্য পূর্বোক্ত এই ব্যবস্থা, সেই গ্রহীতাদের মধ্যে কিন্তু উৎসাহের কোনই ঘাটতি ছিল না। বেনিয়ান, করণিক, আগ্রাসন ও লুণ্ঠনে ইংরেজ বণিক ও আমলাদের এবং তাদের দেশীয় সহযোগীদের দালাল-গোমস্তাগণ অষ্টাদশ শতকের শেষ দিকেই ইংরেজি চর্চার ব্যবহারিক উপযোগিতার কথা উপলব্ধি করে; ইংরেজ পাদ্রীরা পরিকল্পিতভাবে তাঁদের শিক্ষা-কার্যক্রম চালু করার আগেই এখানে সেখানে ইংরেজি বিদ্যালয় গজিয়ে ওঠে। রামমোহন রায় ১৮২৩ সনে লর্ড আমহার্স্টের নিকট তাঁর ইতিহাস প্রসিদ্ধ চিঠিখানা লেখেন; তাতে তিনি সংস্কৃত শিক্ষাব্যবস্থাকে "অন্ধকারের" হাতিয়ার বলে নিন্দাবাদ করেন, এবং ইওরোপীয় জ্ঞানবিজ্ঞানের আলো বিকিরণের জন্য উদার ও উচ্চমনস্ক শিক্ষাব্যবস্থা প্রচলনের জন্য সুপারিশ করেন। বাংলা সংবাদপত্র "সুধাকর" মন্তব্য করেন, "সরকারের কর্তব্য দেশের সর্বত্র এমন উন্নতমানের শিক্ষার বীজ বপন করা যাতে অজ্ঞানতার অন্ধকার দূর হয় এবং মানুষ প্রশাসন ও অন্যবিধ সরকারী কার্যে যোগ্যতা অর্জন করে। এই উদ্দেশ্যে প্রতিটি গ্রামেই একটি করে ইংরেজি বিদ্যালয় স্থাপন করা প্রয়োজন।"[৮] বিদ্যাসাগরও সংস্কৃত কলেজের শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে সুপারিশ প্রসঙ্গে শতাব্দীর ষষ্ঠ দশকে শিক্ষা বিভাগের নিকট এক পত্রে বলেছিলেন, সংস্কৃত কলেজের ইংরেজি পাঠ্যক্রম এমন ভাবে নির্ধারিত হওয়া উচিত যাতে তা সংস্কৃত দর্শন শাস্ত্রাদির অশুভ প্রভাব সাফল্যের সঙ্গে প্রতিরোধ করতে সমর্থ হয়।

কলকাতা সহরে ইংরেজি শিক্ষার জন্য যে কল্পনাতীত চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছিল তার একটি অদ্ভুত চিত্র পাওয়া যায় রেভারেণ্ড ডাফের বিবরণ থেকে। তিনি রামমোহনের সহায়তায় ১৮৩০ সনে একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি লিখেছেন, "প্রস্তুতিপর্বের ব্যবস্থাপনার দিনগুলোতে সারাক্ষণ নেটিভদের মধ্যে উৎসাহ ছিল অফুরন্ত। রাস্তায় রাস্তায় তারা আমাদের পিছু নিতে থাকে। এমন কি আমাদের পাল্কীর দরজাগুলো ওরা খুলে ফেলত, এবং এমন করুণ কাকুতিভরা দৃষ্টিতে অনুনয় করতে থাকত যে পাষাণ-হৃদয়ও তাতে দ্রব হয়। অতি করুণ বিলাপের সুরে তারা তাদের অজ্ঞানতার কথা ব্যক্ত করত। তাদের চাই "ইংরেজি পাঠ", "ইংরেজি বিদ্যা"। তারা সর্বদা 'ইংরেজির' অর্থাৎ

ইংলিশম্যানের করুণার জন্য মিনতি জানাত ; আর নিরুপায় অজ্ঞ বাঙ্গালীদের শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে অত দূর দেশে আসার জন্য তারা আমাদের প্রশস্তি গাইত প্রাচ্যসুলভ অতিশয়োক্তির ভাষায়, যেমন—'সর্ববিধ কল্পনীয় ঐশ্বর্যের মহান ও অগাধ সমুদ্র'। তারপর ভাঙ্গা ভাঙ্গা ইংরেজিতে কেউ কেউ বলে উঠত, 'Me good boy, oh take me' ; others, 'Me poor boy, oh take me', some, 'Me want read your good books, oh take me' ; others 'Me know your commandments, thou shalt have no other gods before Me,—oh take me' ; and many by way of final appeal, 'Oh take me, and I pray for you'. আর চূড়ান্ত নির্বাচনের পরেও নতুন নতুন প্রার্থীর এমন নিরবচ্ছিন্ন চাপ ছিল যে সফল প্রার্থীদের জন্য ছোট লিখিত চিরকুট দিতে হয়েছিল। এবং বাইরের দরজায় দুজন লোক মোতায়েন রাখতে হয়েছিল, যেন নির্বাচিত প্রার্থীরা ছাড়া অন্যদের ঢুকতে না-দেওয়া হয়।'[৯]

এই অবিশ্বাস্য দৃশ্য যে কলকাতার একটি অঞ্চলেই অনুষ্ঠিত হয়েছিল তা অনুমান করার কোন কারণ নেই ; কল্পনাকে ঈষৎ বিস্তৃত করে কলকাতার অন্যান্য কেন্দ্রেও অনুরূপ দৃশ্যের চিত্র অঙ্কন করা যায়। ইংরেজি ভাষা আয়ত্ত করার এই উদ্ভট আগ্রহই সামাজিক ও রাজনৈতিক আচরণে ইংরেজ বশ্যতার মনোভঙ্গির জনক ; কালক্রমে তা-ই বিশেষ সহমর্মিতার বন্ধনে আবদ্ধ এক অভিন্নহৃদয় গোষ্ঠির আবির্ভাবকে সুগম করে তোলে।[১০] এই গোষ্ঠির বাইরে কোন অর্থবহ ভাববিনিময়ের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়নি, প্রচেষ্টাও অনুপস্থিত। এর কুষ্ট উদাহরণ (এবং শিক্ষনীয়ও বটে) পাওয়া যায় প্রথম আমলের জাতীয়তাবাদী নেতাদের আচরণে। শুধু কলকাতার টাউন হলেই নয়, গ্রামবাংলায় অনুষ্ঠিত রাজনৈতিক সমাবেশেও বক্তৃতাদি করা হত মুখ্যত ইংরেজি ভাষায়। রাজনৈতিক চেতনা বিস্তারে ইংরেজি বক্তৃতা যে কত অযৌক্তিক ও ব্যর্থ, তা উপলব্ধি করা সম্ভব হয়নি ; এবং এ চেতনারও বিকাশ ঘটে নি যে, জননায়ক ও জনগণের মধ্যে শুধু ভাষাগত কারণেই ভাব বিনিময়ের ক্ষেত্রে বিরাট ব্যবধান থেকে যাচ্ছে। যারাই এই ব্যবধান দূরকরণের চেষ্টা করেছেন তারাই উপহসিত হয়েছেন, যেমন ১৮৯৭ সনে অনুষ্ঠিত নাটোর প্রাদেশিক সম্মেলনে রবীন্দ্রনাথ। কয়েকজন যুবকের একটি দলকে সঙ্গে নিয়ে তিনি ইংরেজির বদলে বাংলায় সম্মেলনে বক্তৃতাদি করার দাবীতে সোচ্চার হয়েছিলেন।

তাতে অতিশয় বিরক্ত হয়ে কংগ্রেসের প্রথম সভাপতি উমেশচন্দ্র ব্যানার্জী নাকি মন্তব্য করেছিলেন, রবীন্দ্রনাথ ত ওরকম বলবেনই, কারণ তিনি তো ইংরেজি তেমন ভাল জানেন না![১১]

এই ঘটনার মধ্যেই রেনেসাঁসের অন্তর্লীন বাধ্যবাধকতার সূত্র নিহিত। এর আত্ম-উন্মোচন ঘটেছে সাম্রাজ্যবাদ নিরূপিত নিয়ন্ত্রণ রেখার সীমায় থেকে, অভিব্যক্তি লাভ করতে হয়েছে রক্তের মাধ্যমে পাওয়া নয় এমন ভাষায়, বিবর্তিত হয়েছে ভারসাম্যহীনভাবে, উপর থেকে নীচে। এই অস্বাভাবিক উন্মেষ ও উল্লাসের যে স্বাভাবিক বিকৃতি ও বিপদ, তা সব অবশ্যই এর অঙ্গাবরণ।

সে যাই হোক, ইংরেজি শিক্ষাব্যবস্থার প্রচলন হওয়ায়, বিবর্তনের প্রত্যাশিত নিয়মেই, কিছু দিনের মধ্যেই শিক্ষা ও আইন সংশ্লিষ্ট পশ্চিমী ধাঁচের মর্যাদাসম্পন্ন এবং অর্থকরী বৃত্তির দ্বার উন্মুক্ত হয়; আর ঔপনিবেশিক আর্থনীতিক কাঠামোর পরিধি সুবিস্তৃত হতে থাকায় এবং দেশীয় ব্যবসাবাণিজ্য পাশ্চাত্ত্যের অবয়ব ধারণ করায় সহর ও সহরে জনসমষ্টির আবির্ভাবও অনিবার্য হয়ে ওঠে। এই জনসমষ্টির কেন্দ্রবিন্দুতে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অবস্থান। নব-উন্মেষিত, ইংরেজিভাষী এই শ্রেণী বাণিজ্য ও সরকারী পর্যায়ে ইংরেজ প্রভুদের আস্থা ও নির্ভরশীলতার স্তম্ভ। পাশ্চাত্ত্য জ্ঞানবিজ্ঞান ও বাণিজ্য পদ্ধতির বাধ্যবাধকতা থেকে উদ্‌ভূত এই মধ্যবিত্ত শ্রেণী বাংলার সমাজজীবনে সম্পূর্ণ অভিনব, সনাতন ঐতিহ্যবাহী সমাজে এদের কোন স্বীকৃত পূর্বপুরুষ নেই। পূর্বতন সমাজের পণ্ডিত-বুদ্ধিজীবিগণ ব্রাহ্মণ্য সমাজের স্বীকৃত অভিজ্ঞতার মধ্যে বিচরণ করত; পক্ষান্তরে নতুন মধ্যবিত্ত শ্রেণী ও তার সন্তান বুদ্ধিজীবীর দল শৃঙ্খলমুক্ত, স্বাধীন, ব্রাহ্মণ্য সমাজের প্রতি তাদের আনুগত্যের কোন প্রশ্নই নেই। আর ইতিহাসেরও সাক্ষ্য এই, এবং বিশ্বজোড়া মানব অভিজ্ঞতায় এটা পরীক্ষিত সত্য যে, এরূপ একটি শ্রেণীর অস্তিত্ব ব্যতিরেকে রেনেসাঁস অথবা সমাজ সংস্কার কোন আন্দোলনই বাস্তবায়িত হয় না।

॥ তিন ॥

এই শ্রেণী এবং এই শ্রেণীর সন্তানগণই বাংলার রেনেসাঁসের স্থপতি। একথা বলা বাহুল্য যে, ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদী কাঠামোর বিধায়কদেরই তারা পিতা, অভিভাবক ও পথপ্রদর্শক বলে গ্রহণ করে। সরকারী প্রতিবেদনেও

এই মনোভঙ্গি স্বীকৃতি লাভ করে; যেমন, সি, ই, ট্রেভেলিয়ানের উক্তি: তারা "আমাদের গণ্য করে তাদের স্বাভাবিক অভিভাবক ও শুভানুধ্যায়ী রূপে, তাদের সকল আকাঙ্ক্ষার বড়ো আকাঙ্ক্ষা হল আমাদের মত হওয়া।"[১২] পরবর্তী কালের মন্টেগুচেমস্‌ফোর্ডের ভারতের শাসনসংস্কার বিষয়ক প্রতিবেদনের (১৯১৮) ১৩৭ নং ধারায় বলা হয়, "তাদের প্রতি আমাদের দায়দায়িত্ব অতি পরিষ্কার, কারণ বুদ্ধিমার্গীয় দৃষ্টিকোণ থেকে তারা আমাদেরই সন্তান। আমরা তাদের সম্মুখে যে ভাবাদর্শ তুলে ধরেছি, তারা তা-ই আত্মগত করেছে। তাদের এই কৃতিত্ব আমাদের পক্ষে অবশ্যই স্বীকার্য।"

এক একটি পরিবার ধরে বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, উনবিংশ শতাব্দীর কলকাতায় যেসব পরিবার ধনগরিমা ও সামাজিক আভিজাত্যের আসনে প্রতিষ্ঠিত ছিল এবং যাদের সন্তানগণ প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের সংঘাত থেকে নতুন এক সংস্কৃতি নির্মাতা রূপে আবির্ভূত হয়, তাদের সকলেরই ঐশ্বর্য ও আভিজাত্য ঔপনিবেশিক শাসন কাঠামোর দৌলতেই সৃষ্ট হয়েছিল। শুধু তাই নয়, ঐ কাঠামো তা সংরক্ষণ এবং বিবর্ধনেও সহায়তা করেছে। তাদের দৃষ্টিতে সাম্রাজ্যবাদ ছিল এক অবিনশ্বর করুণাময় শক্তির উৎস; এর শক্তিতে শক্তিমান হয়েই তারা ইতিহাসের ভাগ্যবিধাতার ভূমিকায় নিজেদের প্রতিষ্ঠিত দেখতে পায়। কয়েকটি উদাহরণ পুনরায় স্মরণ করা যাক। শোভাবাজারের রাজা নবকৃষ্ণ, পাইকপাড়ার গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ, দর্পনারায়ণ ঠাকুর, কুমারটুলির গোবিন্দরাম মিত্র, খিদিরপুরের গোকুলচন্দ্র ঘোষাল, এবং কালীপ্রসন্ন সিংহের পূর্বপুরুষগণ যথাক্রমে ক্লাইভ, রেভেনিউ বোর্ড, হুইলার, ইংরেজদের কলকাতার জমিদারি এস্টেট, ভেরেল্‌স্ট এবং মিডলটন ও র‍্যামবোল্ডের দেওয়ান ছিলেন।[১৩] তাঁরা সকলেই হয় জমিদারি কিনেছিলেন নতুবা ইংরেজ প্রভুদের নিকট থেকে উপহার স্বরূপ পেয়েছিলেন; কালক্রমে এইসব বংশের উপরই চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের আশীর্বাদ বর্ষিত হয়। বাংলার সাবেকী ব্যবসায়ী পরিবারগুলো—যেমন, বসাকরা, শেঠরা, মল্লিকরা, লাহারা, দত্তরা—ইংরেজ প্রবর্তিত ব্যবসা-বাণিজ্যের মাধ্যমে প্রভূত অর্থসঞ্চয় করে, এই ব্যবসা এতই আকর্ষণীয় ও লাভজনক ছিল যে, এমনকি চাকুরিতে নিয়োজিত ব্যক্তিরাও ঠিকাদারি, ইজারাদারি ইত্যাদির মাধ্যমে স্বর্ণমৃগয়ায় প্রমত্ত হয়।

সমাজসংস্কার এবং বুদ্ধিমার্গীয় আলোড়নে যারা অংশগ্রহণ করেছিল, তাদেরও এই একই ইতিহাস। রামমোহন ইংরেজ সাহচর্যে, বিশেষত অবাধ

বাণিজ্যবাদী ইংরেজদের সহযোগী রূপে বিত্তসঞ্চয় করেন, জমিদারি ক্রয় করে জমিদাররূপে আত্ম-প্রতিষ্ঠা অর্জন করেন। অবাধ বাণিজ্যবাদীদের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা এতই প্রগাঢ় ছিল যে ১৮২৮ সনে তিনি তাদের কমার্সিয়াল এণ্ড প্যাট্রিয়টিক এসোসিয়েশনের সহ-কোষাধ্যক্ষ এবং কার্যনির্বাহক সমিতির সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথের পিতামহ দ্বারকানাথ ইংরেজ বণিক ও শিল্পোদ্যোগীদের সহযোগিতায় কী বিপুল ধনসম্পদের অধিকারী হয়েছিলেন তা সকলেরই জানা। ডিরোজিও শিষ্যদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রতিভাবান এবং সোচ্চার বুদ্ধিজীবীরা ঔপনিবেশিক শাসনব্যবস্থায় সম্মানজনক পদে অধিষ্ঠিত ছিল। তাদের মধ্যে কেউ কেউ—যেমন রামগোপাল ঘোষ—খাদ্যশস্যের ব্যবসা করে বিত্তশালী হন। ইংরেজি শিক্ষা তাদের ক্ষেত্রে ছিল মর্যাদাসম্পন্ন চাকুরি ও সামাজিক ইজ্জতের দ্যোতক। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মুখ্য দুই বৃত্তি ও অবলম্বন—জ্ঞানচর্চা ও বাণিজ্য—তাদের ঔপনিবেশিক শাসকগোষ্ঠীর ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে নিয়ে যায়। স্বভাবতই, ইংরেজ শাসনকে বিধাতার আশীর্বাদ স্বরূপ গণ্য করা তাদের নিকট ছিল অতিশয় বাস্তব ও ব্যবহারিক জীবনচেতনার ফসল।

এই পরিবেশে ঔপনিবেশিক শিক্ষাব্যবস্থা বিস্ময়কর সফলতা অর্জন করে; যা প্রত্যাশিত ছিল, ঘটল অচিরেই। মেকলে তাঁর প্রতিবেদনে লিখেছিলেন, "লক্ষ লক্ষ মানুষ যাদের আমরা শাসন করি তাদের এবং আমাদের মধ্যে সেতুবন্ধের কাজ করার জন্য এক শ্রেণীর মানুষ সৃষ্টি করার জন্য আমাদের যথাসাধ্য করা উচিত, যে মানুষেরা রক্ত ও ত্বকের পরিচয়ে হবে ভারতীয় কিন্তু রুচি, মতাদর্শ, নীতিবোধ এবং প্রজ্ঞায় হবে ইংরেজ।" মেকলের ঘোষণাটি অবশ্য পাঁচ বছর বিলম্বে উচ্চারিত হয়েছিল। কারণ, ১৮৩০ সনেই ডিরোজিও-শিষ্যগণ আত্মপরিচয়ে এ কথা বলেছিল, "জন্মসূত্রে হিন্দু কিন্তু শিক্ষা ও আনুষঙ্গিক বিষয়ে ইওরোপীয়, তাদের মনোভঙ্গি প্রচারের জন্য প্রয়োজন একটি মাধ্যমের, একটি ফলকের, যাতে তাদের চিন্তাধারা লিপিবদ্ধ করা সম্ভব হবে।"[১৪] এইরূপ পরিবেশে রামমোহন এবং তাঁর সহযোগী বন্ধুবর্গ যে ভারতে অধিকসংখ্যক ইওরোপীয়ের স্থায়ী বসবাসের জন্য কলোনাইজেশন তত্ত্ব প্রচার করবেন, তা একান্তই স্বাভাবিক।

সি. ই. ট্রেভেলিয়ান ইংরেজ-নির্ভর সমাজ ও ব্যক্তিদের আন্তর গরজ খুব সুন্দর উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন; লিখেছিলেন, "যাদের মতাদর্শ ইংরেজি ছাঁচে ঢালাই হয়েছে তাদের নিকট আমরা যতটা প্রয়োজনীয় যে আমাদের

প্রজাদের অন্য কোন অংশের নিকট তা নয়। এরা বিশুদ্ধ দেশী (নেটিভ) রাজের পক্ষে বিলকুল অকেজো।"[১৫] শতাব্দীর ষষ্ঠ দশকে বৃটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন বৃটিশ সরকারকে এই বাস্তব সত্য অনুধাবনের জন্য অনুরোধ করে যে, সাম্রাজ্যের চিরস্থায়িত্বের স্বার্থেই মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে "সেফ্‌টি-ভাল্‌ব" বা রক্ষাকবচ রূপে লালন করা উচিত। এর সঙ্গে অমৃতবাজার পত্রিকার (তখন ছিল বাংলা সাপ্তাহিক) এই মন্তব্য সংযুক্ত হলে এদের পরিচয় পূর্ণ হয়—"এ দেশের সৌভাগ্য অনেক অংশে এই শ্রেণীর লোকের উপর নির্ভর করে। যদি কোন কালে এদেশে কোনরূপ সামাজিক কি অন্য কোন বিপ্লব হয়, ইহাদের দ্বারাই তাহা সম্পাদিত হইবে। এখন দেশেতে যত রূপ শুভসূচক কার্যের উদ্যোগ হইতেছে তাহা ইহাদের দ্বারাই প্রতিষ্ঠিত, সুতরাং এই মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়কে রক্ষা ও পোষণ করা দেশহিতৈষী রাজার অতি কর্তব্য।" (৯ ডিসেম্বর, ১৮৬৯)[১৬] শাসক সম্প্রদায় থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া তাদের নিকট ছিল কল্পনাতীত। প্রসঙ্গত স্মরণ করা যেতে পারে, বঙ্কিমচন্দ্র কিভাবে 'আনন্দমঠ'-এর দ্বিতীয় সংস্করণ থেকে বারবার এর পাঠ বদল করে প্রমাণ করতে চেয়েছিলেন যে এটা আদৌ ইংরেজবিরোধী উপন্যাস নয়; এর মূল উপজীব্য ইতিহাসের সত্য সন্ন্যাসী বিদ্রোহ। অথচ, ইতিহাসের ছাত্রমাত্রেই জানেন এ দাবি কত অযৌক্তিক, কত অ-সত্য। রেনেসাঁসের একশ' বছরের সম্মোহ অতিক্রান্ত হওয়ার পর রবীন্দ্রনাথকেও আমরা তাঁর সামন্ত-সাম্রাজ্যবাদী সম্পর্কের অবস্থানগত বন্ধন ছিন্ন করতে না-পারায় ব্যর্থতার দরুণ প্রায়শঃই দুঃসহ মর্মপীড়ায় ছিন্নভিন্ন হতে দেখেছি।

বর্তমান বিশ্লেষণের মাধ্যমে যে তর্কাতীত বিষয়টির উপর গুরুত্ব আরোপ করা হচ্ছে তা হল, সাম্রাজ্যবাদের ছত্রছায়ায় আশ্রিত রেনেসাঁসের এই নায়কগণ তাদের আবির্ভাবের লগ্নেই দেশীয় সমাজের সঙ্গে অন্বয়ের সূত্রগুলো হারিয়ে ফেলে এবং কোনদিনই তা আর সম্পূর্ণ পুনরুদ্ধার করতে পারেনি। পাশ্চাত্য সংঘাতের আবর্তে তারা "একটি সমাজের অন্তর ভেদ করে উদ্‌ভূত হয় কিন্তু অপর সমাজে তাদের কোন স্বীকৃত অবস্থান ছিল না। তারা ছিল সমাজে হিন্দু-বিরোধী বিস্ফোটক।"[১৭] ফলে, তাদের জীবনচর্যা ও গণজীবনের মধ্যে সংযোগ ছিল যৎসামান্য; আর যে সংস্কৃতি তারা নির্মাণে ইচ্ছুক ছিল তা আদর্শে লক্ষ্যে আনুগত্যে ছিল বিসদৃশ। তারা বিচরণ করত নিজস্ব স্বতন্ত্র ভুবনে; তাদের দৃষ্টিতে অজ্ঞ জনসাধারণকে যেমন তারা প্রভাবিত করতে পারেনি, তেমনি

কোনভাবে প্রভাবিত হয়ওনি। পাশ্চাত্য ভুবনের প্রতি আনুগত্য অবশ্যই অতিশয় প্রখর ও প্রকট ছিল; এ যুগেও এত প্রকট যে এডওয়ার্ড শীল্‌স্‌ তাচ্ছিল্যের সঙ্গে মন্তব্য করেছিলেন, লণ্ডন, অক্সফোর্ড ও ক্যামব্রিজের বুদ্ধিমার্গীয় সাম্রাজ্যের একটি প্রদেশ—অতীতে এই ছিল ভারতবর্ষের পরিচয়, এখনও তাই আছে।[১৮] বিদেশী রাজধানীর সংস্কৃতি এই নতুন শ্রেণীর সংস্কৃতি; বিভিন্ন শাখা প্রশাখায় বিস্তৃত এর বিচিত্র কর্মে ঐ সংস্কৃতিরই প্রতিবিম্বিত স্বাক্ষর।

॥ চার ॥

সুতরাং এই রেনেসাঁসও সংস্কৃতি বৈশিষ্ট্যে সহুরে এবং এর বিচরণ ভূমিও সহর ও সহরতলী।

এর উন্মোচন ও বিবর্ধনের সঙ্গে কলকাতা সহরের ঐতিহাসিক বিবর্তনে অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত। পণ্য লেনদেনের একটি অখ্যাত গঞ্জ থেকে ক্রমে এক বিপুল ঐশ্বর্যশালী আন্তর্জাতিক মহানগরীতে রূপান্তরের পথে কলকাতা বাংলার সাংস্কৃতিক জীবনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। ওয়ারেণ হেষ্টিংসের আমল থেকেই সর্বোচ্চ রাজস্ব অধিকর্তার অফিস ছিল কলকাতায়; এখানেই স্থাপিত হয়েছিল সুপ্রীম কোর্ট। তাই স্বাভাবিকভাবেই কলকাতা হল ইংল্যাণ্ডের ভারত-সাম্রাজ্যের রাজধানী। কিন্তু, কলকাতার রূপান্তর ও বিস্তৃতির ফলে বাংলার একদা-সমৃদ্ধ নগর ও সংস্কৃতির কেন্দ্রভূমি যথা ঢাকা, মুর্শিদাবাদ ও শান্তিপুর-নবদ্বীপ ইত্যাদির ধ্বংস অনিবার্য হয়ে পড়ে। অষ্টাদশ শতাব্দী শেষ হতে না হতেই ঐসব স্থানের পণ্যসামগ্রীর বাজার পড়ে যায়, এবং স্থানিক গুরুত্বও হ্রাস পেতে থাকে। ঢাকার জনসংখ্যা অস্বাভাবিক কমে যায়, মুর্শিদাবাদের পথঘাট গাড়ি ঘোড়া চলার পক্ষে অনুপযুক্ত হয়ে ওঠে, এবং নবদ্বীপের টোলের সংখ্যাও আশ্চর্যজনকভাবে কমে যায়। আর ঐ সময় অথবা পরে নগরায়ণের কোন সুষ্ঠু পরিকল্পনা গ্রহণ না করায় বাংলাদেশে একটিমাত্র নগরই বিবর্ধিত ও স্ফীত হতে থাকে। সেজন্য, কলকাতা ও কলকাতাওয়ালাদের প্রতিদ্বন্দ্বী স্বরূপ বিকল্প কোন নগর বা সাংস্কৃতিক কেন্দ্র গড়ে ওঠেনি।

সুতরাং, এই পরিস্থিতিতে যা অবধারিত তাই ঘটে। বাংলার সাংস্কৃতিক কেন্দ্রবিন্দু কলকাতায় স্থানান্তরিত হয়; কলকাতার ঐতিহাসিক বিবর্তনের বৈশিষ্ট্যের দরুণ এ ছাড়া অন্য কিছু হতেও পারত না। এশিয়াটিক সোসাইটি

প্রতিষ্ঠা এবং ইওরোপীয় পণ্ডিতবর্গ ও শাসনকর্তাদের কেউ কেউ প্রাচ্যবিদ্যায় অনুরাগী হয়ে ওঠার ফলে হিন্দু শাস্ত্রাদিতে পারঙ্গম পণ্ডিতগণও কলকাতার প্রতি আকৃষ্ট হতে থাকেন। তাঁরা সায়েবদের সংস্কৃত পড়ানো, ভাষ্য রচনায় এবং অনুবাদ কার্যে তাদের সহায়ক রূপে প্রতিষ্ঠিত হন।

কিন্তু একথা বলা কোনরূপেই সঙ্গত হবে না যে সংস্কৃত সাহিত্যের পুনরাবিষ্কার এবং এর বিস্ময়কর ঐশ্বর্য সম্পর্কে পাশ্চাত্ত্যের অভিনব চেতনা বাংলার রেনেসাঁসের ধ্রুপদী পটভূমির আত্যন্তিক চাহিদা পূরণ করে। না, তেমন কোন পটভূমি নির্মিত হয়নি। পাশ্চাত্ত্যের প্রাচ্যবিদদের সংস্কৃত সাহিত্য মন্থন অথবা পাশ্চাত্ত্য-ভাবাপন্ন দেশীয় বুদ্ধিজীবীদের প্রাচীন সাহিত্যের প্রতি ফ্যাকাশে মমতা সত্ত্বেও আত্মপরিচয়ের তেমন কোন কিশলয় উদ্‌গত হয়নি। অবশ্য হওয়ার কোন সম্ভাবনাও ছিল না। আগেই বলা হয়েছে, এই রেনেসাঁসের প্রবাহ শীর্ষবিন্দু থেকে নিম্নাভিসারী হয়েছে; ফলে, তা একান্তভাবে পাশ্চাত্ত্যের কণ্ঠস্বরে ও কলেবরে পরিচিত হতে চেয়েছে। গৃহ প্রত্যাবর্তনের চেতনা জাগ্রত হতে হতে একশ বছর কেটে গেছে।

কলকাতার নগরজীবনে গোড়া থেকেই প্রবল পশ্চিমী হাওয়া। বস্তুত, প্রেয়োবাদী জীবনচর্চার এমন উপকরণ-প্রাচুর্য তখন শুধু বাংলা কেন ভারতবর্ষের অন্য কোন স্থানের অধিকারে ছিলনা। ইন্দ্রিয়-সংবেদ্য জীবনের পক্ষে যা কিছু প্রয়োজনীয়—সান্ধ্য পার্টি, পাশ্চাত্ত্য সঙ্গীত, নৃত্য, ভোজ, অবাধ মেলামেশা ইত্যাদি—তা সবই কলকাতায় অনায়াসলভ্য ছিল। আবার কলকাতাই ছিল প্রগতিশীল ও সর্বাধুনিক ইওরোপীয় চিন্তার কেন্দ্রস্থল। এখানে বসবাস করেই ঔপনিবেশিক বুদ্ধিজীবীর দল লণ্ডন অথবা প্যারীর নাগর জীবনের আস্বাদ লাভ করেছে। অপরপক্ষে, এখানেই ধর্মীয় ও সমাজ-সংস্কারের প্রথম আবেদন উচ্চারিত হয়েছে; প্রথমে রামমোহন, পরে বিদ্যাসাগর সমাজ জীবনে গতি সঞ্চার করতে সমর্থ হয়েছিলেন। এখানেই, যথাসময়ে, স্বাধীনতার প্রথম সঙ্গীত ধ্বনিত হয়েছিল। ভারতে বৃটিশ সাম্রাজ্যের রাজধানী, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের নির্বাধ কেন্দ্র, বুদ্ধি মার্গীয় ঘাত-সংঘাত, ইত্যাদি আলোড়নের অন্তরালে কলকাতাতেই যুগপৎ ধনসম্পদের আভিজাত্য ও চিন্তা-মননের আভিজাত্য সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। ফলে, এখানকার জীবনধারার স্রোতে যারাই অবগাহন করেছে তাঁরা সম্মোহিত না-হয়ে পারে না। তাদের অস্থিমজ্জায় তাই শুধুই কলকাতা, একচ্ছত্র কলকাতা। নগর-কেন্দ্রিক মনন তাদের বরাবরের বৈশিষ্ট্য।

এভাবে, ভাবাদর্শ সঞ্চারিত গতিশীলতা দূর দূরান্তরে ছড়িয়ে দেওয়ার বদলে কলকাতা তার হৃদস্পন্দনকে সহরের প্রান্ত সীমার মধ্যেই আবদ্ধ করে রাখে। শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে বিভিন্ন সাময়িক পত্রে এই মর্মবেদনা প্রকাশিত হয়েছে যে, কৃত্রিম উপায়ে সৃষ্ট অভাববোধ ও বিলাসচেতনার উদ্ভব ঘটায় কলকাতার আশেপাশে অবস্থিত গ্রামগুলো তাদের আভ্যন্তরীণ সংহতি হারিয়ে ফেলছে এবং পূর্বতন মূল্যবোধগুলোও ধ্বসে পড়ছে; অথচ পাশ্চাত্ত্য প্রভাবের সীমার বাইরে অবস্থিত গ্রামে সনাতন মন্থর জীবনযাত্রা ও প্রশান্তি তখনও বিরাজিত।[১৯] কলকাতা নগরের চৌহদ্দিতে অবশ্য ঐ নতুন উদ্দীপনা সামাজিক কাঠামোর বন্ধনগুলোকে ছিন্নভিন্ন করছিল। মানুষ জাত খোয়ানো বা সামাজিক ভাবে একঘরে হওয়ার আশঙ্কায় ভীত না-হয়ে যে কোন প্রকার পেশা বা আচরণে অভ্যস্ত হয়ে উঠছিল। তথাকথিত নীচু জাতের লোকেরা ব্রাহ্মণের নিরঙ্কুশ অধিকার আত্মস্থ করে অধ্যাপনা ও শাস্ত্রীয় সূত্রের ভাষ্য রচনা করছিল। আর, নীচু জাতের দাসত্ব গ্রহণ করায় ব্রাহ্মণেরও কোন সংকোচ বা বিবেক দংশন অনুভূত হয়নি। এই অভাবনীয় গতিশীলতার স্পন্দন দূরবস্থিত গ্রাম বাংলা অনুভব করেনি। তাছাড়া পাশ্চাত্ত্য ভাবাদর্শে গঠিত অভিন্ন হৃদয় কোন স্বতন্ত্র গোষ্ঠীও সেখানে আত্মপ্রকাশ করেনি। তাই, এই রেনেসাঁসের পক্ষে বৃহত্তর পরিসরে সুপ্রাচীন সমাজ-কাঠামোর মধ্যে রূপান্তরের স্পর্ধা নিয়ে অনুপ্রবেশ করা সম্ভবপর হয়নি; এর জীবনাদর্শ, ব্যক্তিক আচরণ ও সমাজধর্মের ধ্যানধারণাকেও কোনভাবে প্রভাবিত করা সম্ভব হয়নি।

॥ পাঁচ ॥

সাংস্কৃতিক কেন্দ্রবিন্দু স্থানান্তরিত হওয়ার ফলে ঐতিহ্যের সঙ্গে আত্মিক যোগসূত্র যেমন ছিন্ন হয়, তেমনি এই নব জাগরণের নাগর চারিত্র্যও ঘনীভূত হয়। কিন্তু এই স্থানান্তরের গতি যদি কলকাতা পর্যন্ত এসেই স্তব্ধ হত তা হলে আশঙ্কার কারণ থাকত না; হয়নি, কলকাতার সাংস্কৃতিক কেন্দ্রবিন্দু লণ্ডনে স্থানান্তরিত হয়, এবং সেখানে স্থিতিশীলতা অর্জন করে। এই একটি মাত্র ঘটনাই বাংলার রেনেসাঁসের যাবতীয় বৈসাদৃশ্য, বিকৃতি, অস্বাভাবিকতার উৎস। এ সম্পর্কে অন্যত্র আমি যা বলেছি তার পুনরাবৃত্তি করে বলি, এই রেনেসাঁ আত্মপরিচয়ে দীন, মানসজীবনে প্রবাসী, গণজীবনের প্রতি নির্মমভাবে উদাসী ও নির্বাক।

সে যাই হোক, এই বৈসাদৃশ্যের মধ্যেও কিছু কিছু রূপালি রেখার অস্তিত্ব ছিল, তা অস্বীকার করার মত নয়। নতুন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সন্তানগণ পাশ্চাত্যের ভাবাদর্শগুলো গ্রহণ করেছে বিস্ময়কর ঐকান্তিকতায় ও চিৎপ্রকর্ষের উজ্জ্বলতায়। সনাতন বন্ধনগুলো একে একে ছিন্ন হওয়ায় ব্যক্তিমানস বলিষ্ঠ পদক্ষেপে ঐ ভুবনকে আবিষ্কার, আত্মগত করার সাহসিক অভিযানে অগ্রসর হয়। সে অভিযান এমনই পৌরুষ-দক্ষতায় আকর্ষণীয় ছিল যে প্রসন্নকুমার ঠাকুর তাঁর 'রিফর্মার' পত্রিকায় লিখতে পেয়েছিলেন (২ নং, ১৮৩১), "স্বাধীনতা ও সত্যের প্রভাব দূরবিস্তারী হয়েছে, এবং তা ক্রমেই ব্যাপকতর বিস্তৃতি অর্জন করছে; কোন কিছুই এর গতি প্রতিহত করতে সমর্থ হবে না। ..... যুক্তির আলোক-প্রদর্শিত পথে আমরা এই আত্মশ্লাঘাপূর্ণ সম্ভাবনার দ্বারপ্রান্তে এসে উপস্থিত হয়েছি যে, শীঘ্রই আমরা সভ্যতার সেই স্তরে উপনীত হব যা ইওরোপীয় জাতিসমূহের সমৃদ্ধি প্রতিষ্ঠা করেছে।"[২০] সেই অভিযানের সাফল্যের জন্য স্বাধীনতা ও সত্যের পূজারীদের আনুকূল্য প্রার্থনা করা হয়েছে। এই শ্রেণীর একজন কৃতবিদ্য সন্তান কী দুর্লভ মানসিক উৎকর্ষের স্বাক্ষর স্থাপন করতে পারতেন তা বঙ্কিমচন্দ্রের 'রজনী' উপন্যাসের অমরনাথের ব্যক্তিত্বে পরিস্ফুট। অমরনাথ শেক্সপীয়র ও কালিদাসের মত কবি, টেসিটাস-থুসিডাইডিস্-প্লুটার্কের মত গ্রীক ইতিহাসকার, কোঁৎ-মিল-হাক্সলি-ডারউইন-ওয়েন-শোপেনহাউআর এর মত দার্শনিক ও প্রকৃতিবিজ্ঞানী সম্পর্কে আশ্চর্য দক্ষতা ও পাণ্ডিত্যের সঙ্গে আলোচনা করতে পারত। এই তালিকায় উল্লেখিত পণ্ডিতবর্গের নাম-গৌরবেই কলকাতার নতুন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বুদ্ধিমার্গীয় আত্মপরিচয় নিহিত।

কিন্তু এমন মানুষের সংখ্যা স্বভাবতই ছিল খুবই কম; তারা নিজেরাই ছিল স্বতন্ত্র এক শ্রেণী—দেশীয় সমাজ থেকে উদ্ভিন্ন হলেও এর নাগালের বাইরে, দূরবর্তী। আধুনিক পরিভাষায় বলা যায়, এরা ছিল অনন্বিত। অনন্বয় যে দেশের প্রবাহিত জীবন ও মানুষের সঙ্গে এক নেতিবাচক সম্পর্ক তা বলাই বাহুল্য। বিশেষ স্থান-কাল-সমাজে জন্মগ্রহণ একজন মানুষকে যে আত্মগৌরবে সমৃদ্ধ করে, অনন্বয়ে তা বিলুপ্ত হয়; পরিবর্তে, কৃত্রিম উপায়ে বিবর্ধিত সম্পর্কগুলোকে মৌল সহজাত সম্পর্কের চাইতে অধিকতর মূল্যবান ও ঘনিষ্ঠ বলে চিহ্নিত করে। একশ' বছরের অভিজ্ঞতার পর রেনেসাঁসের তৃতীয় প্রজন্মের নায়কদের উপলব্ধিতে এই সত্য ধরা পড়ে। তীব্র আত্মধিক্কারে বিপিনচন্দ্র পাল লিখেছেন, "আমাদের ব্যক্তিত্ব বিদেশী টবে গঠিত হয়েছে, না ঠিক টবেও না,

অকিডের মধ্যে। আমাদের পৌরুষ বারান্দায় ঝুলিয়ে-রাখা ব্যক্তিত্ব, আমাদের জাতি ও জীবনের কর্মপ্রবাহে, আমাদের পিতৃপুরুষদের সনাতন ঐতিহ্যে এর কোনই শিকড় নেই। ......আর সর্বাপেক্ষা মর্মান্তিক ব্যাপার এই যে তা (ইংরেজি শিক্ষা) আমাদের মন, আমাদের হৃদয়, আমাদের আত্মা, আমাদের ব্যক্তিত্ব এবং আমাদের পৌরুষকে আমাদের জাতীয় জীবন থেকে রেখেছে বিচ্ছিন্ন করে।"[২১] দাসত্বের বন্ধনসঞ্জাত এই আত্মগ্লানির মধ্যে গভীর সত্য নিহিত। সাম্রাজ্যবাদী শাসন ব্যবস্থার বাধ্যবাধকতা থেকে উৎসারিত এই রেনেসাঁস গণজীবনকে কোন স্বীকৃতি দান করেনি, তাদের জীবন প্রবাহ থেকে কোন রস আহরণ করেনি। এর ফলে এবং গুণগত তত্ত্ব বিচারে এ বিকৃত ও আত্মক্ষয়ী হতে বাধ্য। আমি অন্যত্র প্রাসঙ্গিক আলোচনায় লিখেছিলাম, ইংল্যাণ্ড এই রেনেসাঁসের স্তন্যদায়ী ধাত্রী (ওয়েট নার্স) হওয়ায় এ ক্ষেত্রে ভারতবর্ষের মাটিতে ভিন্ন কলেবরে নতুন এক ইংলিশ রেনেসাঁস।[২২] মনে হয় এই সিদ্ধান্তের যৌক্তিকতা অনস্বীকার্য।

বোধবুদ্ধি মনন চিন্তাকল্পনার এমন আত্মক্ষয়ী সর্বগ্রাসী দাসত্বের নজির ভারতবর্ষের ইতিহাসে খুঁজে পাওয়া যাবে না। বুদ্ধিমার্গীয় দাসত্বের প্রলেপ আজও অম্লান। সেজন্যই এই রেনেসাঁস কোনদিনই, এডওয়ার্ড শিল্সের ভাষায়, স্বয়ম্ভু বা স্ব-নির্ভর শক্তি রূপে[২৩] সক্রিয় হতে পারেনি, আজও স্বপ্রতিষ্ঠ নয়।

কলকাতায় রামমোহনের কালে

রামমোহন রায় যদিচ ১৮১৪ সালের পর থেকে স্থায়ীভাবে কলকাতায় বসবাস শুরু করেন, তথাপি উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ত্রিশ-বত্রিশ বছর পর্যন্ত বিস্তৃত কালকে বাংলার সাংস্কৃতিক বিকাশের ক্রম অনুযায়ী রামমোহনের কাল বলে চিহ্নিত করা যায়। কারণ, ঐ সময়েই কলকাতা তাঁর চিন্তা মনন কর্ম ও ব্যক্তিত্বের দাপটে সচকিত হয়ে উঠেছিল। আর, তার অন্তরঙ্গ ও বহিরঙ্গ উভয় জীবনেই লেগেছিল এক অচিন্ত্যনীয় রূপান্তরের স্বাদ।

আধুনিক ইতিহাসের লীলাভূমি ঐ সময়ের কলকাতাকে শুধু একটি সম্প্রতি-সংগঠিত স্থানের নাম, একটি নিছক ভৌগোলিক বিন্দু যা বনজঙ্গল ধানক্ষেত কলাবাগান ফুলবাগান পুষ্করিণীর গ্রাম্যতা ধাপে ধাপে কাটিয়ে সহরে পরিণত হচ্ছিল, শুধু এই পরিচয়ে তার তখনকার কল্লোলিনী সত্তা উপলব্ধি করা যাবে না। কালের প্রেক্ষিতে, বহিরঙ্গের ঐ স্থূল পরিচয়টা যথেষ্ট নয়। বরং যদি বলা যায়, তখনকার কলকাতা একটি অভিনব সত্তা, একটি অস্থির অনুভব, বহুধা তাড়িত একটি চঞ্চল বিস্ময়—তাহলে বোধ করি তার আন্তর গরজের কাছাকাছি পৌঁছানো যাবে। সেই কবেকার পঞ্চান্ন গ্রামের স্মৃতি আর তাকে লজ্জিত করে না; গোবিন্দপুর, কলকাতা, সুতানুটি—এই ত্রি-ধারার স্মৃতিও তখন যায় যায়। শুধু একটিমাত্র নাম—কলকাতা—দেশ বিদেশের গণ্ডি অতিক্রম করে বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়ছে। আর, গ্রাম থেকে সহরে রূপান্তরিত হওয়ার মুখে গ্রামীণ জীবনযাপনে অভ্যস্ত মানুষের কাছে তখনও পর্যন্ত অজানা অচেনা এক বস্তুর (লটারির) সাহায্যে অর্থ সংগ্রহ করে তার পথঘাট বাড়িঘর আলো আর জলনিকাশী ব্যবস্থা ইত্যাদি উন্নয়নের পরিকল্পনা রচিত হচ্ছে। হতে থাকবেও সময়ের সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করে।

এ হেন কলকাতায় তখন এক নতুন আলোর বিকীরণ হচ্ছিল; এবং সেই বিকীরণ বহু দেশের বহু বিচিত্র মানুষের পদসঞ্চারে কল্পিত হচ্ছিল। অষ্টাদশ শতকের মাঝামাঝি, যখন হলওয়েল কলকাতার জমিদার ছিলেন, বিবিধ জাতিগত পেশার ভিত্তিতে কলকাতাকে বিভিন্ন এলাকায় বিভক্ত করা হয়েছিল। কিন্তু, ক্রমেই একটি বিশ্বব্যবস্থার চাপে জাতিগত বৃত্তির সীমা লঙ্ঘন করে মানুষ যে কোন পেশায় যে কোন ব্যবসায়ে আত্মনিয়োগ করতে থাকে।

ফলে, হলওয়েল কৃত সেই জাতিভিত্তিক এলাকা নির্ধারণ স্থায়ী হতে পারল না। রামমোহনের আমলে বাংলার পরিচিত জাতিগুলো ছাড়া ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আগত নানান জাতি ও বর্ণের লোক সমাগম তো ছিলই, আরও ছিল ফরাসী, ইতালীয়, জার্মাণ, ইহুদী, মার্কিণ, এমনকি কিছু সুইডিশ নাগরিকের আসা যাওয়া। ছিল আফ্রিকা, মধ্য এশিয়া এবং চীন থেকে আগত ভাগ্যান্বেষীর দল। এমনি ভাবে কলকাতা অঙ্গে ধারণ করে অদৃষ্টপূর্ব অঙ্গাবরণ, কণ্ঠে অশ্রুতপূর্ব কাকলী, এবং হৃদয়স্পন্দনে অননুভূতপূর্ব অনুভব।

অন্য কথায়, কলকাতা সহরে রূপান্তরিত হয়ে প্রায় এক লাফে আন্তর্জাতিক নগরীরূপে বিবর্তিত হয়। হয়ে ওঠে পাশ্চাত্য ভুবন থেকে প্রাচ্য ভুবনে আসা যাওয়ার এক অপরিহার্য কেন্দ্রবিন্দু।

॥ ২ ॥

বলা বাহুল্য যে, এই আসা যাওয়ার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল স্বর্ণমৃগয়া। বাণিজ্যিক লেনদেনের মাধ্যমে কলকাতা-কেন্দ্রিক বাংলা দেশের ধনসম্পদ দেশদেশান্তরে তো যাচ্ছিলই, ঔপনিবেশিক শাসনব্যবস্থা কায়েম হওয়ার পথে অন্যবিধ উপায়েও ঐ লুণ্ঠনের ব্যবস্থা দৃঢ়তর হয়। এবং এই সামগ্রিক লুণ্ঠনের ব্যবসায়ে দেশী বেনিয়ানদের ভূমিকাও নগণ্য ছিল না। অধ্যাপক এন, কে, সিংহ তাঁর "দ্য ইকনমিক হিস্ট্রি অব বেঙ্গল" গ্রন্থে মিসেস্ কে নাম্নী জনৈক ইংরেজ মহিলার একটি চিঠির উল্লেখ করেছেন। তাতে বেনিয়ানদের সম্পর্কে তিনি লিখেছেন, **"The banians outbid each other. One says. 'master had better take me, I will advance five thousand'; another offers seven and perhaps a third ten thousand."** এভাবে পূর্বতন সমাজে মর্যাদাহীন, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের পরিশীলনহীন অকস্মাৎ গজিয়ে-ওঠা এক শ্রেণীর মানুষের হাতে প্রভূত ধনসম্পদ সঞ্চিত হতে থাকে।

ইতিমধ্যে নবপ্রবর্তিত ভূমিব্যবস্থার মধ্য দিয়ে ইংরেজ যেসব নতুন জমিদার সৃষ্টি করেছিল এবং যারা ছিল ঔপনিবেশিক শাসন ব্যবস্থার দেশীয় স্তম্ভস্বরূপ তারাও কলকাতায় জাঁকিয়ে বসেছে। পরিসংখ্যান থেকে জানা যায়, ১৭৯৩ সালের পর থেকে জমিদারদের ঝোক আর উত্তরোত্তর এমন আকর্ষণীয়ভাবে বৃদ্ধি পেতে থাকে যে, যাদেরই হাতে কোন-না-কোন ভাবে উদ্বৃত্ত অর্থ সঞ্চিত হতে থাকে তারাই তালুক বা জমিদারি কেনার জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে পড়ে, এবং জমিতে

অর্থলগ্নীর পরিমাণ অতিশয় বৃদ্ধি পায়। শোভাবাজারের দেব-পরিবার, জোড়াসাঁকো ও পাথুরিয়াঘাটার ঠাকুর পরিবার, বড়বাজারের বসাক পরিবারের কথা এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়। রামমোহন রায়ও গোবিন্দপুর, রামেশ্বরপুর, কৃষ্ণনগর, লাঙ্গুলপাড়া, শ্রীরামপুর প্রভৃতি স্থানে পাঁচ-ছয়টি ছোটখাটো জমিদারি ক্রয় করেছিলেন। কলকাতায় তাঁর একাধিক বাড়ি ছিল। নব-ধনিকদের মধ্যে জমিদাররূপে প্রতিষ্ঠিত ও সামাজিক মর্যাদা অর্জনের আকাঙ্ক্ষা কিরূপ প্রবল ছিল, তা দ্বারকানাথ ঠাকুরের কলকাতায় অবিশ্বাস্য রকমের বিপুল ভূসম্পত্তি অট্টালিকা ইত্যাদি ক্রয়ের কাহিনী থেকেই উপলব্ধি করা যাবে। চৌরঙ্গী, বালিগঞ্জ, ভবানীপুর, বেলগাছিয়া, বেলেঘাটা, এন্টালী, টালা, ট্যাংরা, জোড়াসাঁকো, বরানগর প্রভৃতি এলাকায় তিনি প্রচুর জমিজমা কিনেছিলেন। বিভিন্ন জেলায় কেনা জমিদারি এবং ভূসম্পত্তির পরিমাণও কল্পনাতীত।

তাঁর আমলের স্বর্ণযুগয়ায় দেশীয় বণিকদের কি রকম অগ্রগণ্য ভূমিকা ছিল তা রামদুলাল দে, মতিলাল শীল, রুস্তমজী কাওয়াসজী, দ্বারকানাথ ঠাকুর প্রভৃতির ব্যবসায়িক সফলতা থেকে বোঝা যায়। আর ঐ আমলের কয়েকটি ব্যাঙ্কের আকস্মিক উত্থান এবং পতনও এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। ইতিহাসের গতিপথে যদি কিছু দূর পশ্চাদপসরণ করা যায়, তাহলে আরও প্রবল প্রমাণ নজরে আসে। শোভাবাজারের রাজা নবকৃষ্ণ নাকি তাঁর মায়ের শ্রাদ্ধে নয় লক্ষ টাকা খরচ করেছিলেন; গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ নাকি অনুরূপ অনুষ্ঠানে ব্যয় করেছিলেন কোন মতে বারো লক্ষ টাকা, কোন মতে বিশ লক্ষ টাকা। গোকুল ঘোষাল নাকি প্রতিদিন আঠারশ কাঙালী ভোজন করাতেন। তা ছাড়া, ভাগীরথীর পূর্ব পারে স্নানের ঘাট নির্মাণ করে পুণ্যার্জনের বাসনার কথাও প্রসঙ্গত স্মরণীয়। এভাবে কলকাতার নগর জীবনে নবধনিকদের আভিজাত্য প্রতিষ্ঠিত হয়।

স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে; কিভাবে কিসের বিনিময়ে মুষ্টিমেয় কয়েকজনের হাতে এত ধনসম্পদ সঞ্চিত হলো। ভলতেয়ার বলেছিলেন, এবংবিধ বিত্তসঞ্চয়ের পশ্চাতে, প্রতিটি ক্ষেত্রেই, একটি করে অপরাধ লুকিয়ে থাকে। দেশীয় বণিক ও জমিদারদের ক্ষেত্রেও অনুরূপ অজস্র অপরাধ লুকিয়ে ছিল, এ কথা উল্লেখের অপেক্ষা রাখে না; বিশেষ করে, যেখানে এরা ছিল দেশের ধনসম্পদ লুণ্ঠন ও শ্রমজীবী জনসাধারণকে শোষণ করায় ইয়োরোপীয় শোষকদের ছোট শরিক।

॥ ৩ ॥

রামমোহনের কালেই পাশ্চাত্ত্য ও প্রাচ্য দুই ভিন্নধর্মী সভ্যতা ও সংস্কৃতির সংঘাত থেকে উদ্ভূত সামাজিক আবর্তের কলরব একটা ভীষণতা ধারণ করে। ইংরেজ রাজপুরুষ, পরিব্রাজক, শিক্ষক, পাদ্রী প্রভৃতির মাধ্যমে ইয়োরোপীয় জ্ঞানবিজ্ঞানের যুক্তিধর্মী মনন বোধ ও বুদ্ধির ক্ষেত্রে ভারতীয় মনকে আঘাত করে, আর ব্যবহারিক জীবনের ক্ষেত্রে ওদের প্রেয়োবাদ প্রাচ্যের স্বর্গ-নরক চিন্তায় বিষণ্ণ অস্তিত্বকে হঠাৎ ধাক্কা দেয়। সেই ধাক্কার প্রচণ্ডতায় ও মনোহর-রূপে আকৃষ্ট হয়ে, ইচ্ছায় হোক অনিচ্ছায় হোক, কলকাতার সমাজমানস তার সনাতন মূল্যবোধগুলো থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়ল। রামমোহন নিজেই বলেছিলেন, ইংরেজ বিজয়ের ফলে যে পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে তাতে নিজেদের সামাজিক সুখস্বাচ্ছন্দ্য ও রাজনৈতিক সুবিধা ইত্যাদির জন্যই ভারতীয়দের ধর্মবিশ্বাসের পরিবর্তন হওয়া উচিত। এই মনোভঙ্গির মধ্যে ঈষৎ সুবিধাবাদী আচরণ নিহিত রয়েছে সত্য, কিন্তু মোদ্দা কথা এই যে ইংরেজ সাহচর্যে কলকাতাবাসীর জীবন নতুন পথে বাঁক নিতে আরম্ভ করেছে।

কলকাতা প্রবাসী ইয়োরোপীয়গণ তখন দৈনন্দিন কাজকর্মের একঘেঁয়েমি কাটানোর জন্য নানাপ্রকার বাঞ্ছিত ও অবাঞ্ছিত আমোদ প্রমোদে মত্ত হতেন। তার মধ্যে মুখ্য ছিল উদ্যান-সম্মেলন, নৈশভোজ ও নাচ, বাজি পোড়ান, সঙ্গীত ও নৃত্যানুষ্ঠান এবং থিয়েটার। ঐ সমস্ত অনুষ্ঠানে সায়েবরা তাদের বাঙালী বন্ধু-বান্ধব অথবা সহকর্মী অথবা দালালদের নিমন্ত্রণ করতেন। তখনকার আমলের সায়েবরা অধিকাংশই পরিচ্ছন্ন সুস্থ সামাজিক জীবন যাপন করতেন না। ধর্মীয় নীতিবোধের অস্তিত্ব বলতে গেলে ছিলই না। একজন ইংরেজ পর্যবেক্ষকের মতে, এমনকি বড় দিনের উৎসবও মদ্যপানে প্রমত্ত হওয়ার এবং কুৎসিত কদাচারের উপলক্ষ মাত্র ছিল। আর, সহরতলীতে নির্মিত ওদের বাগানবাড়িগুলো ছিল ঐ আমোদ প্রমোদের কেন্দ্রস্থল। সেই সার্বিক অস্থিরতার দিনে, যখন প্রাচীন মূল্যবোধগুলো ইন্দ্রিয়সুখান্বেষী ঔদ্ধত্যের দাপটে ছিন্নভিন্ন হয়ে যাচ্ছিল, তখন ঐ প্রেয়োবাদী জীবনদর্শন কী স্থূলতায় নিমজ্জিত হতো, তা সহজেই অনুমেয়।

"যে সব বাঙালী বাবু ইয়োরোপীয় নাচ-গান-থিয়েটারে নিমন্ত্রিত হতেন, তারাও তাদের সাহেব মাতব্বরদের মনোরঞ্জনের জন্য তেমনি দেশী আমোদোৎসবের আয়োজন করতেন, এবং বিপুল অর্থব্যয় করতেন। রামমোহন স্বয়ং ঐ

ধরনের পার্টি দিতেন; আর বিদ্যাবুদ্ধি মনন ইত্যাদিতে যে সব নব-ধনিক বা নবীন জমিদার ছিলেন খাটো মাপের, তারা ঐসব অনুষ্ঠানগুলোকে অতিশয় স্থূল কুরুচিপূর্ণ উপকরণ দিয়ে মুখর করে তুলতেন। যেমন, হাফ-আখড়াই, বাইনাচ, যুগপৎ ভারতীয় ও পাশ্চাত্ত্য যন্ত্রসঙ্গীতের ব্যবস্থা, ভাটিখানা, বিলাতী খানাপিনা, ইত্যাদি। শুধু যে মেলামেশা আপ্যায়ন ইত্যাদি সামাজিক উদ্দেশ্যেই এসবের সংগঠন হতো তা নয়, পূজাপার্বনেও তা প্রচলিত হয়, এবং শালীনতা বিনষ্ট নয়। এই প্রেয়োবাদী প্রমত্ততা কলকাতার মনোজীবনকে কিরকম আচ্ছন্ন করেছিল তা নবীনচন্দ্র বসুর কাহিনী থেকে জানা যায়। তিনি ১৮৩৫ সালে ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দরের অভিনয়ের ব্যবস্থা করেছিলেন, এবং মাত্র একটি সন্ধ্যার আনন্দানুষ্ঠানের জন্য এক লক্ষ টাকা ব্যয় করে দেউলিয়া হন। শোনা যায়, তাঁর পরবর্তী জীবন কাটে বৃন্দাবনে, জীর্ণ দশায়। দেশীয় বাবুগণ সায়েবদের সঙ্গে টেক্কা দেওয়ার জন্য সায়েবদের অনুকরণে বেলগাছিয়া ভিলার মত প্রমোদ কেন্দ্র নির্মাণ করেন কলকাতার আশেপাশে।

এই প্রেয়োবাদী জীবনদর্শনের আকর্ষণেই বহু প্রাচীন এবং নবীন জমিদার কলকাতাকেই তাদের জীবনের লীলাভূমিরূপে বেছে নেন। অনেকে সংবৎসর এখানেই পড়ে থাকতেন। পরবর্তী কালে কালীপ্রসন্ন সিংহের "হুতোম পেঁচার নক্সা" থেকে এই শ্রেণীর জমিদারদের রুচিবিকৃতির পরিচয় পাওয়া যায়: "তুকুরব্যালা ফেটিং গাড়ি চড়া, পাঁচালি বা চণ্ডীর গানের পেলেদের মতন চেহারা, মাথায় ক্রেপের চাদর জড়ানো, জন দশ বারো মোসাহেব সঙ্গে, বাইজানের ভেড়ুয়ার মত পোশাক, গলায় মুক্তার মালা, দেখলেই চেনা যায় যে ইনি একজন বনগাঁর শেয়াল রাজা, বুদ্ধিতে কাশ্মীরী গাধার বেহদ্দ, বিদ্যায় মূর্ত্তিমান মা।" সাংস্কৃতিক ইতিহাসের পৃষ্ঠায় এরা এবং এদের সহমর্মীরা রুচিবিকৃতির নিমিত্ত স্বরূপ হয়ে দাঁড়ায়। সহরে রূপান্তরণের মুখেও কলকাতার গ্রামীণ সংস্কৃতিতে যে শালীন শোভনতার ছাপ ছিল বাইনাচের প্রবল পৃষ্ঠ-পোষকদের নিকট তার মর্যাদা রক্ষিত হবে না তাই তো স্বাভাবিক।

শুধু যে পাশ্চাত্ত্য জীবনভঙ্গিমা মানুষের মনোহরণ করছিল তা নয়, পাশ্চাত্ত্য ব্যাধি পাশ্চাত্ত্য ধরনের অপরাধ ইত্যাদিও অচিরেই কলকাতার পাঁচমিশালী বাসিন্দার মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে; অপরাধপ্রবণতার চৌহদ্দি বিস্তৃত হয়। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকেই দেখা যায়, মৃত্যুঞ্জয় কুমার নামক এক ব্যক্তির সাত বছরের জন্য দ্বীপান্তরের শাস্তি হয়, অপরাধ—টাকশালকে ঠকানো; কালিপ্রসাদ

চ্যাটার্জী ও রামেন্নয় ঘোষ নামক দুই ব্যক্তির দু বছরের কারাদণ্ড হয় আড়াই হাজার টাকার ট্রেজারি বিল জাল করার জন্য। সম্ভবত সেই আমল থেকেই এই প্রবচনটির সৃষ্টি হয়ে থাকবে—'চুরি জোচ্চুরি মিথ্যে কথা—এই তিন নিয়ে কলকাতা।'

॥ ৪ ॥

এই কলকাতার গায়ে তখন প্রবল ইয়োরোপীয়ানার হাওয়া। ১৮৩০ সালে হিন্দু কলেজের কিছু সংখ্যক ছাত্র "দ্য পার্থেনন" নামে একটি সাময়িক পত্র প্রকাশ করেন; তাতে তাঁরা বলেছিলেন, শুধু জন্মসূত্রে তাঁরা হিন্দু, কিন্তু শিক্ষাসংস্কৃতি ইত্যাদিতে তাঁরা তো ইয়োরোপীয়। সুতরাং তাঁদের চিন্তার বাহন স্বরূপ একটি মুখপত্রের আবশ্যক। মনেপ্রাণে নিজেদের ইয়োরোপীয় ভাবার সূত্রপাত কিন্তু হিন্দু কলেজের ডিরোজিও শিষ্যরা করেননি, তাঁদের ঠাকুরদারাই করে গেছেন অষ্টাদশ শতকের শেষ পাদেই।

ডব্লু এইচ কেরি রচিত দ্য গুড ওল্ড ডেজ অব জন কোম্পানী নামক গ্রন্থ থেকে জানা যায়, রাজা রামলোচন নামক জনৈক উচ্চ বর্ণের এবং উচ্চ পরিবারের বিত্তশালী হিন্দু একজন বিশিষ্ট এটর্নির সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন ১৭৮০ সনে; তাঁর পরণে ছিল, "boots, buskskin breeches, hunting frock, and jockey cap." এটর্নি সায়েব তো রাজার এই অদ্ভুত রূপান্তর লক্ষ্য করে অবাক; বিস্ময়ের ঘোর কাটার পর তিনি দেখলেন, লর্ড মার্চের শিকারের পোষাককে রাজা রামলোচন নিখুঁত ভাবে নকল করেছেন। পল্লী বাংলার পথেঘাটে ঐরূপ বিচিত্র পোষাকে সজ্জিত মানুষটি যে দৃশ্যের অবতারনা করেছিলেন, তা বোধকরি দেবগণও কল্পনা করতে পারেননি। কেরির বিবরণ থেকে আরও জানা যায়, নবাব সিদারৎ আলি নামক এক ব্যক্তি খ্যাতনামা দর্জি কোনরকে এই সব পোষাক তৈরি করার অর্ডার দিয়েছিলেন, "two Suits of regimentals, ditto of English admiral's uniform, and two Suits of canonicals......At the same time he sent for an English peruke maker, and gave him orders to make him two wigs of every denomination according to the English fashion, viz. scratches, cut wigs, and curled obba, quenes, majors, and Ramilies." কলকাতা ছেড়ে বাড়ি ফেরার সময় তিনি ঐসব পোষাক সঙ্গে

নিয়ে গিয়েছিলেন। অষ্টাদশ শতকের শেষ পাদেই ছিল ইয়োরোপীয়ানার এই অবস্থা।

বিশপ হেবার কলকাতা আসেন ১৮২৩ সালে। তিনি লক্ষ্য করেছেন, কলকাতার অধিবাসীরা সমস্ত ব্যাপারেই ইংরেজের অনুকরণ করে, এবং ফলে, তাদের ব্যক্তিগত জীবনে নানা উল্লেখযোগ্য রূপান্তর ঘটছে। বিত্তশালী লোকেরা বিলিতি আসবাব এবং কোরিন্থিয়ান স্তম্ভের সহায়তায় তাদের অট্টালিকার শ্রীবৃদ্ধি করে; সর্বোৎকৃষ্ট অশ্ব এবং সর্বাপেক্ষা দ্রুতগামী অশ্ব-শকট ব্যবহার করে। হেবারের জনৈক স্থানীয় বাঙ্গালী বন্ধুর সন্তানদের একদিন দেখা গেল "dressed in jackets and trousers, with round hats, shoes and stockings." যিনি যথাসাধ্য ইয়োরোপীয়ানার বিরুদ্ধাচরণ করছিলেন এবং ছিলেন ভারতীয় সামাজিক রীতিনীতি ইংরেজী আইনের সহায়তায় বদলানোর প্রবল প্রতিপক্ষ, সেই রাধাকান্ত দেবও এ ব্যাপারে বিশেষ ব্যতিক্রম ছিলেন না। তাঁর সম্পর্কে হেবারের মন্তব্য: তাঁর জুড়িগাড়ি বাড়ির আসবাবপত্র, কথোপকথনের ভঙ্গি, কোনটাতেই সুস্পষ্ট ইয়োরোপীয়ানার লক্ষণ অল্প ছিল না। তাছাড়া, তৎকালীন সংবাদপত্রে প্রকাশিত হিন্দু কলেজে পাঠরত ছাত্রদের অভিভাবকদের পত্রাদি থেকে জানা যায়, ছাত্ররা বাঙ্গালী পোষাক আশাক চিরাচরিত অভ্যাস ইত্যাদি ত্যাগ করেছে, চুলে চিরুনি বুলাচ্ছে, স্নানাহ্নিক না সেরেই ভাত খাচ্ছে, ইত্যাদি।

এই ইয়োরোপীয়ানার পরিবেশ সৃষ্টিতে ইংরেজী শিক্ষার কি অবদান তা সুবিদিত। এ বিষয়ে আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। শুধু স্মরণীয় যে, রক্ষণশীল ধর্ম সভা এবং "সংবাদ চন্দ্রিকার" প্রবল আন্দোলন সত্ত্বেও এর গতি রোধ করা সম্ভব হয়নি। কালের আন্তর গরজ এমনি ছিল সতেজ, সক্রিয়। ইয়োরোপীয়ানার একমাত্র লক্ষ্য ছিল, নিজেদের সায়েবদের নিকট গ্রহণযোগ্য করে তোলা। এই আকাঙ্ক্ষা বহুবিধভাবেই অভিব্যক্ত, অনুসৃত, সঞ্চালিত হয়েছে। তন্মধ্যে দুটি পন্থা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। (১) স্বেচ্ছায় কিছু আত্মাবমাননা চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মত বরণ করে নেওয়া; যেমন, সায়েবদের উচ্চারণের সুবিধা ও বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী নিজেদের নাম, পদবী, স্থানের নাম, ইত্যাদিকে বিকৃত করা। ওরা যথাযথ উচ্চারণ করতে পারে না বলেই ঠাকুর হয়েছে টেগোর, মিত্র মিটার, কৃষ্ণ কিসেন, হরি হারি, চরণ চার্ণ, চন্দ্র চন্দার, বসু বোস, চক্রবর্তী চাকারবর্টি, বসাক বাইসেক, ইত্যাদি। আর

সায়েবদের মুখে নেটিভ গালটি ছিল অতি শ্রবণসুখকর। (২) ইংরেজী বলাকওয়ায় এবং ইংরেজী ভাষা-আশ্রিত সংস্কৃতির অনুশীলনে ইংরেজকে ছাড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা। সি. ই. ট্রাভেলিয়ান এ জিনিসটা ১৮৩৮ সালেই লক্ষ্য করে লিখেছিলেন, ইংরেজদের মত একই রকমের ভাবনা চিন্তা ও মননে উদ্বুদ্ধ হওয়ায় কলকাতার ইংরেজী শিক্ষিতরা "become more English than Hindus, just as the Roman provincials became more Romans than Gauls or Italians." এই সেদিনও, অর্থাৎ আট-দশ বছর আগে, ম্যালকম ম্যাগারিজ কলকাতার জনৈক বাঙালী অধ্যাপকের একটি পুথির সমালোচনায় লিখেছিলেন, আজকাল খাঁটি ইংরেজ একমাত্র ভারতবর্ষেই দেখতে পাওয়া যায়। ইয়োরোপীয়ানার সম্মোহ এমনিভাবেই কলকাতার সাংস্কৃতিক ধমনীতে প্রবাহিত হয়ে আসছে।

॥ ৫ ॥

এর আশু পরিণতি হয়েছে, বাংলার সাংস্কৃতিক কেন্দ্রবিন্দুর দ্রুত বিচলন। ওয়ারেণ হেস্টিংসের আমল থেকেই কলকাতা ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রকাঠামোয় মুখ্য ভূমিকার আসনে স্থিত ছিল। উপরন্তু, সুপ্রিম কোর্ট প্রতিষ্ঠা, এশিয়াটিক সোসাইটি প্রতিষ্ঠা এবং এর মাধ্যমে ঐশ্বর্যশীল সংস্কৃত সাহিত্যের পুনরুজ্জীবনের কার্যক্রম গ্রহণ, ইংরেজ ভাষাবিদদের বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের অনুশীলন, ইত্যাদি যুগান্তকারী ঘটনায় কলকাতার সাংস্কৃতিক মর্যাদা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছিল। আর, ইয়োরোপীয়ানা যেমন কলকাত্তাওয়ালাদের দিয়েছিল ইন্দ্রিয়-সংবেদ্য জীবনযাপনের স্বাদ, তেমনি দিয়েছিল প্রাগ্রসর ইয়োরোপীয় চিন্তার অধিকার। লণ্ডন অথবা প্যারিসের উচ্চারিত রাষ্ট্রনীতি, দর্শন, সাহিত্য অথবা বিজ্ঞান সম্পর্কিত তত্ত্ব তৎকালীন ভারতবর্ষে যত তাড়াতাড়ি কলকাতায় পৌছাত, এত দ্রুত আর কোথায়ও না। সুতরাং কলকাতাতে বসেই তখন লণ্ডন বা প্যারিসের প্রেয়োবাদী, মানববাদী ও বুদ্ধিমার্গীয় জীবনের আস্বাদ লাভ করা যেত। সেই জীবনে যেমন শিহরণ, তেমনি আনন্দ। কলকাতার জলবায়ু আর ভাবাকাশ দিয়েই ইংরেজী শিক্ষার মানস-সন্তানদের অস্থিমজ্জা গঠিত হতে থাকে।

এই কলকাতায় থেকেই রামমোহনের বেন্থামের সঙ্গে বন্ধুতার সূত্রে আবদ্ধ হয়েছিলেন, পাঠ করেছিলেন ভলতেয়ারের রচনা। এখানকার হিন্দু কলেজের

ছাত্রগণই টম পেইন কৃত "এইজ অব রিজন" গ্রন্থটি সংগ্রহের জন্য চতুর্গুণ মূল্য দিতে প্রস্তুত হয়েছিলেন। এবং তাদের শিক্ষক ডিরোজিও বায়রণের অনুকরণে কাব্য রচনা করে তাঁর বিদ্রোহী সত্তার বিশ্লেষণ দিয়ে সৃষ্টি করেছিলেন এক অনাস্বাদিতপূর্ব আবেগতপ্ত বায়রণ পরিবেশ। সেই আমলেই উদ্ভিদ বিজ্ঞান ও চিকিৎসা বিজ্ঞানের আশ্চর্য তত্ত্ব ও পরীক্ষা নিরীক্ষা অবলোকন করে রাধাকান্ত দেব ক্রমাগত বিমোহিত হচ্ছিলেন! আবার, অন্যদিকে, জোন্স-উলকিন্স-হলহেড এবং তাঁদের উত্তরসূরীদের সংস্কৃত চর্চায়, হিন্দু আইন সংকলন, ইত্যাদি ব্যাপারে সহায়তা করার জন্য সুপ্রসিদ্ধ সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতবর্গ নিজ নিজ কেন্দ্র ছেড়ে কলকাতায় স্থায়ীভাবে বসবাস আরম্ভ করেছিলেন।

সাংস্কৃতিক কেন্দ্রবিন্দু বিচলনের ফলে কলকাতা যতই একচ্ছত্র প্রাধান্য অর্জন করতে থাকে, বাংলার প্রাচীন নগর ও শিক্ষা সংস্কৃতির কেন্দ্র—ঢাকা, মুর্শিদাবাদ, নবদ্বীপ-কৃষ্ণনগর, প্রভৃতির অবক্ষয় ও ধ্বংস ততই অনিবার্য হয়ে পড়ে। ঢাকা এক সময় মসলিনের অতি প্রসিদ্ধ বাণিজ্য কেন্দ্র ছিল; ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী সেখান থেকে প্রচুর পরিমাণ বস্ত্র রপ্তানী করত। কিন্তু কলকাতার অস্বাভাবিক সমৃদ্ধির ফলে ঢাকার বাণিজ্য কমতে কমতে ঊনবিংশ শতকের দ্বিতীয় দশকে এমন পর্যায়ে পৌছায় যে কোম্পানী বাধ্য হয়ে সেখানকার কেন্দ্রটি বন্ধ করে দেয়। আর, ১৮১০ সালেও ঢাকার জনসংখ্যা যেখানে ছিল দু লক্ষের মত, তা কমে গিয়ে ১৮৩৬ সালে দাঁড়ায় মাত্র বিশ হাজারে। সংস্কৃতির প্রাঙ্গণে এর প্রভাব সহজেই অনুমেয়। বাংলার মুসলমান নবাবদের রাজধানী মুর্শিদাবাদের অবস্থা দিনকে দিন এত শোচনীয় হয়ে পড়ে যে, ১৮০১এ ঐ সহরের রাস্তাঘাট যানবাহন চলাচলের অযোগ্য, এমন কি পাল্কী চলাচলেরও উপযুক্ত ছিল না। সদর দেওয়ানী আদালত, সদর নিজামত আদালত ইত্যাদি মুর্শিদাবাদ থেকে কলকাতায় স্থানান্তরিত হওয়ায়, মুসলিম আইন ও হাকেমি চিকিৎসায় পারদর্শী ব্যক্তিগণ তাঁদের খ্যাতি ও প্রতিপত্তি তো হারালেনই, ক্রমে ক্রমে নিমজ্জিত হলেন শূন্যতার গহ্বরে। সেখানকার সাংস্কৃতিক জীবনেরও আর কিছুই অবশিষ্ট রইল না।

তেমনি হাল নবদ্বীপ-কৃষ্ণনগরের। মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের মৃত্যু হয় ১৭৮২ খৃষ্টাব্দে। সেই সময় থেকে বাংলার সাংস্কৃতিক পীঠস্থান রূপে এর যে অবনতির সূত্রপাত, তা আর কোনদিনই পুনরুজ্জীবিত হয়নি, হবেও না কখনও। ঐ সময়ে সংস্কৃতাদি চর্চার জন্য কলকাতায় ক'টি টোল ছিল অথবা আদৌ ছিল

কিনা, তা সন্দেহের ব্যাপার। অথচ, ১৮১৮ সালে দেখা যাচ্ছে কলকাতায় ২৮টি টোলে পঠনপাঠন চলছে আর নদীয়ার টোলের সংখ্যা কমে গিয়ে হয়েছে ৩১। তারও বারো বছর বাদে অর্থাৎ ১৮৩০এ উইলসন সাহেব গিয়ে দেখলেন, নদীয়ার টোলের সংখ্যা আরও কমে গিয়ে মাত্র ২৫টিতে দাঁড়িয়েছে। যে সাংস্কৃতিক মর্যাদা ছিল কৃষ্ণনগরের, ঐতিহাসিক বিবর্তনের ধারা তা-ই মাখিয়ে দিল কলকাতার নাগর সভ্যতার অঙ্গে।

সাংস্কৃতিক কেন্দ্রবিন্দুর বিচলন এবং স্থানান্তরের প্রবাহ যদি কলকাতা পৌঁছেই থেমে যেত, তাহলে সামগ্রিকভাবে জাতীয় সত্তার পরিপ্রেক্ষিতে ক্ষতির আশঙ্কা কিছু ছিল না। কিন্তু থামে নি; ঐ প্রবাহ কলকাতা পার হয়ে জাহাজে চড়ে সাত সমুদ্র তের নদীর ওপারে লণ্ডনে এসে স্থিতিলাভ করে! সেজন্য, কলকাতার সংস্কৃতির সত্তাটি বর্ণে বৈচিত্র্যে অভিব্যক্তিত্বে সঙ্কর। আর, এই চারিত্রবৈশিষ্ট্যের জন্যই পশ্চিমের সমাজতাত্ত্বিকগণ কলকাতা তথা সমগ্র ভারতবর্ষকেই বলেছেন অক্সফোর্ড ক্যামব্রিজ বা লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি প্রাদেশিক অথবা মফঃস্বল কেন্দ্রমাত্র; এবং সঙ্গে সঙ্গে এখানকার বিদ্বৎসমাজের প্রতি ছুঁড়ে দিয়েছেন পরিমিতিহীন তাচ্ছিল্য। রামমোহনের কালের ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রকাঠামো—আশ্রিত বুদ্ধিজীবী ও সংস্কৃতি নির্মাতাগণ সেই তাচ্ছিল্য গায়ে মাখেন নি, ইংল্যাণ্ডের দিকেই তাকিয়ে ছিলেন মোহযুক্ত দৃষ্টিতে —আলোয় উদ্ভাসিত অস্তিত্বের আকাঙ্ক্ষায়।

॥ ৬ ॥

তবু ঐ সীমার মধ্যেও কলকাতা নতুন মানুষের এবং নতুন কণ্ঠস্বরের আবির্ভাবের জন্য জমি কর্ষণ করছিল। সামাজিক অন্যায় অবিচার ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে রামমোহনের একক সংগ্রাম তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। ১৮২৩ সালে ভারতীয় সংবাদপত্রের উপর নানাপ্রকার নিষেধাজ্ঞা জারি করা হলে রামমোহন তাঁর ফারসি পত্রিকা 'মিরাত-উল-আকবর' বন্ধ করে দেন এবং এ প্রসঙ্গে মন্তব্য করেন, "হৃদয়ের অজস্র রক্তবিন্দুর বিনিময়ে যে মর্যাদা অর্জন করেছ সামান্য খুদকুঁড়োর আশায় তুমি তা একজন মুটের দয়ার নিকট বিকিয়ে দিয়ো না।" সার্বিক ইংরেজ-নির্ভরতার দিনে এই কণ্ঠস্বর নতুন। এই নতুন কণ্ঠস্বরই একদিন ঘোষণা করল, "স্বাধীনতার শত্রু এবং স্বৈরাচারের মিত্ররা শেষ পর্যন্ত কোন দিন জয়লাভ করেনি, করবেও না কখনও।" এই নতুন

মানুষই ইয়োরোপ-আমেরিকায় স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে সংগ্রামের সাফল্যে কলকাতায় বিজয়োৎসব পালন করছেন এবং ব্যর্থতায় মর্মাহত হচ্ছেন। বিশ্বের সংগ্রামশীল বিরাট জনসমষ্টির সঙ্গে আত্মিক ঐক্যের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হচ্ছেন।

সামাজিক রীতিনীতির সংস্কারের জন্য তার যে আন্দোলন তা থেকে বিরত থাকার জন্য এবং হিন্দু সমাজ মানসের প্রশান্তি বিনষ্ট না করার জন্য পরামর্শ দিয়ে জনৈক ভদ্রলোক সংবাদ পত্রে একটি চিঠি লেখেন। সেই পরামর্শ গ্রহণে অক্ষমতা জ্ঞাপন করে রামমোহন তিনটি যুক্তি দেখান: (১) মানুষের দুঃখ বেদনায় সংবেদনশীল সাড়া দেওয়া মানুষের স্বাভাবিক প্রেরণা; (২) দেশের সর্বব্যাপী দুর্গতিতে তাঁর স্বীকৃত অংশ; এবং (৩) সমগ্র মানব গোষ্ঠীর প্রতি তাঁর বিবেক নির্দেশিত কর্তব্য ও দায়িত্বের এই মনোভঙ্গিও অভিনব। এই মনোভঙ্গি এমন একজনবিবেকবান বুদ্ধিজীবীর মনোভঙ্গী যিনি ব্যক্তিগত স্বার্থবোধের সীমায় আপন চিন্তামননকর্মকে আবদ্ধ রাখতে ইচ্ছুক নন, যিনি আপন বিবেককে কালের বিবেক বলে গ্রহণ করেছেন, এবং যিনি স্বীয় চিন্তা ও কর্মকে ভৌগোলিক গণ্ডি পার করিয়ে মানবিক ঐক্য ও কল্যাণের পথে প্রবাহিত করতে ইচ্ছুক।

অবশ্য, এ কথা অস্বীকার করা যায় না যে, তৎকালীন রাষ্ট্রীয় সম্পর্কের বিচারে তিনি ঔপনিবেশিক শাসনব্যবস্থাকে অপরিবর্তনীয় অমোঘ এবং কাঙ্খিত বলে মেনে নিয়েছিলেন; এবং ইয়োরোপীয়ানার পথেই ভারতের বিকাশের সম্ভাবনাময়তা স্বীকার করে নিয়েছিলেন। কিন্তু ঔপনিবেশিক আশ্রয়ের মধ্যে থেকেও স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে এবং স্বাধীনতার পক্ষে একটি সংহত কণ্ঠস্বর যে উচ্চারিত হয়েছে, তার তাৎপর্যও কম নয়। যে সময়ে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলশ্রুতি সামাজিক কৌলিন্যহীন জমিদারগোষ্ঠী এবং হঠাৎ ধনিকের দল বাইনাচ আর খানাপিনার আয়োজন করে ইংরেজদের তোষামোদ করে চলছিল, ঠিক সেই সময়েই এই নতুন মানুষেরা অন্য ভাবনায় ভাবিত হয়েছিলেন, অন্য সম্ভাবনাময়তায় সোচ্চার হয়েছিলেন। সেই সম্ভাবনাময়তা একদিন বর্ণ-জাতি ধর্ম-দেশ আরোপিত সীমা লঙ্ঘন করে বিশ্ববাসী হবে। তৎকালীন কলকাতার পণ্যের বাজারে, ইন্দ্রিয় সংবেদ্য জীবনাচরণের মধ্যে সাংস্কৃতিক সুরুচি কুরুচির সংঘাতের মধ্যে এই অঙ্কুরটি নিহিত ছিল!

তাই, প্রসন্নকুমার ঠাকুর ১৮৩১ সালে তাঁর 'রিফরমার' পত্রে একটি প্রবন্ধে লিখতে পেরেছিলেন, স্বাধীনতা ও সত্যের প্রভাব দূরবিস্তারী হয়েছে, এবং

ক্রমেই তা ব্যাপকতর বিস্তৃতি অর্জন করছে; কোন কিছুই এর গতি প্রতিহত করতে পারবে না। এক সময় ছিল যখন এদেশের অধিবাসীদের সর্বপ্রকার নীতিবর্জিত ও অজ্ঞ বলে ঘৃণা করা হতো, বলা হতো যেসব সদ্‌গুণ মানুষকে পশু থেকে স্বতন্ত্র করে তার ছিল একান্ত অভাব। কিন্তু এখন কি সত্যের অপলাপ না করে কেউ এ কথার পুনরাবৃত্তি করতে পারে?......আমাদের ধ্যান-ধারণা এখন আর কোন বস্তুর বহিরঙ্গের মধ্যেই সীমিত নয়। আমরা তত্ত্বানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হয়েছি, এবং প্রবৃত্ত থাকব যতদিন না আমরা সেই সত্যে উপনীত হই যা আমাদের এই উপলব্ধিতে স্থিত করবে যে আমরাও অন্য সকলের মতই মানুষ, এবং অন্য সকলের মত আমরাও সৎ, উন্নতচরিত্র ও মহত্ত্বের অধিকারী হতে পারি। যুক্তির আলোপ্রদর্শিত পথে আমরা এই আত্মশ্লাঘাপূর্ণ সম্ভাবনার দ্বারপ্রান্তে এসে উপস্থিত হয়েছি যে, শীঘ্রই আমরা সভ্যতার সেই স্তরে উপনীত হব যা ইয়োরোপীয় জাতিসমূহের সমৃদ্ধি প্রতিষ্ঠা করেছে।

রামমোহনের কালে কলকাতার পণ্যের বাজারে, ইয়োরোপীয়ানার কলরোলে, ইন্দ্রিয়সর্বস্ব স্থূলতার অন্তরালে আত্মবিকাশের প্রতিজ্ঞা ও সম্ভাবনার কণ্ঠস্বর নিশ্চয়ই খুব উচ্চগ্রামে বাঁধা ছিল না; কিন্তু এর অস্তিত্ব যে ছিল, তাই সাংস্কৃতিক প্রবাহের ইতিহাসে একটি স্মরণীয় ঘটনা। সেই কালে কলকাতায় বসবাসকারী যে কোন সংবেদনশীল মানুষের চিত্ত -এর অনুরণন নিশ্চয়ই অনুভব করে থাকবে।

বাংলার রেনেসাঁস ও মধুসূদন : একটি মূল্যায়ন

মধুসূদন যে 'নব্যভারতীয় কবিদের মধ্যে অসংহত অথচ বিরাট পুরুষ, রূপক হিসাবে মহান' (বিষ্ণু দে), সে বিষয়ে দ্বিমত নেই। এই রূপকটিকে বারংবার আবিষ্কার এবং স্মরণ করার প্রয়োজনীয়তাও অনস্বীকার্য। কারণ, তাঁর জীবনের যে ট্র্যাজিডি তা আমাদের ভ্রান্ত যুক্তি ও উপমা অন্বেষণের মনোবৃত্তি দিয়ে নির্মিত রেনেসাঁসেরই ট্র্যাজিডি। তা তাঁর কালের আন্তর বেদনা ও ঐক্যভঙ্গের মধ্যেই নিহিত ছিল। সেই ট্র্যাজিডির সংকেত ও শিক্ষণীয় উপাদানও অমূল্য। এই সংকেতকে ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটের নির্দিষ্টতায় গ্রহণ করা বর্তমান প্রবন্ধের মৌল উদ্দেশ্য; আর সেই উদ্দেশ্যের চরিতার্থতার দরুন আমি মধুসূদনকে হৃদয়বৃত্তির অতিশয়তায় প্রমত্ত একজন বুদ্ধিজীবী হিসাবে চিহ্নিত করব, যার জনক ঔপনিবেশিক শাসনব্যবস্থা, জননী ভারতবর্ষ।

সেই শাসনব্যবস্থার সামাজিক ফলশ্রুতির আলোচনা নিষ্প্রয়োজন; শুধু এটুকু স্মরণে রাখাই যথেষ্ট যে, আমাদের রেনেসাঁস নামক পদার্থটি আদপেই উৎকেন্দ্রিক; কেননা, দেশের মাটি থেকে সে রস আহরণ করেনি কখনও। কলকাতার পত্তন ও বিবর্তনের ফলে বাংলার প্রাক্তন সাংস্কৃতিক কেন্দ্র নদে-শান্তিপুর ঢাকা-মুর্শিদাবাদ প্রভৃতি অনিবার্যরূপে বিলয়প্রাপ্ত হয়। বাংলার সাংস্কৃতিক কেন্দ্র স্থানান্তরিত হয় কলকাতায়; আর কলকাতার প্রাণকেন্দ্র যে শ্বেতদ্বীপের রাজধানী লণ্ডনই হবে তাও ঔপনিবেশিক শাসনকাঠামোর বৈশিষ্ট্যের নিয়মে অমোঘ ছিল। তাই, ঐ ট্র্যাজিডি ইংল্যাণ্ডপ্রেমী জীবনদর্শনেরই ট্র্যাজিডি; আর, যে রেনেসাঁসের গর্বে আমরা গর্বিত তা আত্মপরিচয়ে ভয়ংকর-ভাবে দীন, মানসজীবনে প্রবাসী, দেশের জমিন আর গণমানসের আকৃতির প্রতি নির্মমভাবে উদাসীন ও নির্বাক।

ঔপনিবেশিক শাসনব্যবস্থা থেকে উদ্ভূত বুদ্ধিজীবীদের নিকট, প্রথম আমলে, ইংল্যাণ্ডপ্রেম ছিল জীবনের ধ্রুবতারা। মধুসূদন সেই প্রেম আকণ্ঠ পান করে-ছিলেন তাঁর স্বভাবের প্রবলতায়; সেজন্য, কৈশোরেই তিনি ধুতির বদলে প্রথমে পাজামা-আচকান এবং পরে পাজামা-আচকানের বদলে ইংলিশ কোট-পেন্টালুন ধরেছিলেন। কিন্তু, বহিরঙ্গের এই রূপান্তর তাঁর একটি ভীষণ মধুর আন্তর আবেশের অভিব্যক্তি মাত্র, যে আবেশটিকে পুনরুল্লেখের বাহুল্য সত্ত্বেও

পুনরায় উল্লেখ না করে উপায় নেই—তা হলো, যে অসম্ভবের কোন পরিমাপ নেই নিজ জীবনে তাকেই সম্ভব করার দুর্দমনীয় প্রয়াস ; অর্থাৎ, চলনে বলনে পোষাকে রুচিতে একান্তভাবে সায়েব হওয়া এবং ইংরেজ-কবি বলে স্বীকৃতি লাভ। সেই আবেশই তাঁকে ব্ল্যাকউডস্ ম্যাগাজিন ও বেণ্টলিস্ মিসেল্যানিতে প্রকাশের আশায় কবিতা রচনায় প্রবুদ্ধ করে, এবং অন্য দিকে, তাঁকে এই প্রগলভ ও দুঃসাহসী প্রত্যয়ে মাতিয়ে তোলে যে একবার ইংল্যাণ্ডের মাটি ছুঁতে পারলেই তিনি ইংল্যাণ্ডের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি বলে সুপ্রতিষ্ঠিত হবেন। এই বিশ্বাসে তিনি স্থিত হয়েছিলেন যে, এই তাঁর ভবিতব্য ; ইওরোপ, বিশেষত ইংল্যাণ্ড, আবিষ্কারে তাঁর যাবতীয় ও অসামান্য বুদ্ধিমার্গীয় প্রয়াস এই মানদণ্ডেই বিচার্য। পূর্বোক্ত আবেশ তাঁর তনুমনকে কীভাবে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল, তা তমলুক এবং খিদিরপুর থেকে গৌরদাসকে লেখা পত্রের অংশ বিশেষ থেকে পুনরায় স্মরণ করা যাক : 'I am come nearer that sea which will perhaps see me at a period (which I hope is not far off) ploughing its bosom for England's glorious shores'. পুনশ্চ, 'The sea from this place is not very far. What a number of ships have I seen going to England !' আর খিদিরপুর থেকে, 'You know my desire for leaving this country is too firmly rooted to be removed. The sun may forget to rise, but I cannot remove it from my heart. Depend upon it—in the course of a year or two more, I must either be in England or cease "to be" at all ; —one of these must be done !' এই আবেশই তাঁর ধর্মান্তরের মূলে ; অন্য কোন তাৎক্ষণিক হেতু তাঁর অহংকারকে আঘাত এবং অহংকে যদি ক্ষুব্ধ করে থেকেও থাকে তো তা শক্তিতে প্রভাবে ঐ আবেশকে ক্ষীণবল করতে সমর্থ হয়নি।

কিন্তু, ধর্মান্তর থেকেই তাঁর ট্র্যাজেডির সূত্রপাত। খৃষ্টান হয়েও ইংল্যাণ্ড-গামী জাহাজের ঠিকানা তো তিনি পেলেনই না, বরং বহুবিধ উপস্থিত ব্যর্থতায় নৈরাশ্যে তাঁকে ম্রিয়মান হতে হয় ; এমনকি, ঈপ্সিত খৃষ্টান দাক্ষিণ্যও তাঁর ভাগ্যে কলকাতায় জোটেনি। সেজন্য অকস্মাৎ একদিন বিরক্তি ও দুশ্চিন্তার 'অর্ধ উন্মত্ত' অবস্থায় তাঁকে বিশপস্ কলেজ ও কলকাতা ত্যাগ করে মাদ্রাজ পাড়ি দিতে হয়।

॥ ২ ॥

মাদ্রাজে খৃষ্টান দাক্ষিণ্য ছাড়া আরও অধিক কিছু তিনি পেয়েছিলেন ; পেয়েছিলেন আট বছর অতিবাহিত করার মত ঈষৎ কর্ম সঙ্গতি, শিক্ষক-সাংবাদিক ও কবিখ্যাতি ; আর পেয়েছিলেন ইংরেজ স্ত্রী, যদিচ তাঁকে লাভ করার পথে বিপত্তি ছিল অনেক। মধুসূদনের ইংল্যাণ্ড-কেন্দ্রিক আবেশ এতে আত্মতৃপ্ত হয়েছিল, এবং সম্ভবত ব্যাপকতর তৃপ্তির জন্য তাঁকে উন্মুখ করে তুলেছিল, নতুবা মাত্র ক'বছর বাদেই তিনি একজন ফরাসী মহিলার সঙ্গে বসবাস করার জন্য ইংরেজ স্ত্রীকে ত্যাগ করবেন কেন! কিন্তু, আবেশের চরিতার্থতার পথে এবং তা উত্তীর্ণ হয়ে তাঁর লাভ হয়েছিল অপরিমেয়—তিনি পেয়েছিলেন দুঃখের মরমী সঙ্গিনী আর ট্র্যাজেডির ইওরোপীয় শহীদ।

মধুসূদনের মাদ্রাজ প্রবাস অন্য এক দিকেও অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ ; কারণ, এইখানেই সাফল্য-অসাফল্যের মধ্যে তাঁর পূর্বোক্ত আবেশ সর্বপ্রথম নিশ্চিন্তভাবে আক্রান্ত হয় ; এবং আক্রমণে মুখ্য ভূমিকা ছিল শৈশবে মায়ের কাছ থেকে পাওয়া শিক্ষার স্মৃতি আর বায়রণের কাব্যপাঠের গোপন অথচ প্রবল অনুপ্রেরণা। মধুসূদনের জীবনে বায়রণের প্রভাব কি এবং কতটা, সেটা সাধারণত অনুচ্চারিত থেকে যায়। তাঁর জীবন ও কাব্যালোচনায় এই স্বীকৃতির অভাব কবি-মানসের পর্যালোচনার পক্ষে ক্ষতিকর। সেজন্য, এ সম্পর্কে কিঞ্চিৎ আলোকসম্পাত অপরিহার্য বলে গণ্য করি।

হিন্দু কালেজে ডিরোজিও সৃষ্টি করেছিলেন একটি আবেগঘন বায়রণ পরিবেশ, এবং স্বয়ং পরিচিত হয়েছিলেন 'ইউরেশীয় বায়রণ' রূপে। তাঁর কাব্যে ব্যক্তিক ও রাষ্ট্রনৈতিক স্বাধীনতার প্রতি যে দীপ্ত দুর্বার আকুতি অভিব্যক্ত, ডিরোজিও আকৃষ্ট হয়েছিলেন তার অপ্রতিরোধ্যতায় ; এবং তাঁর নিজস্ব কাব্যপ্রয়াসও সেই আকর্ষণেরই ফলশ্রুতি। মধুসূদন যখন হিন্দু কালেজে প্রবেশ করেন, তখন ডিরোজিও ছিলেন না কিন্তু বায়রণ-পরিবেশটি অক্ষত ছিল। তাই গৌরদাসের নিকট পত্রে মধুসূদনকে বায়রণকে কখনও 'noble favourite' কখনও বা আদর-সম্ভ্রমে 'my Lord Byron' বলে সম্বোধন করতে দেখা যায়, যদিচ পরিণত মধুসূদনকে পরবর্তীকালে বায়রণ কাব্যের সঠিক মান-নির্ণয়ে সমর্থ সমালোচক হিসাবে আমরা আবিষ্কার করি। বায়রণের প্রতি এই স্বাভাবিক আকর্ষণ প্রায় একই উপাদানে নির্মিত দুটি হৃদয়ের সহজ সাযুজ্য বলে গ্রহণ করা অমূলক নয়। একটি পত্রে তিনি গৌরদাসকে লিখছেন, 'I am reading Tom

Moore's life of my favourite Byron—a splendid book upon my word! Oh! how should I like to see you writing my life if I happen to be a great poet—which I am almost sure I shall be if I can go to England.' দুদিন বাদেই অপর একটি পত্রে লিখছেন, "I have done with Tom's Life of Byron. The Chapter, wherein the death of my noble favourite is detailed, drew forth tears from me rather in an abundant degree.... So interesting it is, that nothing can be pleasanter—at least to me, than it pages; —full of everything to make the reader gay—sad—thoughtful and so forth'. এই কথাগুলো আমরা যখন পাঠ করি তখন স্বভাবতই অনুভব করি, মধুসূদনের অন্তরেও চলছিল সমুদ্রের অননুভূত আলোড়ন।

মধুসূদন যে তাঁর ইংরেজী কাব্যটিকে বায়রণের কাব্যকাহিনীর কাঠামোয় নির্মাণ করেছিলেন এবং তার আন্তর সম্পদও সেখান থেকেই আহরণ করেছিলেন, এবং অন্যান্য বহু কবিতার ভাবসম্পদ রূপকল্প ও ভাবানুরাগও যে বায়রণের কাব্য থেকে সংগ্রহ করেছিলেন, তা সকলেরই জানা। কিন্তু বিস্ময়কর হলো, মেঘনাদবধের সাফল্যের পরেও, এবং 'বাংলার মিলটন্' 'বাংলার গ্যয়টে' ইত্যাদি বিভ্রান্তিকর সম্বোধনে ভূষিত হবার পরেও তাঁকে রাজনারায়ণের নিকট একটি পত্রে লিখতে দেখি, 'Or must I sink into a writer of occasional lyrics and sonnets for the rest of my life? The idea is intolerable.... I like a subject with oceanic and mountain scenery, with sea voyages, battle and love adventures. It gives a fellow's invention such a wide scope.' এই লাইন ক'টিতে বায়রণের জীবনচিত্র ভাস্বর, এত ভাস্বর যে অসতর্ক পাঠকের দৃষ্টিও এড়াবার নয়। এবং তিনি বায়রণের মতই, থামেননি; বাংলা কাব্যের পরিধিতে নতুন নতুন শৈলীর পরীক্ষা-নিরীক্ষায় তিনি যেমন প্রমত্ত হয়েছিলেন, তেমনি ব্যবহারিক জীবনের ক্ষেত্রে, নিঃশেষিত হওয়ার পূর্বে, ইংল্যাণ্ড-ফ্রান্সে তিনি লাভ করেছিলেন জীবনের ট্র্যাজিক বিন্যাস।

ব্যক্তি ও ব্যক্তিত্বের এই বাহ্য সাদৃশ্য থেকেও বায়রণের বিদ্রোহীসত্তা মধুসূদনের মানস বিবর্তনে যে প্রভাব বিস্তার করেছিল, তার তাৎপর্য, আমার সুদৃঢ় বিশ্বাস, অধিকতর গভীর ও ব্যাপক। মধুসূদন মাদ্রাজে The Anglo

Saxon and The Hindu শীর্ষক একটি বক্তৃতা করেন ১৮৫৪ সনে। তাতে বেশ কয়েকবার বায়রণের প্রতি প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত দেখতে পাওয়া যায়; এবং অন্তত দু জায়গায় অতিশয় আবেগ ভরে তিনি বায়রণের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করেছেন। মধুসূদনের আপন মনোভঙ্গি এবং উজ্জ্বলতর অনুভবের দর্পণ বলে দুটি সংক্ষিপ্ত উদ্ধৃতি এখানে দেওয়া হচ্ছে। (১) 'See the wild Macedonian rushing forth like a mountain-torrent, carrying everything before him, as the tempestuous wind carried the dark cloud onward.' (২) The pilgrim Harold wept over desolate Rome —for he was an orphan of the heart and turned to her; and the eloquence of his grief, the sweet and soft voice of his sorrow, swelling like a stream of rich yet mournful music, still saddens the soul; and yet he was an alien, a wanderer from a colder, a cloudier clime! What would he have done, had he stood where I stand; had he been what I am?' এই মন্তব্যগুলো স্ফটিকের মত স্বচ্ছ; কারণ, এগুলো মধুসূদনেরও মনোদর্পণ। স্পষ্টতই দেখা যাচ্ছে, হৃতঐশ্বর্য রোমে বসে বায়রণের ক্রন্দন এবং গ্রীসের স্বাধীনতা-যুদ্ধে তাঁর ভূমিকার প্রতি মধুসূদনের আকর্ষণ দুর্বার; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তাঁর চিত্ত এই আত্মগ্লানিতে সঙ্কুচিত হচ্ছে যে, একটি স্বাধীন দেশের কবি ও বুদ্ধিজীবীর পক্ষে যে ভূমিকা গ্রহণ সম্ভবপর, ঔপনিবেশিক শাসনব্যবস্থার সঙ্গে সম্পৃক্ত একজন কবি ও বুদ্ধিজীবীর পক্ষে তার অবকাশ নেই। তাই বায়রণ মধুসূদন হলে কী না করতে পারতেন, এই প্রশ্নটির আত্মধিক্কার তীরের মত হৃদয়ে বিঁধে এবং রক্ত ঝরায়। সেজন্যই এই সিদ্ধান্ত অনিবার্য হয়ে পড়ে যে, বায়রণের প্রতি আকর্ষণ মধুসূদনের মানস রূপান্তরে প্রবলভাবে সহায়ক হয়েছে।

আর, এই আত্মধিক্কারের মধ্যেই আমরা অকস্মাৎ আবিষ্কার করি, মধুসূদনের পূর্ব-কথিত আবেশ যেন তার প্রবলতা অনেকটা হারিয়ে ফেলেছে। এখানেও উভয় কবির মধ্যে সমান্তরাল বিবর্তন লক্ষণীয়। বায়রণ-কাব্য যেমন ক্রমে ক্রমে অহং-এর সীমা উত্তীর্ণ হয়ে বিশ্বমানবের স্বাধীনতার আর্তির স্পন্দনে ভাস্বর হয়ে উঠেছিল, মধুসূদনও তেমনি ইংল্যাণ্ড-প্রেমী জীবনদর্শন অতিক্রম করে মাতৃভূমির আর্ত ক্রন্দন আত্মস্থ করেছিলেন। মাদ্রাজের ঐ ভাষণ থেকে এটা অন্তত পরিষ্কার যে, পরিপূর্ণ সাহেব হবার যে আবেশ এবং এই অসম্ভব

সাধনার অনিবার্য ব্যর্থতা সম্পর্কে তাঁর ক্রমবর্ধমান উপলব্ধি—এই দুই বিরোধী প্রবণতার মধ্যে সংগ্রাম তাঁর অবচেতন মনে যে তোলপাড় সৃষ্টি করেছিল, তা একটি প্রত্যয়শীল সমাধানের মধ্য দিয়ে নিষ্পন্ন হবার জন্য তাঁকে চঞ্চল করে তুলেছিল। আর নিষ্পত্তির পথ কোন্‌টা, তাও ঐ ধিক্কারের মধ্যে সুস্পষ্টভাবে নিহিত ছিল। মাদ্রাজ প্রবাসের শেষ দিকে মধুসূদন স্পষ্টই অনুভব করছিলেন, ইংল্যাণ্ডের ঐশ্বর্যশীল বন্দরগুলোর প্রতি ধাবমান জাহাজগুলো ক্রমেই তাঁর দৃষ্টিপথ থেকে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছিল।

বায়রণের কাব্যবাণীর পুনরাবিষ্কার ঐ রূপান্তর কর্মে যখন নিযুক্ত ছিল, ঠিক সেই মুহূর্তেই, ঐ আবেশ শিথিল হবার লগ্নে, মধুসূদনের চিত্ত মায়ের কাছ থেকে পাওয়া শিক্ষার পূর্বস্মৃতি ভাস্বর হয়ে উঠে, যে শিক্ষা তাঁকে দেশের পুরাকাহিনীর সঙ্গে অপার প্রেম-প্রীতি-ভালবাসা-শ্রদ্ধার চিরস্থায়ী সম্পর্কে বেঁধে রেখেছিল। এমনি একদিনেই এই মর্মবেদনায় তিনি উদ্বেল হয়ে উঠেন যে, রক্তে-চেনা ভাষা বাংলা তিনি বিস্মৃত হচ্ছেন; সঙ্গে সঙ্গে গৌরদাসের নিকট অনুরোধ-পত্র গেল, এক কপি করে রামায়ণ মহাভারত পাঠানোর জন্য। আর, অপর একটি পত্রে তাঁর প্রাত্যহিক ভাষাচর্চার বিবরণ দিয়ে তিনি বন্ধুকে জানালেন, 'Am I not preparing for the great object of embellishing the tongue of my fathers ?' এই উক্তিটিকে যখন পরবর্তী কালের মন্তব্য 'I would soon reform the Poetry of my country than wear the imperial diadem of all the Russians'—এর সঙ্গে মিলিয়ে গ্রহণ করি, তখন এ এক আশ্চর্য ভবিষ্যদ্বাণী রূপেই প্রতিভাত হয়। কিন্তু, বিস্ময়ের কথা, পিতৃপুরুষের ভাষার উন্নতিবিধান জীবনের মহৎ লক্ষ্য বলে ঘোষণা করছেন সেই ইংল্যাণ্ডমাতাল মধুসূদন যিনি দেশত্যাগে বদ্ধপরিকর ছিলেন, যিনি মাতৃভাষা ভুলতে চেয়েছিলেন, যিনি মাদ্রাজ থেকে পিতাকে কন্যাসন্তানের জন্মের সংবাদ জানাতে পারেননি বাংলা রচনার অক্ষমতা হেতু। এর মনস্তাত্ত্বিক এবং বিশ্লেষণগত তাৎপর্য এই যে, তাঁর পূর্বতন আবেশের উপর তাঁর নব-উন্মেষিত আত্মসচেতনতার তৎকালীন বিজয় সম্পূর্ণ এবং উপপ্লাবী। সেই আবেশ যে মগ্নতায় তাঁকে তন্ময় করেছিল, তার প্রত্যাখ্যানও তেমনি সর্বাত্মক।

এই রূপান্তরের পর মাদ্রাজ প্রবাস একান্তই অর্থহীন। তাই, সমুদ্রাভিসারী জাহাজটি লণ্ডনের বদলে কলকাতায় ফিরেছিল মধুসূদনকে নিয়ে, যদিচ

যাত্রাকালে তাঁকে কেন মিঃ হোল্ট-এর ছদ্মনাম গ্রহণ করতে হয়েছিল তা আজও রহস্যাবৃত। কলকাতা প্রত্যাবর্তনের পর মাত্র চার বছরের কাব্যোন্মাদনা কিভাবে বাংলা সাহিত্যাকাশে বৈপ্লবিক রূপান্তর নিয়ে আসে সে ইতিহাস সুবিদিত।

॥ ৩ ॥

কিন্তু, তার পরেও কথা থেকে যায়। আবেশের উপর যে বিজয়কে চূড়ান্ত ভাবা গিয়েছিল, দেখা গেল তা চূড়ান্ত নয়। চার বছরের তন্ময় সফলতা, আত্মতৃপ্তি ও এষণার চরিতার্থতার মধ্য ঐ বিজয় নিজেকে নিঃশেষিত করে ফেলে; অনেকটা যেন বঙ্কিমচন্দ্রের সন্তানদের প্রতিষ্ঠাকে বিসর্জন দেবার মত। বস্তুত, মধুসূদনের কাব্য ও প্রকৃতিতে যে অসঙ্গতি ও অসংলগ্নতা লক্ষ্য করা যায়, তা উনবিংশ শতকীয় ঔপনিবেশিক বুদ্ধিজীবীদের রাজনীতির সমতুল এবং প্রায় প্রতিফলন, যে রাজনীতি বৃটিশরাজের পিতৃত্ব কদাচ অস্বীকার ও প্রত্যাখ্যানে ইচ্ছুক ছিল না, যে রাজনীতি, বিপিনচন্দ্র পালের কথায়, ভারতবর্ষের নামে শ্বেত-দ্বীপকে ভালবেসেছিল। সাহিত্যবাসনার চরিতার্থতার পরক্ষণেই মধুসূদনের ইংল্যাণ্ড-কেন্দ্রিক আবেশ তাঁকে পুনরায় আচ্ছন্ন করে ফেলে; তিনি সত্যসত্যই বিলাতের ঐশ্বর্যশীল বন্দর অভিমুখে যাত্রা করেন, এবার অবশ্য কবিখ্যাতির স্বর্ণমৃগের সন্ধানে নয়, বারিস্টার হবার বাসনায়।

সে ইতিহাসের পুনরাবৃত্তির প্রয়োজন নেই। তবে এটুকু আমাদের নিকট মূল্যবান, ধর্মান্তরের পথে যে ট্র্যাজেডির সূত্রপাত ইওরোপ প্রবাসের লজ্জা-অপমান, দুঃখবেদনা, এবং আবেশ-আত্মোপলব্ধির সংগ্রাম সেই ট্র্যাজেডিকে যুগপৎ ঐশ্বর্য ও আন্তর জ্বালায় মহিমান্বিত করে; আর, পুনরায় নতুনভাবে আমরা প্রত্যক্ষ করি, যে প্রেয়োবাদী জীবনদর্শন আমাদের বিকৃত রেনেসাঁসের অন্যতম প্রাথমিক অঙ্গীকার ছিল তার প্রতি মধুসূদনের দুর্নিবার আকর্ষণ ও আশ্লেষ। নতুবা, ফ্রান্সে অবস্থানকালীন চৈতন্যবিবশকারী দুঃসহ অস্তিত্বের কথা বিস্মৃত হয়ে তিনি গৌরদাসের নিকট একটি পত্রে জীবনের বাকী দিনগুলো সম্ভব হলে ইওরোপে কাটানোর স্বপ্ন অভিলাষের কথা ব্যক্ত করবেন কেন, বা গৌরদাসের পুত্রকে 'Europeanised' হবার জন্য অবিলম্বে ইওরোপ পাঠানোর কথা লিখবেন কেন, বা গৃহ-প্রত্যাবর্তনের সময় আপন সন্তানদের ঐ একই উদ্দেশ্যে সেখানে রেখে আসবেন কেন! অথবা, প্রেয়োবাদী জীবনচর্যার চিত্র

এঁকে তিনি গৌরদাসকে প্রলুব্ধ করবেন কেন, 'This is unquestionably the best quarter of the globe. I have better dinners for a few francs than the Raja of Burdwan ever dreams of; I can for a few francs enjoy pleasures that it would cost him half his enormous wealth to command,—no, even that would be too little. Such music, such dancing, such beauty! This is the amravati of our ancestral creed. Come here and you will soon forget that you spring from a degraded and subject race.' এই চিত্রেও সেই ইওরোপমাতাল আবেশের সবল আত্মঘোষণা যা অসংখ্য ভারতীয়কে একদা রক্ত ও বর্ণের অভিশাপ থেকে মুক্তিলাভের হাস্যকর উন্মাদনায় বিভোর করেছিল।

অথচ, পূর্বক্ষণেই সীমাহীন দুঃখ-লাঞ্ছনার মধ্যে যখন সমগ্র পৃথিবীকে শুধুই ঘোর তমসাবৃত বলে মনে হয়েছে তখন আত্মপরিচয়ের সূত্রগুলো আবিষ্কারের জন্য তাঁর জীবনযাত্রা আমাদের বিস্ময়াবিভূত করে। সেই মানসযাত্রা তাঁকে নিয়ে আসে শৈশব স্মৃতির মধ্যে, কপোতাক্ষের কোলে যেখানে শস্যের শ্যামলিমা আর পাখিদের বিচিত্র কাকলী হৃদয় হরণ করে, বাংলার অমর কবিদের কীর্তি হৃদয় ভরে দেয় গর্বে আর অপহৃত অস্তিত্বের প্রতি জানায় ধিক্কার। হৃদয়ের অন্তহীন ক্ষোভ আর অশ্রু চতুর্দশপদী অনবদ্যতায় প্রস্ফুটিত হয়। আর, বিস্ময়ের পরেও বিস্ময়, ইওরোপকে বুদ্ধিগত দিক থেকে আবিষ্কারের জন্য ঐ গ্লানির মধ্যে কী তাঁর প্রস্তুতি; সাহিত্যের বিশ্বসভায় পরিচয় লাভ এবং সেই পরিচয়ে স্থিত থাকার জন্য কী সাধনা। এই প্রস্তুতি ও সাধনার মধ্যে আমাদের জাতীয় জাগরণের সেই সম্ভাবনাময় দিকেরই আভাস, যে আভাসে আমরা ইতিপূর্বে তাঁর কাব্যসাফল্যে প্রত্যক্ষ করেছি। ইওরোপ প্রবাস তাঁর আপাত মোহগ্রস্ততা সত্ত্বেও এই প্রত্যয়ে তাঁকে স্থিত হতে সাহায্য করে যে, আত্মপরিচয়ের মৌল সূত্রগুলো সুদৃঢ় না হলে সাহিত্যে বিশ্বজনীন মর্যাদা লাভের আশা আশার ছলনা মাত্র, তার বেশি কিছু নয়।

বরং ইংল্যাণ্ডপ্রেমের শহীদ হয়ে মধুসূদন আমাদের রেনেসাঁসের উদ্‌ভ্রান্তির প্রবলতম সাক্ষ্য স্থাপন করে গেছেন নিজ জীবনে।

॥ ৪ ॥

গভীর জীবন ও মানস সংকটের মধ্যেই মহৎ কাব্যের উৎপত্তি। সেই সংকটে উদ্বেলিত মন এই যন্ত্রণা ও মর্মবেদনার লগ্নগুলোতে এমন সব জিজ্ঞাসায় ব্যাকুল হয় যা একান্তই আপন, তেমনি অন্য দিকে এমন সব চিন্তায় প্রশ্নে আততিতে আপন হৃদয়কে ছিন্নভিন্ন করতে চায় যা বিশ্বমানবিক। অর্থাৎ, আপন প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাকে অবলম্বন করে কবিমানস সংঘাতের একটা সুস্থ সুমিত মুক্তি কামনা করে, এবং এই কামনার সিদ্ধির পথে চেতন-অবচেতন মনের এক দুর্জ্ঞেয় পরিশোধন প্রণালীর সহায়তায় উপনীত হয় এমন এক ভাবসমৃদ্ধ বন্দরে যা ব্যক্তিক আশাআকাঙ্ক্ষার বহু উর্ধ্বে সংস্থাপিত, যা বৃহত্তর জাতীয় বা মানব সত্তার আধার। এমনি ভাবে উপলব্ধির সুনিবিড় প্রগাঢ়তায় ব্যক্তিমানস ও বিশ্বমানস একই অবিচ্ছেদ্য সত্তায় ঘনীভূত ও রূপান্তরিত হয়।

পূর্বেই কথিত হয়েছে, ধর্মান্তরের মধ্য দিয়েই মধুসূদনের মানস সংকটের সূত্রপাত; বিশপস্ কালেজে অবস্থান কালে অতি দ্রুত তা এক ভয়ংকর তীব্রতা অর্জন করে, কেননা কর্তৃপক্ষের জাতিবৈষম্য ও বর্ণবৈষম্যের ঘৃণ্য নীতি তাঁকে বিদ্রোহের ক্রোধে প্রমত্ত করে; এবং মাদ্রাজে যখন তিনি পৌঁছান তখন পরিমাণগত বিশালতায় তা এমনই বিপুল হয়ে উঠে যে কোনপ্রকার মেকি সমাধান অথবা আপাতস্নিগ্ধ প্রলেপে তা প্রশমিত হবার কথা নয়। যে সাময়িক সুস্থিরতা তিনি সেখানে লাভ করেছিলেন, তা ঐ সংকটকে তাঁর অবচেতন সত্তার দুর্নিরীক্ষ্য স্তরে নিক্ষেপ করে, এবং তাঁর ইংরেজী কাব্য কলকাতাতে অনাদৃত হওয়ার দুঃসংবাদ তাঁর পূর্বোক্ত আবেশকে যেভাবে আক্রমণ করে তাতে মানসপ্রয়াসের মাধ্যমে তিনি মাতৃসাযুজ্য লাভ করেন, যে মা অতি শৈশবে তাঁর চিত্তে পুরাকাহিনী ও বীরত্বগাথার প্রতি ভালবাসার বীজ বপন করেছিলেন। শুধু তাই নয়, তাঁর শৈশবস্মৃতি, স্বপ্ন অধ্যাসের জগৎ, দেশজ কথ্যভাষার আনন্দিত স্পন্দন, শ্রুতি ও বিশ্বাস ইত্যাদির আত্মিক সান্নিধ্যও তিনি লাভ করেন। মাতৃভাষার চর্চার মাধ্যমে তাঁর যে আত্মপরিচয়ের শিকড় পুনরাবিষ্কারের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা, তাও তাঁকে ঐ একই বন্দরে নিয়ে যায়—যেখানে গণমানস আপন ঐশ্বর্যে স্বরাট; তার দুঃখবেদনা, কথনছন্দ, ভবিষ্যতের আকূতি, সুবিপুল ঐতিহ্যের আশ্রয়, ইত্যাদিকে আপন স্নায়ুর মধ্যে পরম নিশ্চিন্তিতে আশ্রিত দেখতে পান। গণমানসের এই ঐতিহ্যবাহী সম্পদই ছিল জীবনের নিয়ামক, যতদিন না তা

পাশ্চাত্য জীবনবোধের আক্রমণে খণ্ড খণ্ড হয়ে পড়ে। গণমানসের ঐ সাযুজ্য তাঁকে দেয় সেই বিশ্বদৃষ্টি ও মূল্যবোধের আশ্রয়, যাতে দেশজ জীবন বিধৃত।

অন্য কথায়, মধুসূদন রক্তে-চেনা ভাষা ও ভাষাশ্রিত মূল্যবোধের সঙ্গে একটি সক্রিয় সৃষ্টিশীল সম্পর্কে পুনরায় আবদ্ধ হন, এবং সে পথে ভাষাশ্রিত মানুষের সঙ্গেও অনুরূপ সম্পর্ক সৃষ্টিতে সমর্থ হন। সেজন্যই, ইংরেজী ও অন্যান্য ইওরোপীয় সাহিত্যের রসে আকণ্ঠ নিমজ্জিত থাকলেও তিনি সহজাত আকর্ষণেই বাংলা ভাষার দেশজ ব্যবহারের ধারায় (যেমন, রে, লো, ইত্যাদি সম্বোধন) কাব্যিক স্ফূর্তি লাভ করেছিলেন, এবং অতিশয় নিঃসংশয় চিত্তে ঘোষণা করতে পেরেছিলেন যে, সপ্তমাত্রিক পদ্যই আমাদের বাংলাভাষার হিরোয়িক মেজার,—অর্থাৎ সপ্তপদী পদ্যই বাংলায় বীররসের যথার্থ বাহন। রক্তে-চেনা ভাষার সঙ্গে এই সৃষ্টিশীল সম্পর্ক তাঁকে এই বিশ্বাসের প্রগাঢ়তায় বলিষ্ঠ করে যে, ধার করা স্যুট পরে কবিখ্যাতি অর্জন কোনকালেই সম্ভব নয়; এই ভাষার সাহায্যেই অভিপ্রেত মূল্যমান সৃষ্টি ও শ্রেয়সের বোধ জাগ্রত করা সম্ভবপর; এবং স্বপ্ন-কল্পনায় ব্যক্তিক ও বিশ্বমানবিক অনুভবের জগৎ সৃষ্টি একমাত্র মাতৃভাষার মাধ্যমেই কাম্য এবং সম্ভবপর। সেজন্য, কলকাতা প্রত্যাবর্তনের পর অনিশ্চয়ের কুয়াশা যতই বিদূরীত হতে লাগল এবং আত্মপ্রকাশের অযাচিত সুযোগ তাঁকে দিল সম্ভাবনাময় পথের সন্ধান, তখন দেশজ মানসের সঙ্গে ঐ সৃষ্টিশীল সম্পর্ক অপ্রতিরোধ্য শক্তি ও গতি ও উচ্ছ্বাসে বিচ্ছুরিত হতে লাগল। আপন কীর্তিতে হতবাক্ মধুসূদন রাজনারায়ণকে লিখলেন, 'I am afraid you think my style hard, but, believe me, I never study to be grandiloquent like the majority of the 'Barren rascals' that write books in these days of literary excitement. The words come unsought, floating in the stream of (I suppose I must call it) Inspiration.' অন্য একটি পত্রে পুনশ্চ লেখেন, 'I had no idea, my dear fellow, that our mother tongue would place at my disposal such exhaustive materials, and you know I am not a good scholar. The thoughts and images bring out words with themselves,...words that I never thought I knew. Here is a mystery for you.' এই মিষ্ট্রি বা রহস্য আর কিছুই নয়, গণমানসের সাযুজ্য পুনরাবিষ্কারের রহস্য, এবং এর সঙ্গে নিশ্চিত সৃষ্টিশীল সম্পর্ক স্থাপন করতে পারার সাফল্যের রহস্য।

এভাবে আত্মপরিচয়ের শিকড়গুলো পুনরাবিষ্কারের পথে রক্তে-চেনা ভাষা ও ভাষায় বিধৃত শ্রেয়সের বোধ দ্বারা মধুসূদনের কবিমানস পুনর্গঠিত হয়; পক্ষান্তরে, তিনিও মাতৃভাষার সম্ভাবনাময়তা বিপুলভাবে প্রসারিত করেন। ঐ প্রসঙ্গে তাঁর কাব্যের ঐহিক বৈভব, ভাষার আবেগময় স্ফূর্তি, বিবিধ কাব্য-রীতির প্রবর্তন, ইত্যাদি স্মর্তব্য। তাছাড়া, ভাষাকে নতুন অথচ ঈষৎ দুঃসাহসী মূল্যবোধের বাহন করেও তিনি তার অঙ্গে আনেন ঐশ্বর্যের দ্যুতি।

এর স্বাক্ষর বিশদভাবে বিধৃত রয়েছে মেঘনাদবধ কাব্যে, যেখানে তিনি প্রচলিত মূল্যবোধকে অস্বীকার এবং কার্যত এর রূপান্তরে অগ্রণী হন। রামায়ণ কাহিনীর মৌল কাঠামো তিনি অক্ষত রেখেছেন সত্য, কিন্তু রাম ও তার শাখামৃগ বাহিনীর প্রতি তাঁর সহজাত ঘৃণা, রাক্ষসদের প্রতি মমত্ববোধ, রাবণকে 'গ্র্যাণ্ড ফেলো' বলে প্রচার, এবং সর্বোপরি মেঘনাদের মৃত্যু বর্ণনার পূর্বাহ্নে অজস্র অশ্রুপাত (It cost me many a tear to kill him), ইত্যাদি ঘটনা ও মানসভঙ্গির মধ্যে এক নতুন মূল্যবোধের উদ্বোধন। প্রচলিত মূল্যবোধকে অস্বীকার এবং এর বিপরীতকে স্বীকৃতি দান তিনি করেছিলেন সম্ভবত এই কারণে যে, তথাকথিত আর্যদের মানবতাবিরোধী সংস্কারগুলোকে যুক্তিবুদ্ধির প্রহারে তিনি কখনও গ্রহণ করতে পারেননি, যেমন পারেননি আর্যামীর সংকীর্ণতাকে বরদাস্ত করতে। তেমনি, কাব্যের অমল ভুবনে পুষ্পার্ঘ্য দিয়ে ঐ সংকীর্ণতাকে বরণ করাও তাঁর প্রকৃতির অনুকূল ছিল না। অসততা ছিল তাঁর স্বভাবের প্রতিকূল; তাই, কাব্যেও তিনি সর্বপ্রকার অসততা, ভণ্ডামি, এবং মিথ্যা অহমিকাকে ঘৃণা করেছেন, এবং কাব্যের আন্তর সম্পদকে এদের কলুষ স্পর্শ থেকে মুক্ত রেখেছেন। আর্যামীর বিরুদ্ধাচারী রাবণকে সম্ভবত সেই কারণেই তিনি হৃদয়ে স্থান দিয়েছিলেন, এবং আর্যামীর প্রতিভূ রামকে দিয়েছিলেন সীমাহীন ঘৃণা। প্রচলিত মূল্যবোধের এবংবিধ পুনর্বিচার এবং পুনর্বিচারে একে অস্বীকারের মধ্য দিয়ে আধুনিক বাংলা কাব্যে আধুনিক মানবিক বোধের আবির্ভাব; আর এই আবির্ভাবকে সম্ভব করে তুলেছেন বলেই এবং এই অর্থেই মধুসূদন আধুনিক বাংলা কাব্যের প্রথম মানবতাবাদী কবি।

তেমনি অপরিসীম ঘৃণা ছিল তাঁর সর্ববিধ সামাজিক অনাচার, ব্যক্তিক আচরণের কলুষ, ব্যভিচার এবং পাপের প্রতি। ইয়ং বেঙ্গলের উদ্ধত জীবন-দর্শন তাঁকে কোনদিন আকর্ষণ করেনি, বরং তিনি ছিলেন তাঁদের প্রতি বিমুখ; এবং 'একেই কি বলে সভ্যতা' প্রহসনে সেই জীবনদর্শনের কলুষ তিনি

উন্মোচিতও করেছেন। এবং মেঘনাদবধ কাব্যের অষ্টম সর্গে তিনি পাপের যে বীভৎস এবং পাপীর যে ভয়াবহ শাস্তিভোগের চিত্র এঁকেছেন, তার উৎসও সেই অমল হৃদয়বৃত্তি ও মানস যা মহত্ত্বের প্রতি সতত ধাবিত, যা পাপের প্রতি ঘৃণায় উচ্চকণ্ঠ। এইসব চিত্র এমন কবিই অঙ্কনে সমর্থ যিনি মানব জীবনকে, সমাজকে বিশুদ্ধতা, পবিত্রতা ও মনুষ্যত্ববোধের মহিমা দ্বারা মহিমান্বিত দেখতে আগ্রহী। যে মানবতাবোধ মানুষকে লালন করে, বড়ো করে, শ্রেয়সের বোধে উদ্দীপ্ত করে, তার অনুপ্রাণনাই কবিকে পাপাচারের বিরুদ্ধে উন্নতমস্তক করে। কপটাচার অথবা কপটাচারী কোন মানুষকে মধুসূদন কখনও সমীহ করেছেন, এমন কোন নজির নেই।

আর্যামীর ঘৃণ্য চক্রান্তে সম্পূর্ণ অন্যায় যুদ্ধে নিহত মেঘনাদের জন্য শোকাকুল পিতা রাবণের বিলাপ, অন্ত্যেষ্টি শেষে সাশ্রুনয়নে রাক্ষসদের লঙ্কাভিমুখে যাত্রা— মধুসূদন এভাবে কাব্যের পরিসমাপ্তি টেনেছেন। এ যাত্রা যেন বিজয়া দশমীতে প্রতিমা নিরঞ্জনের পর গৃহ-প্রত্যাবর্তনের মত বিষণ্ন; প্রতিটি চোখে জল, সমগ্র রাজ্যে পরিব্যাপ্ত হতাশা, অপরিমেয় ক্ষতির বেদনা। উপসংহারের সামগ্রিক চিত্রটিকে যদি গভীরতায় বিশ্লেষণ করা যায়, তাহলে এই সিদ্ধান্ত অপরিহার্য হয়ে পড়ে যে, কাব্যের ভুবনে রূপায়িত এই বিষাদ ও অন্তর্বেদনা জীবন প্রাঙ্গণের চৈতন্য-বিবশকারী অন্য এক দুঃসহ দুঃখবেদনার প্রক্ষেপ মাত্র। এই অনুভব উজ্জ্বলতর হয় যদি ঐ চিত্রটিকে ফ্রান্সে বসে লেখা তাঁর শেষ সনেটটির সঙ্গে যোগযুক্ত করে গ্রহণ করি—

বিসর্জ্জিব আজি, মা গো, বিস্মৃতির জলে
(হৃদয়মণ্ডপ, হায়, অন্ধকার করি।)
ও প্রতিমা! নিবাইল, দেখ, হোমানলে
মনঃকুণ্ডে অশ্রুধারা মনোদুঃখে ঝরি!
শুখাইল দুরদৃষ্ট সে ফুল্ল কমলে,
যার গন্ধামোদে অন্ধ এ মনঃ, বিস্মরি
সংসারের ধর্ম্ম, কর্ম্ম! ডুবিল সে তরি,

এবে-ইন্দ্রপ্রস্থ ছাড়ি যাই দূর বনে!
এই বর, হে বরদে, মাগি শেষ বারে,—
জ্যোতির্ম্ময় কর বঙ্গ—ভারত-রতনে!

মধুসূদনের জীবনের বিচিত্র ঘটনাবলী, তাঁর কাব্যের অনুভূতিক ব্যঞ্জনা ও তাৎপর্য ও ভাবসম্পদকে যদি একই সূত্রে গ্রহণ করা যায়, এবং তাদের একটি পরিব্যাপ্ত সমগ্রের নিশ্চিত অভিব্যক্তি স্বরূপ গণ্য করা যায়, যে সমগ্রের অপর নাম ইতিহাসের আন্তর বেদনা, তাহলে তা সুগভীর 'অর্থবহ' হ'য়ে উঠে। যে অশ্রুসিক্ত বর্ণনায় মেঘনাদবধের পরিসমাপ্তি, এবং যে মর্মবেদনা ফ্রান্সে তাঁর সমগ্র অস্তিত্বকে নাড়া দিয়েছিল এবং নয়নযুগলকে করেছিল আচ্ছন্ন, কাব্যের ক্ষেত্রে তার উৎস নিশ্চয়ই স্পর্ধিতমস্তক রাবণের প্রতি ভালবাসা; আর, বৃহত্তর জাতীয় পরিসরে তার উৎস স্বাধীনতা, জাতীয় আত্মমর্যাদা এবং আত্মপরিচয় হারানোর বিপর্যয়। মধুসূদনের মাদ্রাজ বক্তৃতার অন্তর্নিহিত ভাবসম্পদও এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়। যে অন্তর্জ্বালায় তাঁর হৃদয় মথিত হয়েছিল, রূপ-কল্পনার আর স্বপ্নবাসনার জগতে তাই বিচিত্র আর্তিতে অভিব্যক্তি লাভ করেছে। আমাদের সৌভাগ্য যে, সেই অন্তর্জ্বালা তাঁকে সৃষ্টির পথ দেখিয়েছিল, ইয়ংবেঙ্গল সুলভ নৈরাজ্যের নয়। কারণ, তিনি মুক্তির আহ্বান ও আস্বাদন লাভ করেছিলেন কাব্যের স্বাভাবিক প্রবণতায়, প্রাবল্যে। আর সেই মুক্তির আহ্বান লিপি তিনি পেয়েছিলেন জীবন রূপান্তরের সদিচ্ছায় ও মানবতাবোধে, অন্ধ মৃত্যুতে নয়।

॥ ৫ ॥

মধুসূদনের ট্র্যাজেডির বুদ্ধিমার্গীয় তাৎপর্য অতিশয় স্বচ্ছ। ঔপনিবেশিক শাসন ব্যবস্থার অধীনে ভারতীয় সমাজ থেকে উদ্ভূত শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বুদ্ধিজীবীর দল দেশজ সংস্কৃতি, সমাজ ও জনসমষ্টি থেকে বিচ্ছিন্ন অনন্বিত হয়ে পড়েন; এই অনন্বয় ছিল তাঁদের অমোঘ বিধিলিপি। ইয়ং বেঙ্গলরা তো নিজেদের সর্বভাবে ইওরোপীয় বলেই গণ্য করতেন। কিন্তু, ইওরোপীয় সমাজে তাঁদের না ছিল কোন আসন, না ছিল কোন স্বীকৃতি; অথচ, এ দিকে তাঁরা জন্মসূত্রে লব্ধ সমাজের স্নেহের আসনটিও হারিয়ে ফেলেছিলেন। এই উৎকেন্দ্রিক অবস্থায় তাঁদের উপলব্ধিতে এই সত্য কদাচ প্রতিভাত হয়নি যে, বিচ্ছিন্নতা বা অনন্বয় দেশজ ঐতিহ্য, সংস্কৃতি বা জীবনের সঙ্গে কোন সৃষ্টিশীল সম্পর্ক বা ঐক্য গড়ে তোলে না; অনন্বয় নিতান্তই একটা নেতিবাচক অনুর্বর সম্পর্ক। তা অনন্বিত ব্যক্তির নিকট যেমন ফলপ্রসূ নয়, তেমনি যে সমাজ থেকে তিনি বিচ্ছিন্ন তার পক্ষেও কল্যাণপ্রদ নয়। স্থানকালের যে ইতিহাস ও ঐতিহ্য ব্যক্তিবিশেষকে দেয় আত্মপরিচয়ের গৌরব এবং একটি বিশিষ্ট

মূল্যবোধে আশ্রিত থাকার সৃষ্টিশীল মনোভঙ্গি, অনন্বয় তা বিনাশ করে নিষ্ঠুর ভাবে। ফলে, এমন এক ত্রিশঙ্কু অস্তিত্বের আবির্ভাব ঘটে যেখানে অনন্বিত ব্যক্তির নিকট সহজাত বা দেশজ সম্পর্ক বা বন্ধনগুলোর আর কোনই কদর থাকে না; কৃত্রিম উপায়ে লব্ধ বন্ধনগুলোই একমাত্র উপাস্য হয়ে দাঁড়ায়। আর বাড়াবাড়িতে তা মধুসূদনের মত ট্র্যাজেডিতেই পরিসমাপ্তি লাভ করে।

তাঁর কালের অন্যান্যদের মত মধুসূদনও অনন্বিত হয়েছিলেন, শুধু সাম্রাজ্যবাদী শাসনব্যবস্থা কর্তৃক প্রবর্তিত শিক্ষাব্যবস্থার বিষ আকণ্ঠ পান করে বা শিক্ষা-সংস্কৃতিতে ইওরোপকে আত্মস্থ করার অতিশয় আগ্রহের পথে নয়; তাঁর অনন্বয় অনুভব-উপলব্ধিতে তীব্রতর হয়েছিল আরও একারণে যে তিনি ধর্মান্তরিত হয়েছিলেন। তৎকালীন সমাজ-পরিবেশে ধর্মান্তরিত হওয়ার অবশ্যম্ভাবী প্রতিক্রিয়া কিরূপ ভয়ংকর হতে পারত, সমাজ-ইতিহাসবেত্তা ব্যক্তি মাত্রই তা জানেন। জীবনের বিভিন্ন স্তরে ইংল্যাণ্ড-প্রেমী জীবনবোধের আবেশ কাটিয়ে তিনি দেশজ ঐতিহ্যের মানস-সাযুজ্য লাভ করেছিলেন সত্য, কিন্তু সেই সাযুজ্য পূর্ণতায় ঐকান্তিকতায় কখনও সেই বলিষ্ঠতা অর্জন করেনি যে বলিষ্ঠতা আত্মপরিচয়ের গৌরবে অর্জন করেছিলেন বিদ্যাসাগর অথবা ভূদেব মুখুজ্যে। সেজন্য, অসংলগ্নতা এবং স্ব-বিরোধ তাঁর প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য। রক্তে-চেনা ভাষাই সাহিত্যকর্ম ও যাবতীয় আত্মপ্রকাশের একমাত্র এবং উপযুক্ত মাধ্যম, এই উপলব্ধি জাগ্রত হওয়া সত্ত্বেও তিনি কিন্তু পূর্বাপর তাঁর সমস্ত চিঠি ইংরাজীতেই লিখে গেছেন; যেমন, স্বদেশধর্মে হৃদয় উদ্বেল হওয়া সত্ত্বেও বঙ্কিমচন্দ্র কদাচ প্রত্যক্ষ রাজনীতিতে যোগদান করার বিষয় চিন্তাও করেননি। এই স্ববিরোধ ইংল্যাণ্ডের পিতৃত্বে লব্ধ রেনেসাঁসেরই অসংলগ্নতা। এই অসংলগ্নতার ঐতিহ্য আজও আমাদের ইংরেজী-বাংলা মেশানো কিস্তূত কথন-রীতিতে বহমান।

মধুসূদনের জীবন ও কীর্তিকে যখন বৃহত্তর প্রেক্ষিতে পর্যালোচনা করি তখন একজন ইংরেজ মহিলার সঙ্গে তাঁর বিবাহের ব্যাপারটাও একটা প্রতীকী তাৎপর্যে ভাস্বর হয়ে উঠে। তাহলো এই: ইংল্যাণ্ডের সঙ্গে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ ভারতের রেনেসাঁসের বিপর্যয় ছিল অবশ্যম্ভাবী; বর্ণে, আন্তর প্রেরণায়, দেহ-সৌষ্ঠবে, এবং অভিব্যক্তিতে তা সঙ্করজাতীয় বলেই এর শোচনীয় অপরি-পূর্ণতা ছিল পূর্বনির্দিষ্ট নিয়তি। উপমা ও আদর্শের সন্ধানে এ বরাবর শুধু ইওরোপের আলো-আঁধারের দিকে তাকিয়ে থেকেছে, এবং ধার-করা পোষাকে

আপনার আত্মিক সিদ্ধি খুঁজেছে। এই ভ্রান্ত উপমা অনুসন্ধান সম্পর্কে মধুসূদন স্বয়ং একবার বলেছিলেন, তাঁর নাটক বিচারে যাঁরা শেক্সপীয়রীয় শিল্পরীতি প্রয়োগ করেন তাঁরা বিস্মিত হয়ে যান যে আমাদের পরিবেশ সম্পূর্ণ ভিন্নজাতের, আমাদের সামাজিক ও নৈতিক বিবর্তন সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। এই উক্তিকে প্রাথমিক সোপান করে যে যুক্তিবহ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়, মধুসূদন-মানস কিন্তু তাতে অর্থাৎ জাতীয় স্বকীয়তায় স্থিত থাকেনি। তাঁর ইংল্যাণ্ডপ্রেমী আবেশ ক্ষণে ক্ষণে তাঁকে আচ্ছন্ন করেছে, সত্য সম্পর্ককে পরিত্যাগ করে কৃত্রিম সম্পর্কের পানে তাঁকে ধাবমান করেছে ; যেমন আমাদের রেনেসাঁসগর্বী নকল সায়েবরা রক্তে-চেনা ভাষাকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করে আত্মশ্লাঘা অনুভব করতেন।

মধুসূদনের ট্র্যাজিডির সৃষ্টিশীল ও অর্থবহ ইংগিত সেজন্যই অপরিসীম। ফ্রান্স থেকে লেখা একটি অপূর্ব পত্রে তিনি গৌরদাসকে লিখেছিলেন, 'I pray God, that the noble ambition of Milton to do something for his mother-tongue and his native land may animate all men of talent among us. If there be anyone among us anxious to leave a name behind him, and not pass away into oblivion like a brute, let him devote himself to his mother-tongue. That is his legitimate sphere—his proper element..........Let those who feel that they have springs of fresh thought in them, fly to their mother-tongue. Here is a bit of 'lecture' for you and the gents who fancy that they are Swarthy Macaulays and Carlyles and Thackerays. I assure you, they are nothing of the sort. I should scorn the pretensions of that man to be called 'educated' who is not master of his own language.......Believe me, my dear fellow, our Bengali is a beautiful language, it only wants men of genius to polish it up. Such of us as, owing to early defective education, know little of it and have learnt to despise it, are miserably wrong. It is or rather, it has the elements of a great language in it.'

ইংল্যাণ্ডপ্রেমী জীবনদর্শনে যাঁরা উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন, ইংরেজীকেই ঐহিক ও পারত্রিক চিন্তার একমাত্র বাহন হিসাবে গণ্য করেছিলেন এবং উত্তরপুরুষদের

মোক্ষলাভের জন্য যাঁরা এই দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গিয়েছিলেন, তাঁদের মনোভঙ্গির এমন সুন্দর সমালোচনা তৎকালে দুর্লভ ছিল। এরূপ আত্মসমালোচনা মধুসূদনের পক্ষে সম্ভবপর হয়েছিল, কারণ, ঐতিহাসিক লগ্নের সম্ভাবনাময়তা তিনি পরিপূর্ণভাবেই উপলব্ধি করেছিলেন, দাসত্বের বন্ধনগুলো সম্পর্কে তাঁর সচেতনতা অগভীর ছিল না, এবং মুক্তিপথের সন্ধানও তাঁর অজানা ছিল না (বায়রণের কাব্যে তা ইতস্তত. ছড়ানো ছিল), এবং নিজের ব্যর্থতা অক্ষমতার করুন অশ্রুসাগরে ভেসেছেন। কিন্তু এই ক্রন্দন আমাদের রেনেসাঁসের সাধারণ স্বীকৃত বৈশিষ্ট্য ছিল না, অথবা হয়ও নি। যদি হতো তাহলে মধুসূদনের কালেই এই বাণী আমরা শুনতে পেতাম যে, ঔপনিবেশিক শাসনব্যবস্থা নির্ধারিত সীমার মধ্যে নয়, ইংরেজী ভাষার মাধ্যমে নয়, ইংল্যাণ্ডমাতাল হওয়ার পথে নয়, এদের অস্বীকার এবং অতিক্রম করে জীবনের সর্ববিধ সৃষ্টিশীল অভিব্যক্তিতে স্বরাট হওয়ার পথেই প্রকৃত রেনেসাঁসের চরিতার্থতা।

বাংলার নবজাগরণ ও বিদ্যাসাগর

বাংলার নবজাগরণে বিদ্যাসাগরের অবদান সম্পর্কে আলোচনার পূর্বে কিছু বুদ্ধিমার্গীয় সীমা চিহ্নিত করে নেওয়া প্রয়োজন।

ঔপনিবেশিক আর্থনীতিক-রাজনৈতিক কাঠামো থেকে, বিশেষত ইংরেজি শিক্ষার মাধ্যমে, আবির্ভূত বুদ্ধিজীবীর দল তাঁদের মানবজীবনের বিচরণভূমিকে অনায়াসেই চিনে নেয়। তাঁরা ঐ রাষ্ট্র কাঠামোর সন্তান, বুদ্ধিমার্গীয় অর্থে; আবার, অনেকেই এমন পরিবারের সন্তান যারা ইংরেজ-প্রবর্তিত চিরস্থায়ী ভূমি বন্দোবস্তের কল্যাণে প্রভূত ভূমি ও অর্থের কৌলিন্য লাভ করেছিল, অথবা ইংরেজের সহযোগিতায় ব্যবসা বাণিজ্যের দৌলতে দেশশোষণের অধিকার লাভ করেছিল এবং নব ধনিক সম্প্রদায়রূপে আত্মপ্রকাশ করেছিল। যারা শুধুই স্বর্ণ মৃগয়ার দৃষ্টিকোণ থেকে ঔপনিবেশিক শাসনব্যবস্থার প্রতি তাকিয়েছে, তারা যেমন একে বিধাতার আশীর্বাদ স্বরূপ গণ্য করেছে, তেমনি যারা বুদ্ধিমার্গীয় বিচারে—নতুন জীবনদর্শন ও সামাজিক ভাবাদর্শের ধারক ও বাহকরূপে গণ্য করেছে—তারাও একে বিধাতার আশীর্ব্বাদ স্বরূপ মনেপ্রাণে গ্রহণ করেছে। এবং কালক্রমে এই তৎকালীন বিচারে অনিবার্য সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে যে, পাশ্চাত্যের বিশ্বদৃষ্টিই ভারতবর্ষীয় সমাজের মুমূর্ষু অবস্থায় নবজীবনের সঞ্চার করতে সমর্থ। সুতরাং, বৈষয়িক সমাজ-সংগঠন এবং মানসজীবন—উভয় ক্ষেত্রেই পাশ্চাত্যের আদর্শের অনুসরণ করাই প্রগতিশীলতা! সমষ্টি-জীবনের ক্ষেত্রে যেমন সত্য, তেমনি সত্য ব্যক্তিজীবনে; কেননা, ঐ জীবনদর্শনেই ব্যক্তি একক সত্তারূপে স্বীকৃত।

বাংলার নবজাগরণের এ হল প্রাথমিক স্তর। এই পর্বের স্ব-বিরোধ ও সীমাবদ্ধতা অবশ্যই প্রকট; কারণ, এক দেশের ইতিহাসকে অন্য দেশের ইতিহাসের মানদণ্ডে গড়ে তোলার প্রাণান্তকর প্রচেষ্টা পরিণামে বিশেষ ফলপ্রসূ হয়নি। হয়নি আরও এ কারণে যে, ঐ প্রচেষ্টা দেশের মাটি ও জীবন থেকে সঞ্জীবনী শক্তি আহরণ করেনি। কিন্তু, এর সৃষ্টিশীল দিকটাও কম আকর্ষণীয় নয়। সেদিক হল, গ্রামীণ অবক্ষয় থেকে মুক্তি, আর্থনীতিক ও রাজনৈতিক এবং মানবিকতার সম্পর্কে সমগ্র বিশ্বের সঙ্গে সংযুক্ত হওয়া, মানবিক ঐক্যের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হওয়া।

রাজনৈতিক প্রেক্ষিতে ইংরেজ শাসনকে বিধাতার আশীর্বাদরূপে গণ্য করার মধ্যে যে দাসত্বের স্বীকৃতি রয়েছে, প্রাথমিক উচ্ছ্বাসের দিনে সেকথা কেউ বিশেষ উপলব্ধি করেনি ; উপলব্ধি না করার পথে প্রেরণা জুগিয়েছে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ও বাণিজ্য সঞ্জাত বৈষয়িক সমৃদ্ধির স্বার্থপরতা। যদিও এবংবিধ পশ্চাদাকর্ষণ বিদ্যাসাগরের ছিলনা, তথাপি তাঁর রাজনৈতিক বোধও ইংরেজি শিক্ষাভিমানী বুদ্ধিজীবীদের থেকে স্বতন্ত্র ছিল না। বরং এ সিদ্ধান্ত অমূলক নয় যে, বৃহত্তর কোন রাজনৈতিক জিজ্ঞাসায় তিনি কখনও অস্থির হননি একারণে যে ইংরেজ শাসনের পরোক্ষ সৃষ্টিশীলতায় তাঁর মন ছিল আবিষ্ট, এবং তিনি একে নিশ্বাসবায়ুর মতই সত্য ও ধ্রুব বলে মেনে নিয়েছিলেন। তার মধ্যে দাসত্ব কতটুকু, দাসত্বের বিনিময়ে লব্ধ কল্যাণের পরিমাণই বা কতটুকু এবং সেই বিশ্লেষণ ও বিচার তাঁর রচনায় অনুপস্থিত, বরং নির্ভরশীলতাই অধিক। সামাজিক ভাবনায় উদ্বিগ্ন সমকালীন অন্যান্যদের মত তাঁর মনোজীবনের এই কাল-নির্ধারিত সীমারেখা অবশ্যই স্বীকার্য।

সেই সীমার মধ্যে থেকে বিদ্যাসাগরের অবদান বিস্ময়কর। তার কর্মের মধ্য দিয়ে পুনরায় প্রমাণিত হয় যে, মনের গতিশীলতার নিকট স্থানকাল ও সংস্কারের বাধা কোন প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারে না। তিনি বার বৎসর ভারতীয় শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন করেছিলেন ; সুতরাং এটা প্রত্যাশিত ছিল যে, তিনি ভারতীয় সমাজচিন্তা, জীবনজিজ্ঞাসা, সংস্কার ও ঐতিহ্যে স্থিত থাকবেন। কিন্তু, অধ্যয়ন পর্ব শেষ করে কর্মজীবনে প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গে দেখা গেল যে, পাশ্চাত্যের সামাজিক ন্যায়শাস্ত্রাদির মর্মবাণী এবং সংস্কারজয়ী মনন তাঁর চিত্তকেও স্পর্শ করেছে! তাঁর সংবেদনশীল চিত্ত ও জীবনবোধ নিশ্চিত এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে যে, সার্বিক অধঃপতনের হাত থেকে ভারতবর্ষকে আত্মরক্ষা করতে হয় এবং পুনরায় আত্মপ্রতিষ্ঠার পথে অগ্রসর হতে হয়, তাহলে তার নিথর সমাজকে পশ্চিমের গতি দিয়ে সঞ্চালিত করতে হবে। বাংলার নবজাগরণে বিদ্যাসাগরের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ অবদান, আমার ব্যক্তিগত ধারণায়, সমাজমানসে আধুনিক গতির সঞ্চার এবং তাকে উজ্জীবিত রাখার কর্মোদ্যম।

এই বিশেষ কর্মোদ্যমে তাঁর মন কি ভাবে বিবর্তিত হয়েছে, তার যৎকিঞ্চিৎ পরিচয় গ্রহণ করা যাক। যে কোন সামাজিক আন্দোলনের সফলতাই ভাবাদর্শের ক্ষেত্রে সংগ্রামের সফলতার উপর নির্ভর করে। জ্ঞাতসারেই হোক অথবা উপস্থিত প্রেরণার বশেই হোক, বিদ্যাসাগরও প্রথম আঘাত ভাবাদর্শের

ক্ষেত্রেই হানেন। কাশীর সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ ডাঃ ব্যালেন্টাইন কলকাতার সংস্কৃত কলেজ সম্পর্কে একটি প্রতিবেদন সরকারের নিকট পেশ করেছিলেন। সেই প্রতিবেদন সম্পর্কে তাঁর মতামত চাওয়া হলে বিদ্যাসাগর শিক্ষা দপ্তরকে সংস্কৃত কলেজে অনুসরণীয় নীতি সম্পর্কে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় জানান, এমন এক শ্রেণীর লোক সৃষ্টি করা তাঁর জীবনের ব্রত যারা সবরকম শাস্ত্রে হবে সুপণ্ডিত অথচ এ-দেশের কুসংস্কার যাদের মানস পরিমণ্ডলকে কোনভাবেই স্পর্শ করবে না। তাঁর আশা, কলেজে শিক্ষাপ্রাপ্ত ঐ শ্রেণীর লোকেরাই এক সময় গ্রামাঞ্চলে ছড়িয়ে পড়বে, এবং দেশবাসীর মধ্যে জ্ঞানের আলোক বিস্তার করবে। সমাজ-মানস গতির স্পন্দনে আন্দোলিত হবে। বেদান্ত ও সাংখ্য, এবং অপরদিকে আদর্শবাদী পাশ্চাত্য দর্শনের পঠন-পাঠন দ্বারা সেই উদ্দেশ্য চরিতার্থ হবে না। তিনি পরিষ্কার ভাষায় ঘোষণা করেন, নানা কারণে সংস্কৃত কলেজে বেদান্ত ও সাংখ্য দর্শন পড়াতে হলেও দার্শনিক তত্ত্বরূপে ঐগুলো যে নিতান্তই ভ্রান্ত সে বিষয়ে তাঁর কোনরূপ সন্দেহ নেই। ঐগুলোর পঠন-পাঠনের মাধ্যমে ছাত্রদের মধ্যে দেশ-কাল-জীবন সম্পর্কে যে ধারণার সৃষ্টি হবে, তা থেকে তাঁদের বিযুক্ত করার জন্য তিনি জন স্টুয়ার্ট মিলের গ্রন্থাদির পঠন-পাঠন অপরিহার্য বলে অভিহিত করেন। কারণ, মিল তাদের মনকে পরিশুদ্ধ করায় এবং সত্যনিষ্ঠ ও বুদ্ধিবাদী রাখার সহায়ক হবে। প্রায় একই সময়ে ডাঃ মোয়াটের নিকট লেখা একটি পত্রে তিনি বাংলার প্রকৃত অধিকার জন্মানোর জন্য সংস্কৃত পঠন-পাঠনের ব্যবস্থার কথা; এবং তারপরে বিশুদ্ধ জ্ঞান সঞ্চারের জন্য ইংরেজি পঠন-পাঠনের কথা উল্লেখ করেছিলেন। লক্ষ্য করার বিষয়, ইংরেজি পঠন-পাঠনকে তিনি মানুষের মনকে মুক্ত পরিচ্ছন্ন এবং পরিশুদ্ধ করার বাহন স্বরূপ গণ্য করছেন এবং ভারতীয় দর্শনচিন্তার ঐতিহ্যকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করছেন।

ভাবাদর্শের ক্ষেত্রে এভাবে আধিপত্য বিস্তার করার পর তিনি কর্মক্ষেত্রে আত্মনিয়োগ করেন। এখানেও তাঁর বিবেক, কাল-সচেতনতা ও ব্যবহারিক বুদ্ধির বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়। যদিও তিনি ইংরেজি চর্চাকে ছাত্রদের মানস পরিমণ্ডল পরিশুদ্ধ করার হাতিয়াররূপে ব্যবহার করতে চেয়েছেন, তথাপি তাঁর ব্যবহারিক বোধ তাঁকে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছে দিয়েছিল যে, ইংরেজিকে সুদূরতম পল্লীর প্রান্তে নিয়ে যাওয়া এক অবাস্তব প্রস্তাব। তাছাড়া, পাশ্চাত্যের যুক্তিবাদী মনন ও মূল্যবোধের বাহন ইংরেজি হতে পারে না, হবে মাতৃভাষা। সেজন্য, প্রথম থেকেই তিনি বাংলা স্কুল স্থাপনের ব্যাপারে অতিশয় আগ্রহী ছিলেন।

সরকারী প্রয়াসের সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিত্ব উত্তম ও অসামান্য শ্রমসহিষ্ণুতা সংযুক্ত হয়ে বিভিন্ন জেলায় অনেকগুলো বাংলা ও মডেল স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়। আবার, স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের অভূতপূর্ব কার্যক্রমও সমান্তরালভাবে গৃহীত হয়। এসব কার্যক্রমের একটিমাত্রই লক্ষ্য—অচল সমাজমানসে গতির সঞ্চার। বিদ্যাসাগরের মধ্যেও অনুচ্চারিত এই উপলব্ধি প্রত্যক্ষ করি যা পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথ সুন্দরভাবে ব্যক্ত করেছিলেন, মনের চলাচল যতখানি, দেশ ততখানি বড়।

এর পরেই উল্লেখনীয় বৈশিষ্ট্য হল, বিদ্যাসাগরের মানব স্বীকৃতির দিক। তাঁর জীবনের নানাবিধ কর্মের—সামাজিক ও অন্তর্নিহিত আত্মিক সম্পদের যদি তাৎপর্য গ্রহণ করা যায়, তাহলে দেখা যাবে তাঁর চিন্তায় এমন একটা বোধ জাগ্রত হয়েছিল যে, জাগতিক সম্পর্কের মধ্যে মানুষের মানবতার অম্লান স্বীকৃতি দান করতে হবে। তাঁর দুর্বার কর্মপ্রাণতার তাত্ত্বিক সংকেত বোধ করি এই, মানুষকে স্বীকার করতে হবে; এবং তাকেই সমস্ত কর্মের উৎস এবং লক্ষ্য বলে উপলব্ধি করতে হবে। প্রবহমান সমাজজীবন একের পর এক যে সমস্যা তুলে ধরে, তাকে আত্মগত করা, যুক্তি বিচারে সমস্যার সমাধান উদ্ভাবন করা, এবং সমাধানের পথে কালের মানুষকে সৃষ্টির ঐশ্বর্যে মণ্ডিত করা—সংবেদনশীল মানুষ একেই সত্যের স্বরূপ বলে গ্রহণ করে। বিদ্যাসাগর যেন তাঁর কালের মানুষকে উপলব্ধি ও স্বীকৃতি দান করতে চেয়েছেন ভবিষ্যতের আবির্ভাবকে সুগম করার জন্য। তাঁর মানব স্বীকৃতির দৃষ্টান্ত স্বরূপ কয়েকটি ঘটনার উল্লেখ করা যায়: ১ ৬৭ সনের দেশব্যাপী দুর্ভিক্ষের কালে তিনি নিজগ্রামে অন্নসত্র খোলেন। অন্নসত্র খোলাটা বড়ো কথা নয় নিশ্চয়ই, বড়ো কথা হল আশ্রয়প্রার্থী ও আশ্রিত লোকজনকে ব্যক্তিগতভাবে তিনি স্বয়ং পরিচর্যা করেছিলেন, শুশ্রূষা করেছিলেন, আসন্ন-প্রসবা নারীদের তৃপ্তির জন্য স্ত্রী-আচারাদির অনুষ্ঠান করিয়েছিলেন। ১৮৬৮-৬৯ সনে বর্ধমানে মুসলমান বস্তিতে তাঁর সেবাকার্যের কথা স্মরণীয়। তখনকার দিনের জাতি ও বর্ণবিভিন্ন সমাজে জাত-খোয়াবার তোয়াক্কা না করে মানবতার সেবায় অগ্রসর হওয়া নিশ্চয়ই এক নতুন মানবিক বোধের সংকেত বহন করে। তেমতি, কার্মাটাঁড়ের সাঁওতাল অধিবাসীদের উন্নতির জন্য বিদ্যাসাগরের যে কর্মোদ্যম ও ত্যাগ, তার পশ্চাতেও সেই মানবিক বোধেরই অম্লান অভিব্যক্তি।

তাছাড়া, স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের কার্যক্রম এবং হিন্দু বিধবাদের পুনর্বিবাহের জন্য দেশব্যাপী আন্দোলনের সংগঠন এসবের অন্তর্নিহিত তাৎপর্যও সেই মানব-

স্বীকৃতি। ভারতীয় অধ্যাত্মচিন্তা যদিও সমস্ত মানুষকেই অমৃতের সন্তান বলে ঘোষণা করেছে, তথাপি প্রত্যক্ষ সমাজ সংগঠনে কার্যত মানুষকে কোন মর্যাদা দান করা হয়নি; বরং পদে পদে তা অস্বীকৃতই হয়েছে। বিদ্যাসাগরের যে মানবিক বোধের উদ্বোধন দেখা যায়, তা পাশ্চাত্যের দেহাত্মবাদী মানবতার ফলশ্রুতি। ঔপনিবেশিক বুদ্ধিজীবীরা তত্ত্বচিন্তায় তা স্বীকার করেছেন, কর্মবাদী বিদ্যাসাগর তা ব্যবহারিক ক্ষেত্রে রূপায়িত করার জন্য সংগ্রাম করেছেন। এমন কি, বহুবিবাহ আইনত নিষিদ্ধ করার জন্য তিনি যে আন্দোলনের সূত্রপাত করেছিলেন কিন্তু সফলকাম হননি, তারও তাৎপর্য হল শত শত বৎসরের মানবিক অবক্ষয় ও অস্বীকৃতিকে প্রতিহত করা, এবং তখনও পর্যন্ত ভারতবর্ষীয় সমাজ-মানসে মানবিকবোধের যেটুকু অস্তিত্ব ছিল তাকে পুনরুজ্জীবিত ও প্রতিষ্ঠিত করা। বিধবাবিবাহ আইনত সিদ্ধ বলে ঘোষণা করার জন্য বিদ্যাসাগর গণ-স্বাক্ষর সম্বলিত যে আবেদন পেশ করেছিলেন, তাতে একস্থানে উল্লেখ ছিল, এরূপ বিবাহ মানব-প্রকৃতিবিরুদ্ধ নয়, অথবা পৃথিবীর অন্য কোন দেশে অথবা অন্য কোন জাতির সামাজিক আইন বা দেশাচারে নিষিদ্ধ নয়। এই উক্তিটির মধ্যেও মানবিকতার পথে সম-আদর্শের ভিত্তিতে বিশ্ববাসীর সঙ্গে মিলিত হওয়ার আগ্রহ প্রকাশ পেয়েছে, যে মানবিক ঐক্যের বৈষয়িক ভিত্তি ঔপনিবেশিক শাসনব্যবস্থা সৃষ্টি করেছিল।

বিদ্যাসাগর ঈশ্বরে বিশ্বাস করতেন না বলে একটি জনশ্রুতি প্রচলিত আছে। একথার সত্যতা প্রমাণ করা অবশ্য কঠিন, অপ্রমাণও করা চলে না। তবে, অধ্যাত্মচিন্তা সম্পর্কে তাঁর কোনরূপ আগ্রহ না থাকায় এবং পরমার্থবাদী দর্শন-চিন্তায় তাঁর নিশ্চিত অবিশ্বাস থাকায়, তাঁর চিন্তা-মননে নাস্তিকতার অস্তিত্ব অনুমান করা যায়। মনে হয়, এই বস্তুসম্পর্কে বিধৃত পৃথিবীটাই তাঁর সত্য-জিজ্ঞাসার বিষয়বস্তু; এই পৃথিবীটাই তাঁর সাধনার ক্ষেত্র, এবং সাধনার লক্ষ্য হল মানুষ। সমাজরূপান্তরের জন্য বিদ্যাসাগরের আন্দোলন ও সংগ্রাম সম-কালীন মানুষের নিকট কী গুরুত্ব নিয়ে আবির্ভূত হয়েছিল, তা রমেশচন্দ্র দত্তের একটি উক্তিতে প্রতিভাত হবে। উক্তিটি এইরূপ: "একদিকে স্বার্থপরতা, জড়তা, মূর্খতা, অন্যদিকে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। একদিকে বিধবাদের উপর সমাজের অত্যাচার, পুরুষের হৃদয়শূন্যতা, নির্জীব জাতির নিশ্চলতা, অন্যদিকে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। একদিকে শত শত বৎসরের কুসংস্কার ও কুরীতির ফল, অন্যদিকে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। একদিকে নির্জীব, নিশ্চল, তেজোহীন বঙ্গ-

সমাজ, অন্যদিকে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।" ঐ সংগ্রাম যেমন ঐকান্তিক তেমনি আপসহীন।

ঔপনিবেশিক শাসনব্যবস্থা অবশ্য এই সংগ্রামের বিষয়গত পটভূমি সৃষ্টি করে তুলেছিল, ভারতবর্ষের প্রাকৃতিক ও ভৌগোলিক চেহারা অভাবনীয়রূপে রূপান্তরিত করার মাধ্যমে। পরিবহণ ও যোগাযোগের জন্য সুপরিকল্পিত রাস্তাঘাট নির্মাণ, রেলওয়ে সংস্থাপন, সুবিন্যস্ত ডাক-তার ব্যবস্থার প্রবর্তন, ইত্যাদির মাধ্যমে সাম্রাজ্যবাদী শাসকগোষ্ঠী নিজেদের স্বার্থের খাতিরে ভারতের আভ্যন্তরীণ বিধিব্যবস্থা ও আর্থনীতিক-রাজনৈতিক জীবনে ঐক্য প্রতিষ্ঠা করছিল। ঐসব ব্যবস্থা গ্রহণের ফলে জন-চলাচল আকস্মিকভাবে বৃদ্ধি পায়, ব্যবহারিক জীবনে গতিশীলতার সঞ্চার হয়, ব্যক্তি নানাবিধ পারিবারিক ও সামাজিক বন্ধন থেকে মুক্তিলাভ করে আপন খুশিমত চলার শক্তি অর্জন করে। এইসব বৈষয়িক কর্ম-পরিকল্পনার সমান্তরালভাবেই চলছিল বিদ্যাসাগরের আন্দোলন, যার সার্বিক লক্ষ্য ছিল সমাজমানসে গতির সঞ্চার। সেই আন্দোলন শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে যেমন, নারীমুক্তি আন্দোলনের মধ্যেও তেমনি, মানবিক বোধের পুনরুজ্জীবনের ক্ষেত্রে যেমন, সাহিত্যরীতিতে গতিশীলতার উদ্বোধনেও তেমনি প্রকট। অবশ্য, পাশ্চাত্যের জীবনাদর্শের প্রতি তাঁর আনুগত্য সত্ত্বেও ইয়ং বেঙ্গল বলে আখ্যাত গোষ্ঠী থেকে তাঁর কর্মের প্রকৃতি ও আবেদন ছিল ভিন্ন জাতের। ইয়ং বেঙ্গল গোষ্ঠী যেখানে ছিল বিদ্রোহের কলরবে মুখর এবং শুধু বুদ্ধিমার্গীয় চিন্তায় সীমাবদ্ধ, বিদ্যাসাগর সেখানে ব্যবহারিক কর্মের মাধ্যমে গ্রাম-গ্রামাঞ্চলে বিস্তৃতি লাভ করেছিলেন, নবলব্ধ আলোকে গতিতে জনজীবনকে উদ্দীপ্ত করার চেষ্টা করেছিলেন। অন্যান্যরা যেখানে উচ্ছৃঙ্খল আচরণের ভেতর দিয়ে অবক্ষয়ের পথ প্রশস্ত করছিলেন, বিদ্যাসাগর সেখানে অসামান্য চারিত্রিক দৃঢ়তা, শুদ্ধ সংযত জীবনযাপন, ঐকান্তিকতা এবং অবক্ষয়ী মনোবৃত্তির বিরুদ্ধে নিয়ত সংগ্রাম করে সৃষ্টির পথকে নির্মল ও আলোকিত রাখার কাজে ব্যাপৃত ছিলেন। কালের বিবেক তাঁর চিন্তা-মননকে আশ্রয় করে অভিব্যক্তি লাভ করছিল।

অবশ্য একথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, বিদ্যাসাগর বিপ্লবী ছিলেন না; বর্তমান যুগে যে গূঢ় অর্থে আমরা বিপ্লব শব্দটিকে উপলব্ধি করি, তিনি সেই অর্থে কোনমতেই বিপ্লবী ছিলেন না। ঔপনিবেশিক শাসনব্যবস্থার ছত্রছায়ায় স্থিত থেকে তাঁকে কার্যত অমোঘ বলে স্বীকার করে নিয়ে, ভারতবর্ষের সমাজ–

ব্যবস্থাকে যতটা যুগোপযোগী করা সম্ভব, পাশ্চাত্যের স্থায়-শাস্ত্রাদি থেকে পাওয়া সর্বজনীন মানবিক আদর্শে যতটা উদ্বুদ্ধ করা সম্ভব, আধুনিক দৃষ্টিতে যতটা সমৃদ্ধ করা সম্ভব, বিদ্যাসাগরের ধ্যানধারণা সেই লক্ষ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। তিনি যে নৈতিক মূল্যমানের কাঠামো নির্মাণ করেছিলেন, বিশ্লেষণে দেখা যাবে যে, তাও ঐ শাসনকাঠামোর সঙ্গেই একাত্ম। কিন্তু স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, সীমাকে চিহ্নিত করতে পারাই আসল কথা নয়; সীমার মধ্যে বিচরণশীল থেকেও কোন কর্ম ও ব্যক্তিত্ব সীমাকে লঙ্ঘন করে এবং কালান্তরের পথ দেখায়, তাকে জানাই ইতিহাসকে তার প্রবহমানতা ও সৃষ্টিশীলতার মধ্যে আবিষ্কার করা। সেই বিচারে বিদ্যাসাগর আধুনিক বাংলার অন্যতম স্থপতি, যাঁর আবির্ভাব না ঘটলে সংস্কৃতির রূপান্তর ও নবায়ন ব্যাহত হত।

জাতীয়তাবাদের প্রতিচ্ছবি : রজনীকান্ত গুপ্ত

প্রত্যেকটি একদা পরাধীন দেশেরই জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের উদ্বোধন, বিস্তার ও সফলতার ইতিহাসে এমন একটি অধ্যায় দৃষ্টিগোচর হয় যাকে সাধারণভাবে আমরা অন্তর্লোক যাত্রা বলে চিহ্নিত করতে পারি। স্বদেশ-আত্মার পরিচয় ও বাণী আবিষ্কার এবং সেই আবিষ্কারের পথে আত্মপরিচয়ে বলিষ্ঠ হওয়া এই অধ্যায়ের মৌল আন্তর প্রেরণা। এই প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়েই স্বাধীনতাকামী মানুষ আত্মগরিমায় স্ফীত এবং দৃঢ়চিত্ত সংগ্রামে আত্মনিয়োগ করে।

ভারতের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনও এই সাধারণ বৈশিষ্ট্যের ব্যতিক্রম নয়। ইংরেজ-নির্ভর এবং ইংরেজের মুখাপেক্ষী যে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন, তা যে আদপেই ফলপ্রসূ হবে না এই চেতনা ক্ষীণ হলেও ধীরে ধীরে উন্মোচিত হতে থাকে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দুই দশকে। তা ছাড়া, প্রাচ্য-পাশ্চাত্ত্যের সাংস্কৃতিক সংঘাতে বাঙালী ঔপনিবেশিক বুদ্ধিজীবীদের দল যে পাশ্চাত্ত্যের স্থূল মূল্যবোধের নিকট আত্মবিক্রয় করছিলেন, সেই চেতনার উদ্বোধনেও খুব বিলম্ব হয় নি। যদিচ সেই আত্মবিক্রয়কে প্রতিরোধ করার মতো শক্তি ছিল না। এই চেতনার উদ্বোধনে রবীন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দ এবং তাঁদের অনুসরণে বিপিন পালের ও অরবিন্দ ঘোষের অবদান সর্বথা স্বীকার্য।

বিপিনচন্দ্রের রচনায় এই চেতনার বিকাশ ও মানস রূপান্তরের উজ্জ্বল সাক্ষ্য বিদ্যমান। এই বোধ জাগ্রত হওয়ার দরুন স্বদেশধর্মের ধারণাই সর্বতোভাবে রূপান্তরিত হয়। একটি নিবন্ধে তিনি লিখেছিলেন, পূর্বে ভারতবর্ষের নাম উচ্চারণ করে আমরা ভালবাসতাম ইউরোপকে, ভারতবর্ষ নামক একটি বিমূর্ত সত্তাকে আমরা ভালবাসতাম সত্য, কিন্তু চোখের সামনে প্রসারিত ভারতকে আমরা ঘৃণা করতাম। এখন ভারতপ্রেম বলতে বোঝায় এমন এক প্রসন্ন চেতনা, যা ভারতের সমুদয় অভিব্যক্তির সঙ্গে একাত্ম। সেই চেতনায় এর নদনদী-গিরিগুহা এবং ভূপ্রকৃতি যেমন বিধৃত, তেমনি বিধৃত এর মানব-বিশ্ব, এর ইতিহাস, ভাষা, সংস্কৃতি সব। দেশের ভূপ্রকৃতি ও মানব-বিশ্বকে আত্মীকরণ ব্যতিরেকে স্বদেশপ্রেম অচিন্ত্যনীয়।

এই মনোভঙ্গিই ভারত-আত্মার অন্বেষণস্পৃহার জনক। এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের একটি চমৎকার উক্তি স্মরণীয়। ১৮৮৩ সনে প্রকাশিত 'অনাবশ্যক'

শীর্ষক একটি নিবন্ধে তিনি লিখেছিলেন, অনেক অর্থহীন আচার আচরণও মূল্যবান, কেননা তাতে আমাদের পিতৃপুরুষদের ইতিহাস বিজড়িত। আমাদের অতীতে রয়েছে কিছু কিছুপবিত্র পুণ্যস্থান, আজকের দিনের তাপ, দুঃখবেদনা ও হতাশায় তাড়িত হয়ে আমরা সেখানে তীর্থযাত্রা করি। এ ছাড়া রামমোহন রায়ের ওপর রচিত প্রবন্ধটিতে তিনি ঘোষণা করেন, ব্রহ্ম বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের জনক সত্য, কিন্তু বিশেষ করে তিনি ভারতেরই ব্রহ্ম।...ব্রহ্ম ভারতের জীবন্ত দেবতা; আমরা জেহোভা, ঈশ্বর বা আল্লাতে পরিপূর্ণ আশ্রয়লাভ করি না। পরম ব্রহ্মে স্বজাতীয়ত্ব আরোপ তৎকালীন জাতীয়তাবাদী মানসভঙ্গির বিশিষ্ট অভিব্যক্তি।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষ এবং বিংশ শতাব্দীর প্রথম দুই দশকে রজনীকান্ত যে সব প্রবন্ধ রচনা করেছিলেন, বিষয়বস্তুর নির্বাচন ও ভাবসম্পদের উন্মীলনের দিক থেকে তা সর্বত্র ঐ মানসভঙ্গির সঙ্গে একাত্ম। তাঁর কর্মের পরিসর খুব বিস্তৃত ছিল না, কিন্তু ঐ সীমিত পরিসরেও তাঁর চিন্তা মনন ও অভিব্যক্তি জাতীয়তাবাদের পূর্বোক্ত প্রত্যয়ের ওপর প্রতিষ্ঠিত। উপস্থিত প্রেরণা যাই হোক না কেন, তা বিদ্যার্থীদের জন্য পাঠ্যপুস্তক রচনাই হোক অথবা কোনো গুরুতর জাতীয় সমস্যার বিচার-বিশ্লেষণই হোক, সমস্ত রচনাই স্বজাত্যবোধের একক উৎস থেকে রস আহরণ করেছে বলে তা অনুভবের ঐকান্তিকতায়, চিত্তের ঔদার্যে এবং ভবিষ্যবাদী মানসিকতায় প্রসন্ন। রজনীকান্তের যেসব অপ্রধান রচনা বর্তমান প্রবন্ধকারের গোচরে এসেছে তাদের একটা সংক্ষিপ্ত পরিচয় গ্রহণ করলেই তা পরিস্ফুট হবে। কিন্তু পর্যাপ্ত তথ্যের অভাবে সেই পুথিগুলোকে কালানুক্রমিকভাবে সাজানো সম্ভবপর হল না।

আর্য্যকীর্ত্তি (৫ খণ্ডে সম্পূর্ণ): "বৈদেশিক সভ্যতার প্রভাবে আমাদের সমাজে অনেক বৈদেশিক ভাব ও বৈদেশিক রীতিনীতি প্রবিষ্ট হইয়াছে।... বিদেশীয় ভাব, বিদেশের কথা তাঁহাকে [ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত ব্যক্তিকে] সর্ব্বাংশে বৈদেশিক করিয়া তুলে। স্বদেশের দুঃখে স্বদেশের বেদনায় তাঁহার মনে দুঃখ বা বেদনার সঞ্চার হয় না। সমাজের এই শোচনীয় অবস্থার মধ্যে আর্য্যকীর্ত্তি প্রকাশিত হইল।" উদ্দেশ্য পাঠকচিত্তে 'অনুমাত্র স্বদেশহিতৈষিতা ও আত্মাদরের' স্ফুরণে সহায়তা করা। এতে রাজপুত, মারাঠা, শিখ এবং ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের কীর্তিমান পুরুষ ও মহিলার বীরত্ব, আত্মত্যাগ, মহানুভবতা ইত্যাদি আবেগতপ্ত ভাষায় কীর্তিত। আদর্শের ঘোষণা ও অঙ্গীকারে পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রতিনিধিদের নিকট থেকে যে ভারতবর্ষের শিক্ষণীয় কিছুই নেই, তা

রাণা কুম্ভের মহানুভবতার নিদর্শনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কুম্ভ পরাজিত মালবরাজের সম্মান রক্ষা করেছিলেন, তাঁকে বন্দীত্ব থেকে মুক্ত করে প্রভূত অর্থসহ স্বদেশে প্রেরণ করেছিলেন। কিন্তু ইউরোপীয় ঔপনিবেশিক বিজেতাদের নিকট এবংবিধ উদারতা অচিন্তানীয়। পরাজিত শিখ সর্দারগণ যখন ইংরেজ সেনাপতির নিকট অস্ত্র সমর্পণের সময় বললেন, আমরা আজ যা করেছি তার জন্য বিন্দুমাত্রও দুঃখিত নই যদি ক্ষমতা থাকে তো আগামীকালও তাই করব, তখন এই কালজয়ী শৌর্যবীর্যের সম্মাননা দূরস্থান, পাঞ্জাবে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী পতাকা তাচ্ছিল্যভরে উত্তোলিত হয়েছিল। 'ঊনবিংশ শতাব্দীর সভ্যতার স্রোতে' বীরত্বের ঐতিহাসিক সম্মান ভেসে গেল। বীরত্বের স্বীকৃতি ও শ্রেয়সের বোধ ভারতে অনেক বেশি উন্নত ছিল। গ্রন্থে যে কথাটি প্রায় ধ্রুবপদের মতো উচ্চারিত হয়েছে তা হল, "হায়! আজ ভারতে এইরূপ অসাধারণ ব্যক্তি কয়টি আছেন? প্রতিধ্বনি জিজ্ঞাসা করিতেছে, কয়টি আছেন? ভারত আজ নির্জীব ও নিশ্চেষ্ট। ভারত আজ শীতসঙ্কুচিত বৃদ্ধ অথবা কূর্মের ন্যায় আপনাতে আপনি লুক্কায়িত! কে ইহার উত্তর দিবে? প্রতিধ্বনি আবার কহিতেছে, কে উত্তর দিবে?"

ভারতকাহিনী: ভারতের ইতিহাস অধ্যয়ন, অশোক, ভারতের ভিন্ন ভিন্ন ধর্মসম্প্রদায়, ভারতে গ্রীক, ইত্যাদি ১১টি প্রবন্ধের সংকলন। প্রতিটি প্রবন্ধেরই লক্ষ্য ভারতের শাশ্বত মূল্যবোধ, শ্রেয়সের ধ্যান ও ভারতাত্মার সন্ধান এবং আধুনিককালের জীবনে তার পুনঃপ্রতিষ্ঠার সম্ভাবনাময়তার বিচার।

ভীষ্মচরিত: অতুলনীয় আত্মসংযম, অলৌকিক পিতৃভক্তি, অলোকসামান্য বীরত্ব অসাধারণ পরহিতব্রত ইত্যাদি গুণের প্রতীক পুরুষসিংহ হলেন ভীষ্ম। পৃথিবীর ইতিহাসে অথবা অন্য কোনো দেশের পুরাবৃত্তে সমতুল চরিত্রের সাক্ষাৎ একান্তই দুর্লভ। ভারতে এমন অপূর্ব চরিত্র গঠিত হয়েছিল, কারণ ভারত ব্রহ্মচর্যাদর্শের অত্যুচ্চ শিখরে আরোহণ করেছিল।

হিন্দুর আশ্রম চতুষ্টয়: প্রাচীন বর্ণাশ্রম ব্যবস্থার বিশ্লেষণ এবং ব্রহ্মচর্যভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমেই যে মহৎ চরিত্র সৃষ্টি সম্ভব, তার বিচার। ভারতের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ বিদেশী রাষ্ট্রনায়ক ও বীরপুরুষ যথা ম্যাটাসান গ্যারিবল্ডি প্রভৃতির জীবনকাহিনী পর্যালোচনা করেন এবং তা থেকে অনুপ্রেরণা লাভ করেন। এর বিকল্প হিসেবে রজনীকান্ত গুরুগোবিন্দ সিং-এর জীবনচরিত বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন যে, ত্যাগ, মহানুভবতা, ওজস্বিতা প্রভৃতি গুণে

ভারতীয় চরিত্র কোনো অংশে খাটো ত নয়ই বরং বহুলাংশে বড়। এইরূপ চরিত্র অতুলনীয় ঐশ্বর্যময় ভারতীয় সভ্যতার সৃষ্টি, যা জগতের বিস্ময়। ঔপনিবেশিক শাসনাধীন ভারতবর্ষ সেই সভ্যতার আশ্রয় হারিয়ে ফেলেছে, তাই তার এমন শোচনীয় অধঃপতন। কিন্তু, ভবিষ্যতে আস্থাশীল রজনীকান্ত আশা প্রকাশ করেছেন, পুনরায় ভারতে এবং জগৎসভায় এই সভ্যতার মর্মবাণী উচ্চারিত ও সমাদৃত হবে।

ভারত প্রসঙ্গ : ভারতাক্রমণ, বঙ্গে ইংরেজাধিকার, ভারতে ব্রিটিশাধিকার, ভারতে ইংরেজ রাজত্ব, ইত্যাদি কয়েকটি প্রবন্ধের সংকলন। দ্বিতীয় প্রবন্ধে ইংরেজ ইতিহাসকারগণ সিরাজদ্দৌলা চরিত্রে যেমন কলঙ্কের কালিমা লেপন করে আসছিলেন, রজনীকান্ত তা খণ্ডন করেছেন এবং প্রত্যক্ষ নজির উল্লেখ করে দেখিয়েছেন, ইংরেজেরই শঠতা, পরপীড়ন, দুর্নীতিপরায়ণতা ইত্যাদি অতিশয় প্রকট। বিশেষ করে উমিচাঁদকে তাঁরা যেভাবে প্রতারণা করেছেন, ইতিহাসে তার কোনো সমান্তরাল কাহিনী নেই। রণকৌশল, বৈষয়িক বুদ্ধি এবং প্রতারণার সাহায্যে ইংরেজ বিজয়ী হয়েছে সত্য কিন্তু এই রাজনৈতিক বিজয় কোনো অর্থেই সাংস্কৃতিক বিজয় নয়, কেননা সংস্কৃতির ক্ষেত্রে হিন্দুকে দেবার মতো ইংল্যাণ্ডের কিছুই নেই।

আমাদের জাতীয় ভাব : সুখপাঠ্য এই বইটিতে বাঙালীদের চলনে বলনে বিদেশীয়ানার জন্য প্রচণ্ড ক্ষোভ প্রকাশ করা হয়েছে, এবং লেখক বারংবার এই প্রত্যয়ের পুনরাবৃত্তি করেছেন যে, জাতীয় ভাবের অভাবই সমস্ত কলঙ্ক ও কালিমার মূলে। জাতীয় ভাষা ও সাহিত্যের সমৃদ্ধি এবং জাতীয় ভাবের অনুশীলন ছাড়া কোনো জাতিই মহত্বের আসনে অধিষ্ঠিত হতে পারে না। ইতালিও ঐক্যবদ্ধ সংহত জাতি রূপে আত্মপ্রকাশ করতে সমর্থ হত না, যদি ইতালির নেতৃবৃন্দ জাতীয় ভাবধারায় অভিষিক্ত ও স্থিত না থাকতেন। উপসংহারে রজনীকান্ত অধ্যাপক সিলীর রচনা থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছেন, "আমরা হিন্দুর অপেক্ষা বুদ্ধিমান নহি। আমাদের হৃদয় হিন্দুর হৃদয় অপেক্ষা অধিকতর প্রশস্ত বা অধিকতর উন্নত নহে। আমরা অজ্ঞাত ও অচিন্ত্যপূর্ব বিষয় সম্মুখে রাখিয়া, অসভ্যদিগকে যেরূপ বিস্ময়াবিষ্ট করিতে পারি, হিন্দুকে সেরূপ পারি না। হিন্দু, তাঁহার কাব্যের গভীর ও উদার ভাব লইয়া, আমাদের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে পারেন। এমন কি তাঁহার নিকট অভিনব বলিয়া স্বীকৃত হইতে পারে, এরূপ বিষয় আমাদের বিজ্ঞানেও অল্প আছে।" এবং এই আশা অভিব্যক্ত

হয়েছে যে, পুনরায় পৃথিবীতে 'হিন্দুর জাতীয় ভাবের অমৃতময় ফলের বিকাশ' পরিলক্ষিত হবে এবং মানব সংস্কৃতির ইতিহাসে ভারতের অনন্ত কীর্তি স্বর্ণাক্ষরে লিখিত হবে।

আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় : এই পুস্তিকার মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হল, পাশ্চাত্ত্য মনোভঙ্গির প্রসার এবং স্বদেশী মনোভঙ্গির তিরোভাবই আধুনিক ভারতের শিক্ষা ব্যবস্থার ত্রুটি। এই পরিস্থিতির দরুণ যেমন দুঃখবোধে রজনীকান্তের চিত্ত বিষণ্ণ হয়েছে, তেমনি অপরদিকে জাতীয় সাহিত্যর চর্চা ও রক্তে-চেনা ভাষার উন্নতি বিধানের হৃদয়গ্রাহী আবেদনও উচ্চারিত হয়েছে। জাতীয় ভাষার অবমাননায় কোনো জাতিই গৌরবের আসনে অধিষ্ঠিত হতে পারে নি, এমন কি সজীবতার কোনো লক্ষণীয় স্বাক্ষরও রেখে যেতে পারে নি।

পূর্বোক্ত গ্রন্থগুলো আলোচনা করলে দেখা যায়, জাতীয়তাবাদের উন্মেষ-কালীন যে সব বৈশিষ্ট্য একে বিশিষ্টতা দান করে রজনীকান্তের মধ্যে তার অনায়াসলক্ষ্য অভিব্যক্তি। ঐসব বৈশিষ্ট্যের অন্যতম হল, যাকে কেন্দ্র করে জাতীয়তাবাদী মানসভঙ্গি ও আন্দোলনের বিস্তার, সেই বিজয়ী রাজশক্তির ওপর সাংস্কৃতিক দীনতা ও খর্বতা আরোপ। এই মনোভঙ্গি থেকেই অতীত ঐশ্বর্য অতিশয়তা অর্জন করে এবং দখলদার শক্তি হ্রস্বতাপ্রাপ্ত হয়। জাতীয়তাবাদ স্বেচ্ছাকৃত ভাবেই একে হ্রস্ব করে দেখায়। এ যেন শোষণে জর্জর, অত্যাচারে দীন এবং সর্ব দিক থেকে অস্বীকৃত বর্তমানের জন্য একটা ন্যায়-সঙ্গত ক্ষতিপূরণ। বর্তমান না হোক অতীত-ঐশ্বর্যময়,—যে অতীতে প্রতিপক্ষের উল্লেখনীয় কোনো কৃতিত্বই ছিল না। এই আত্মশ্লাঘাময় তত্ত্বের ওপর বারংবার ঘা মেরে মেরে ভাবরাজ্যে এমন একটি আবর্ত সৃষ্টি করা সম্ভব, যা মানুষকে সংগ্রামে আত্মত্যাগে উদ্দীপ্ত করে এবং চিরকাল করবে।

জাতীয়তাবাদী ভাবধারায় স্নাত হয়ে রজনীকান্ত সহজাত বৃত্তির জোরেই ঐ মনোভাব আত্মস্থ করতে সমর্থ হয়েছিলেন। তিনি 'হিন্দুর আশ্রম চতুষ্টয়' গ্রন্থে কালীপ্রসন্ন ঘোষের রচনা থেকে দীর্ঘ উদধৃতি দিয়েছেন, "খ্রীষ্টের ৫৫ বৎসর পূর্বে যখন পরাক্রান্ত জুলিয়স্ সীজর কয়েক সহস্র সৈনিক পুরুষ লইয়া ব্রিটেনের উপকূলে উপনীত হয়েন, তখন তিনি ইহা দেখিয়াই নিরতিশয় দুঃখিত হইলেন যে, যাহাদের সহিত তাঁহার যুদ্ধের আয়োজন হইয়াছে, তাহারা অর্দ্ধ-মনুষ্য ও অর্দ্ধ-পশু। অপক্ক মাংস তাহাদের আহারীয়, ভূগর্ত্ত বা ভূগর্ত্তের ন্যায় মৃন্ময় কুটীর তাহাদের আবাসগৃহ, তরুশাখা তাহাদের বিনোদ ক্ষেত্র তাহাদের দেহ বিবিধ

বর্ণে রঞ্জিত এবং তাহাদের ভাষা বিকট শব্দের ন্যায় শ্রুতিকঠোর। আর গ্রীসের বীরচূড়ামণি সেকেন্দর শাহ জুলিয়স্ সীজরেরও ৩০০ বৎসর পূর্বে যখন পারস্ত হইতে পঞ্চ সরিদ্বিধৌত রমনীয় ভূখণ্ডে সমাগত হয়েন, তখন তিনি ও তদীয় সহচরবর্গ ইহা দেখিয়া বিস্মিত হইলেন যে, তাঁহারা স্বদেশে থাকিয়া যাহাদিগকে একপ্রকার অসভ্য মনে করিতেন, তাঁহারা সভ্যতায় গ্রীকদিগেরও শিক্ষাগুরু। তাঁহারা রূপে অতুল্য, বীরত্ব তেজস্বিতা দয়া ও দাক্ষিণ্যে বিভূষিত, তাঁহাদের নগর সুরম্য সৌধে সমাকীর্ণ, তাঁহাদের আচার ব্যবহার সর্বথা পরিশুদ্ধ ও পরিমার্জিত এবং তাঁহাদের ভাষা মন্দাকিনীর মৃদুতরঙ্গভঙ্গীজনিত কলনাদের ন্যায় যার পর নাই শ্রুতিমধুর ও মনোমদ।" এই উদ্ধৃতির পর রজনীকান্ত তাঁর নিজস্ব মন্তব্য সংযোজন করেছেন, "যাঁহারা এক সময়ে শিক্ষাপ্রণালীর গুণে গ্রীকদেরও বরণীয় ছিলেন, তাঁহারাই এখন পূর্বপুরুষের প্রবর্তিত পবিত্র শিক্ষাপথ পরিত্যাগ করিয়া, গ্রীসের শিষ্যস্থানীয় রোমের নির্জিত সেই ব্রিটিশ জাতির দ্বারে সর্ববিষয়ে ভিক্ষাপ্রার্থী হইতেছেন, আর যাঁহারা অসভ্য ভাবে রোমের নিকটে অবজ্ঞাত হইয়াছিলেন, তাঁহারাই এখন কষ্টসহিষ্ণুতায়, নিষ্ঠায় ও চিত্তসংযমের মহিমায় পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জাতির মধ্যে পরিগণিত হইতেছেন। আমাদের ইহা অপেক্ষা শোচনীয় অধঃপতন আর সম্ভবে না—ইহা অপেক্ষা দুঃখময় মর্মস্পর্শী দৃশ্য আর নেত্রপথবর্তী হয় না।"

স্বাধীনতা ও জাতীয় মর্যাদাহানির জন্য দুঃখবোধ এবং আত্মসমালোচনা ঔপনিবেশিক শাসন ব্যবস্থা থেকে উদ্ভূত বুদ্ধিজীবীদের প্রাপ্য ছিল। ঐ আমলের সংবেদনশীল আত্মসচেতন ব্যক্তিমাত্রেই এই আত্মসমালোচনায় মুখর হয়ে উঠেছিলেন। সে দিক থেকে কালের মর্মবাণীর সঙ্গে রজনীকান্তের মানসভঙ্গি একাত্ম। ঐ পরিস্থিতিতে ভারতের সনাতন শ্রেয়সের বোধ ও অবিনশ্বর মূল্য-বোধে আশ্রয়লাভের আকুতি সমকালীন মানুষের মনে নতুন চিন্তাভাবনা ও উদ্দীপনার খোরাক যোগায়। এই আকুতি আরও বেশি গুরুত্ব অর্জন করে যখন একে আমরা বৃহত্তর পটভূমিতে স্থাপন করে সংস্কৃত রেনেসাঁসের সঙ্গে যুক্ত করে গ্রহণ করি। এশিয়াটিক সোসাইটির কর্মোদ্যম, গবেষণা ও প্রকাশনার মাধ্যমে এবং ম্যাক্স মূয়েলার প্রমুখ পণ্ডিতবর্গের নিঃস্বার্থ প্রচেষ্টায় সংস্কৃত সাহিত্যের পুনরুজ্জীবনে ইওরোপে বিস্ময়কর সাড়া জেগেছিল; সেই অভূতপূর্ব সাড়া স্বভাবতই প্রতিটি জাতীয়তাবাদী ভারতীয়ের মনে আত্মসচেতনতার জোয়ার নিয়ে আসে, আত্মমর্যাদায় মানুষকে বলিষ্ঠ করে। ঐ মর্যাদাবোধই

রজনীকান্তকে সনাতন মূল্যবোধের বিশ্লেষক ও প্রচারকের ভূমিকা গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করে।

ঔপনিবেশিক শাসনব্যবস্থাজাত বুদ্ধিজীবীদের নানাবিধ সমস্যা সম্পর্কেও তিনি সজাগ ছিলেন। এই সব সমস্যার অন্যতম হল এলিয়েনেশন বা অনন্বয়, যা আজকের দিনের বহু আলোচিত বিষয়-বস্তুর অন্যতম। তিনি অবশ্য বুদ্ধিজীবী-দের উদ্ভবকালীন সামাজিক ঐতিহাসিক লক্ষণগুলোর সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ কিছু করেন নি, অবশ্য তদ্রূপ বিশ্লেষণের প্রচলন আমাদের দেশে তখনও হয় নি। তথাপি ব্যবহারিক জ্ঞান সংবেদনশীলতা ও দেশের বৃহত্তর কল্যাণচিন্তার সহায়-তায় ইংরেজী-অভিমানী বুদ্ধিজীবীদের চিন্তামনন ও ব্যবহারিক কর্মকাণ্ডের সীমাবদ্ধতা সুষ্ঠুভাবেই উপলব্ধি করেছিলেন। এ সম্পর্কে তাঁর রচনা থেকে একটি দুটি উদ্ধৃতি দেব, এবং উদ্ধৃতিগুলো বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। তাঁর কথায়, "আচারে, পরিচ্ছদে, কার্য্যে, কথাবার্তায়, কিছুতেই তাঁহাদের সহিত আমাদের সমতা থাকে না। তাঁহারা মিল ও বেন্থাম গলাধঃকরণ করিয়াও, নিরবচ্ছিন্নভাবে বৈষম্যনীতিরই পরিচয় দেন। তাঁহারা সেই সাহেবী সাজে সভাস্থলে দণ্ডায়মান হইয়া জলদগম্ভীর স্বরে স্বদেশহিতৈষিতার গৌরব ঘোষণা করেন, এবং ম্যাট্‌সিনি ও গ্যারিবল্‌দির নামোল্লেখ করিয়া, স্বদেশীয়ের হৃদয়ে তড়িতপ্রবাহ সঞ্চারিত করিতে প্রয়াসবান্ হয়েন। কিন্তু তাঁহারা আপনারাই যে, স্বদেশ ও স্বজাতি হইতে বিচ্ছিন্ন, তাহা একবারও মনে করেন না। তাঁহাদের আরাধ্য ম্যাট্‌সিনি বা গ্যারিবল্‌দি যদি বিজাতীয়ভাবে অনুপ্রাণিত ও বিজাতীয় পরিচ্ছদে সজ্জিত হইয়া, বিজাতীয় ভাষায় আলাপ করিতেন, তাহা হইলে, ইতালির উদ্ধার হইত কিনা, তাহা তাঁহাদের কুশাগ্র বুদ্ধিতে প্রতিভাত হয় না। তাঁহাদের হিতৈষিতা থাকিতে পারে, ভূয়োদর্শন থাকিতে পারে, কার্য্যপটুতা থাকিতে পারে, কিন্তু একমাত্র বৈষম্যবুদ্ধির বিপত্তিপূর্ণ তরঙ্গাঘাতে, তৎসমুদয়ই বিজাতীয় ভাবের অতল সাগরে নিমজ্জিত হইয়া গিয়াছে।" [আমাদের জাতীয় ভাব]

তাদের সম্পর্কেই রবীন্দ্রনাথ একদা লিখেছিলেন, তাঁদের দেশসেবায় দেশের অভিমান ছিল, দেশ ছিল না। রজনীকান্ত লিখেছেন, তাঁদের দেশসেবার সমস্ত কর্মোদ্যমই, দেশের মাটি ও মানুষ থেকে বিচ্ছিন্ন থাকার দরুণ, বিজাতীয় ভাবনা চিন্তার অতলে তলিয়ে গেছে। এই উক্তির সত্যতা আমরা মর্মে মর্মে অনুভব করি; উপলব্ধি করি, রাষ্ট্রীয় দিক থেকে দীর্ঘ পথ পরিক্রমার পরেও, এমন কি

তথাকথিত কল্যাণ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরেও, কেন বৃহত্তর জনসমষ্টির জীবনে উল্লেখনীয় উন্নতিবিধান করা আদৌ সম্ভবপর হয় নি।

বিলাতের বিশ্ববিদ্যালয়গুলি থেকে তাঁদের সমুদয় চিন্তাধারা আহরিত হত বলে ঔপনিবেশিক বুদ্ধিজীবীর দল সব সময়েই একটা হীনমন্যতা ও প্রাদেশিকতার চেতনায় বিহ্বল থাকতেন। তাছাড়া ছিল শ্বেতাঙ্গ প্রভুদের দ্বারা প্রত্যাখ্যাত উপেক্ষিত হওয়ার আতঙ্ক। সেই আতঙ্ক থেকেই তাঁদের নিরন্তর প্রচেষ্টা ছিল সাহেবদের নিকট নিজেদের গ্রহণযোগ্য করে তোলা। নানা রকম উপায়ই তাঁরা সে জন্য অবলম্বন করেছিলেন। তার মধ্যে অন্যতম ছিল সাহেবদের উচ্চারণ মতো নিজেদের নাম, পদবী ইত্যাদি বিকৃত করা। এ ধরনের সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ অবশ্য রজনীকান্তের রচনায় দেখা যায় না, তবে তিনি এই রূপান্তরে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন ; লিখেছেন, "তাঁহারা ধুতি চাদর ছাড়িয়া হ্যাট কোট ধরিয়াছেন। সুতরাং হেমেন্দ্রনাথ মিত্রও এক্ষণে H. N. Mitter-এ পরিণত হইয়াছেন। জাতীয়ভাবের অধোগতি এইরূপে আমাদের প্রতি কার্য্যে পরিস্ফুট হইতেছে।" পশ্চিমকে মনেপ্রাণে গ্রহণ করার আত্যন্তিকতা থেকে ঐসব বুদ্ধিজীবীর দল শুধু যে দেশের মানুষের থেকে অনন্বিত হয়ে পড়েছিলেন, মানস-জীবনে হয়েছিলেন প্রবাসী, তা নয় ; তাঁরা নিত্যব্যবহার্য ভাষায়ও হাস্যকর পরিবর্তন নিয়ে এসেছিলেন। রজনীকান্ত, এর একটি কৌতুককর দৃষ্টান্ত দিয়েছেন : 'আমার father yesterday কিছু unwell হওয়াতে Doctor-কে call করা গেল, তিনি একটি physic দিলেন। physic বেশ operate করেছিল, four five times motion হোলো, অদ্য কিছু better বোধ কচ্চেন।" রক্তে চেনা ভাষার এমন অসম্মাননা ও বিকৃতি তুলনাবিহীন। শুধু তাই নয়, সেই ঐতিহ্য আজও সমান বহমান ; আজও আমরা, উনবিংশ শতকের বুদ্ধিজীবীদের পৌত্র এবং প্রপৌত্রগণ সেই ঐতিহ্যেরই বিষ ধারণ, বহন ও পোষণ করে চলেছি। ফলে; পূর্বকথিত বিচ্ছিন্নতা বা অনন্বয় থেকে মুক্তি অর্জন করা যেমন সম্ভবপর হয় নি তেমনি আমাদের স্বকীয়তার গর্বও সর্বভাবে বিনষ্ট। আত্মপরিচয়ের কোনো বলিষ্ঠ প্রত্যয়ই আজ আমাদের সম্মুখে প্রসারিত নেই। তজ্জন্য রজনীকান্তের ক্ষোভের অন্ত ছিল না।

অনন্বয়ের পরিণতি কি অন্য একটি দিক থেকেও তিনি তা আলোচনা করেছেন। পাশ্চাত্যের আত্মীকরণে তাঁরা প্রমত্ত হয়েছিলেন বলে তাঁদের মধ্যে পাশ্চাত্যের পণ্ডিত সমাজে স্বীকৃতি লাভের আকাঙ্ক্ষা ছিল প্রবল। সেই

আকাঙ্ক্ষার বশবর্তী হয়ে তাঁরা জাতীয় মনোভঙ্গি বিসর্জন দিয়ে, মাতৃভাষা ও জাতীয় সাহিত্যের অনুশীলন ইত্যাদি বর্জন করে ইংরেজী সাহিত্য চর্চা ও সেবায় আত্মনিয়োগ করেন। ফলে তাঁরা স্বয়ং ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন দু'দিক থেকে, (রবীন্দ্রনাথের একটি সংলাপের অনুসরণে) তাঁদের ইংরেজীটাও হল না, বাংলাটাও গেল। রজনীকান্তের ভাষায়, "তাঁহারা প্রতীচ্য ভূখণ্ডের পণ্ডিত-মণ্ডলীর মধ্যে প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করিতে পারেন না; যেহেতু তাঁহারা বিদেশীয় ভাষাবিজ্ঞানে উক্ত পণ্ডিতগণের সমকক্ষ নহেন। তাঁহারা আপনাদের জ্ঞান-গরিমায় কোনো বিষয়ের অভাবমোচনেও সমর্থ হইতে পারেন না, যেহেতু প্রতীচ্য সাহিত্য-সংসার কোনো বিষয়ে তাঁহাদের মুখাপেক্ষী নহে। তাঁহারা জ্ঞানসমুদ্রমন্থনপূর্বক রত্নের উদ্ধার করিলেও প্রতীচ্য জনপদে চিরস্মরণীয় হইতে পারেন না; যেহেতু প্রতীচ্য ভাষা তাঁহাদের প্রদত্ত ভূষণের জন্য লালায়িত নহে।" অন্যদিকে, "তাঁহারা স্বদেশের প্রকৃত কার্যকারক ও প্রকৃত হিতৈষী নহেন। অহম্মুখতার প্রচণ্ড আবেগে তাঁহাদের লোকহিতৈষিতা, কর্তব্যবুদ্ধি, জাতীয় সমাজের উন্নতিসাধন প্রবৃত্তি, সমস্তই বিপর্যস্ত হইয়া গিয়াছে। তাঁহারা কৃতী হইয়াও মাতৃভূমির অকৃতী সন্তান; পণ্ডিত হইয়াও স্বদেশের লোকসমাজে অনাদৃত এবং স্বদেশীয় হইয়াও গরীয়সী জন্মভূমিতে জনসাধারণের মধ্যে বিদেশীয়ের ন্যায় অপরিচিত।" (আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়)

এই মন্তব্যের যথাযথতা সম্বন্ধে কোনো দ্বিমত নেই। এই ইংরেজী শিক্ষাগর্বী বুদ্ধিজীবীর দল বিদেশী পণ্ডিতমহলে বা সমাজে যেমন কখনও গৃহীত হন নি, তেমনি স্বদেশী গণমানসের সাযুজ্যও কখনও লাভ করেন নি। তাঁদের এই ত্রিশঙ্কু অস্তিত্ব সৃষ্টিশীল তো নয়ই, এমন কি ক্ষেত্রবিশেষে আত্মক্ষয়ীও বটে। অন্যত্র রজনীকান্ত লিখেছেন, "যাঁহারা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিলাভ পূর্বক আপনাদিগকে গৌরবান্বিত মনে করিতেছেন,...তাঁহারা যদি মাতৃভাষায় অজ্ঞতার পরিচয় দেন, এবং মাতৃভাষার অনুশীলনে উদাসীন থাকেন, তাহা হইলে সমাজ কাতরভাবে তাঁহাদিগকে অকৃতবিদ্য বলিয়াই নির্দেশ করিবে।...পাশ্চাত্ত্য শাস্ত্রের অনুশীলন করিলেও, তাঁহাদের অভিজ্ঞতার সম্মান থাকিবে না।" তাঁর এই উক্তি রাজনারায়ণ বসুকে লিখিত মধুসূদনের একটি পত্রের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়, যেখানে মধুসূদন বলেছিলেন, মাতৃভাষায় পারদর্শী নয় এমন ইংরেজীনবিশকে তিনি শিক্ষিত বলে গণ্য করতেও কুণ্ঠিত। জাতীয় সমস্যার প্রতি অন্ধ অসংবেদনশীল এই পাণ্ডিত্য নিষ্ফল।

এই উপলব্ধিতে তাঁর চিত্ত ভাস্বর ছিল বলেই রজনীকান্ত বারংবার ইংরেজী-অভিমানী ব্যক্তিদের আত্মাভিমান ত্যাগ করে প্রকৃত জাতীয় ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ হতে এবং জাতীয় সাহিত্য ও মাতৃভাষার চর্চায় আত্মনিয়োগ করার জন্য আহ্বান জানিয়েছেন। এতে তাঁর কোনো ক্লান্তি ছিল না। তিনি যথার্থই অনুভব করেছিলেন, স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা এবং জাতীয় সাহিত্যের সমৃদ্ধি পরস্পর সম্পৃক্ত। জাতীয় সাহিত্য যদি সমৃদ্ধ না হয়, এবং সে পথে জাতীয় মানসের প্রেম-প্রীতি-অনুভবের ক্ষেত্র যদি প্রসারিত না হয়, তাহলে স্বাধীনতা লাভের লগ্নও পিছিয়ে পড়তে বাধ্য। ইতিহাস এমন কোনো সাক্ষ্য দেয় না যেখানে মাতৃভাষা ও জাতীয় সাহিত্যের অবমাননা এবং ধার-করা ভাব ও ভাষার অনুসরণে স্বাধীনতা অর্জিত হয়েছে। যে কোনো দেশেরই জাতীয় পুনরুজ্জীবনের বাহন তার রক্তে-চেনা ভাষা। এ ভাষায় যে কত বড় ভুবনবিজয়ী কীর্তি স্থাপন করা সম্ভব, রজনীকান্ত দান্তের উল্লেখ করে তার প্রমাণ দাখিল করেছিলেন। কিন্তু আমাদের ইউরোপ-পাগল বুদ্ধিজীবীরা বুদ্ধিগত দাসত্ব এবং বিজাতীয়ত্বের মধ্যেই ব্যক্তিগত ও জাতীয় পরমার্থের সন্ধান লাভ করেছিলেন। কিন্তু সে পথ যে ভ্রান্ত তা পুনরায় স্মরণ করিয়ে দিয়ে রজনীকান্ত লিখেছিলেন, "বিলাসে উপেক্ষা করিয়া, ভোগবিলাস বিসর্জন দিয়া, সংযতভাবে জাতীয় ভাষায় পুষ্টিসাধন করিলে যে অনন্ত অক্ষয় কীর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হইবে, তাহার সমক্ষে বিশ্বজয়ী সম্রাটের বিশ্বব্যাপিনী বিজয়কীর্ত্তিও কিছুই নহে।"

এই উদাত্ত আহ্বান তাঁর প্রতিটি রচনায়ই অনুরণিত। সম্পূর্ণ জাতীয় ভাবধারায় অনুপ্রাণিত হয়েই তিনি ইতিহাস চর্চায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন। তাঁর ঐতিহাসিক প্রবন্ধগুলোতে তাঁর স্বাধীনচিত্ততার প্রকাশ অনায়াসলক্ষ্য। ইংরেজ ইতিহাসবিদ্গণ ভারতইতিহাসের চর্চায় বহু ক্ষেত্রেই যে পক্ষপাত, যুক্তিহীন বর্ণবৈষম্যের মনোভাব, এবং ইচ্ছাকৃত বিকৃতির প্রবণতা দেখাতেন, তাতে ক্ষুব্ধ হয়েই রজনীকান্ত আধুনিক ইতিহাস চর্চায় ব্রতী হন, এবং নিস্পৃহ যুক্তি-বিচারের সহায়তায় ইতিহাসকে যথাসম্ভব পূর্বোক্ত বিকৃতি থেকে মুক্ত করায় প্রয়াসী হন। এ বিষয়ে তাঁর দান স্মরণীয়।

এভাবে আধুনিক ভারত থেকে প্রাচীন ভারতে তিনি বিচরণ করেছেন, কখনও বা নির্মোহ ইতিহাস রচনার গরজে, কখনও বা ভারত-আত্মার এবং তার শাশ্বত মূল্যবোধের সন্ধানে; কখনও বা অধঃপতিত বর্তমানের জন্য আত্মধিক্কারে সরব হয়েছেন, কখনও বা ঐ মূল্যবোধে পুনরায় আশ্রিত হওয়ার জন্য জানিয়েছেন

উদাত্ত আহ্বান। আর, হৃদয়ের ঐকান্তিকতা ও ভারতীয় জীবনসাধনার জন্য গর্ববোধ তাঁর গদ্যরীতিতে নিয়ে এসেছে এক আশ্চর্য সাবলীলতা ও গতিশীলতা যা ঋজু অথচ দীপ্তিময়। অন্তরের আবেগে প্রসন্ন বলে তা সহজেই পাঠককে আকৃষ্ট করে, এবং মহৎ ভাবনার আস্বাদ দান করে। এ সমস্ত কারণেই রজনীকান্তের সমগ্র রচনা ভারতের, বিশেষ করে বাংলার জাতীয়তাবাদী ভাবধারার বিচিত্র অভিব্যক্তি ও আত্মোপলব্ধির ক্ষেত্রে একটি উল্লেখনীয় সংযোজন

শরৎচন্দ্র : [ক] শ্রেয়সের সন্ধানে

প্রত্যেক শিল্পীই একটি বিশিষ্ট সমাজসংগঠন, সামাজিক সম্পর্ক, ইত্যাদিতে আশ্রিত থেকে তাঁর শিল্পকর্মকে উপলব্ধি করেন, শরৎচন্দ্রও করেছিলেন। তাঁর সমাজ সামন্ত ভূমি-সম্পর্কের অবক্ষয়ী সমাজ, যার সঙ্গে প্রত্যক্ষ জীবনাচরণ অথবা অঙ্গীকারের ভিত্তিতে তিনি অন্বিত ছিলেন না। কিন্তু, অন্বিত অথবা সংযুক্ত থাকার বাসনা ছিল তাঁর অপ্রতিহত। সেইজন্য, উপলব্ধির একটি স্তরে একে অস্বীকার করে অন্য একটি স্তরে পুনরায় এরই স্বীকৃতিতে প্রসন্ন হয়ে ওঠার নিদর্শন তাঁর শিল্পকর্ম বহন করছে।

সম্ভবত এই বৈশিষ্ট্যের কথা স্মরণে রেখেই রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, শরৎচন্দ্র বাঙালীর বেদনার কেন্দ্রে আপন বাণীর স্পর্শ দিয়েছেন। কিন্তু, সব আরম্ভেরই আগে যেমন আরম্ভ থাকে, তেমনি বাণীর স্পর্শ দানের আগেও আরম্ভ ছিল; তা হলো, হৃদয়-সংবেদনায় সেই বেদনার উপলব্ধি এবং একে শিল্পরূপ দানের আকৃতি। উপলব্ধি শব্দটিকে আমি গভীরতর ব্যঞ্জনায় গ্রহণে ইচ্ছুক, যা শুধু বেদনার পরিচয় গ্রহণেই সীমিত ছিল না, তা উত্তীর্ণ হয়ে, তা জয় করে একটা প্রশান্তিতে স্থিত হওয়ার উপায় চিন্তাও যার অন্তর্গত। সেই উপলব্ধিতে বেদনাবিক্ষত প্রত্যক্ষ যেমন স্বীকৃত, তেমনি উত্তরণের ব্যাকুলতাও স্বীকৃত। এবং স্বীকৃত বলেই একটা কল্যাণবোধ, একটা সুব্যাপ্ত মানবিকতা, শ্রেয়সের নিরন্তর ধ্যান, এবং কাহিনীবৃত্তে এর গ্রন্থণা শরৎচন্দ্রের গল্প-উপন্যাসের একটি অনায়াস-লক্ষ্য বৈশিষ্ট্য। এমন কি, যেসব রচনা ভাবাবেগের প্রবলতায় অতিশয় আর্দ্র, সে সব ক্ষেত্রেও এর উপস্থিতি অনস্বীকার্য।

বেদনার পূর্বকথিত উপলব্ধি সাধারণত প্রচলিত পারিবারিক সামাজিক পটভূমিতে ব্যক্তিক আশা-আকাঙ্ক্ষা, স্বপ্ন-অধ্যাস, ব্যর্থতা-অসফলতা ইত্যাদিকে কেন্দ্র করে বিবর্তিত হয়েছে; বিশেষ করে বিবর্তিত হয়েছে কালান্তরের বিশ্ববিহারী হওয়ায় নারীর নবজাগ্রত আত্মসচেতনতার দাবী ও সংগ্রামকে কেন্দ্র করে। সেই সংগ্রামে শরৎচন্দ্র প্রত্যক্ষ করেছেন নিরন্তর পরাজয়, অস্বীকৃতি ও নির্যাতন। এই সংগ্রামকে শিল্পকাঠামোয় বিধৃত করার সময় ব্যক্তি মানুষের যে আকৃতি তাঁর চিত্তে সর্বকালীন সত্যের মত ভাস্বর ছিল, তা হলো ব্যক্তি-সত্তার ও মনুষ্যত্বের স্বীকৃতি। বিভিন্ন গ্রন্থে ভিন্ন ভিন্ন সূত্রে বিবিধভাবে তা ব্যক্ত হয়েছে। এখানে 'পথের দাবী' থেকে দুটি বাক্য উদ্ধার করছি। প্রথমটি

সব্যসাচীর, "মানুষ হয়ে জন্মানোর মর্যাদা-বোধকেই মানুষ হওয়া বলে"; দ্বিতীয়টি ভারতীর, "মনুষ্য-জন্ম নিয়ে মানুষের একমাত্র কাম্য স্বাধীনতার আনন্দ উপলব্ধি করতে চাই।" বৃহত্তর রাষ্ট্রীয় সংগ্রামের পরিপ্রেক্ষিতে উচ্চারিত হলেও, সামাজিক পরিসরে ব্যক্তিক জীবনের আকাঙ্ক্ষাও তাই—তার মানবিক মর্যাদা ও স্বাধীন সত্তার স্বীকৃতি। ঔপনিষদিক ভারতবর্ষে একদা মানবস্বীকৃতির উদাত্ত বাণী উচ্চারিত হয়েছিল। কিন্তু রূঢ় হলেও সত্য যে, সেই বাণী ব্রাহ্মণ্য সমাজসংগঠনে স্বীকৃতি লাভ করেনি; মানুষ "যেহেতু মানুষ" এই সত্যে ও সর্তে কোন দিন কোনই মর্যাদা লাভ করেনি। শরৎচন্দ্র মানুষকে শুধুমাত্র যেহেতু মানুষ এই সত্যেই মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন; বলেছেন, "মানুষ হয়েও মানুষ যাদের চোখের জলের কখনও হিসাব নিলে না", সামাজিক অবিচারের সেই শিকারদের বেদনাকে বাণীর স্পর্শ দেওয়াই তাঁর সাহিত্যসাধনা।

শ্রেয়সের অনুধ্যান থেকেই শরৎচন্দ্রকে কতকগুলো প্রশ্ন নতুনভাবে উত্থাপন করতে হয়েছে, এবং নিজেকেও অনুরূপ জিজ্ঞাসার মুখোমুখী দাঁড়াতে হয়েছে। কেননা, সংস্কারবশত যেসব স্মৃতি-শ্রুতি-বিশ্বাসে মন আশ্রিত, তার বন্ধন থেকে যদি মুক্তিলাভ না করা যায়, তাহলে ব্যক্তিমানসের স্বাধীনতা অর্জন কোন কালেই সম্ভবপর হবে না। সেজন্যই তিনি সত্যের সংজ্ঞা ও স্বরূপ কি, সর্বকালে গ্রাহ্য পরম সত্য বলে কোন আদর্শ স্বীকৃত হতে পারে কি না, এসব প্রশ্ন পুনরায় উত্থাপন করেছেন, এবং উত্তরও দিয়েছেন। 'পথের দাবী'-তে সব্যসাচীর উক্তি, "তোমরা বল চরম সত্য, পরম সত্য—এই অর্থহীন নিষ্ফল শব্দগুলো তোমাদের কাছে মহামূল্যবান। মূর্খ ভোলাবার এত বড় যাদুমন্ত্র আর নেই।" 'শেষ প্রশ্ন' উপন্যাসে কমলের কথা, 'অনেকে অনেক দিন ধরে কিছু একটা বলে আসছে বলেই আমি মেনে নিইনে। স্বামীর স্মৃতি নিয়ে বিধবার দিন কাটানোর মত এমন স্বতঃসিদ্ধ পবিত্রতার ধারণাও আমাকে পবিত্র বলে প্রমাণ না করে দিলে স্বীকার করতে বাধে।' কিরণময়ী 'চরিত্রহীন' গ্রন্থে দিবাকরকে জানাচ্ছে, "কোন ধর্মগ্রন্থই কখনও অভ্রান্ত হতে পারে না। বেদও ধর্মগ্রন্থ। সুতরাং এতেও মিথ্যার অভাব নেই।" এসব উক্তি থেকে এই সিদ্ধান্তই অপরিহার্য হয়ে পড়ে যে, পরম সত্য বলে যদি কিছু না থেকে থাকে এবং বেদ-এ যদি মিথ্যার অভাব না থেকে থাকে, তাহলে মিথ্যাকে সত্যের মর্যাদা দান জীবনকে এবং স্বাধীনচিত্ততাকে অস্বীকার করার নামান্তর মাত্র।

তাহলে, মানুষের পক্ষে আত্মমর্যাদায় ও স্বাধীনতায় স্থিত হওয়ার উপায়ই বা কি? এ জিজ্ঞাসায় শরৎচন্দ্র ব্যক্তিক বিবেকবুদ্ধি এবং যা ব্যক্তির আকাঙ্ক্ষার পরিপূরক তা অনুসরণের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন বলে মনে হয়। 'পথের দাবী'-তে সব্যসাচী বলছে, "মানুষের চিন্তা ও প্রবৃত্তি মানুষের কর্মকে নিয়ন্ত্রিত করে, কিন্তু পরের নির্দ্ধারিত চিন্তা ও প্রবৃত্তিকে দিয়ে সে যখন তার নিজের স্বাধীন চিন্তার মুখ চেপে ধরে তখন তার চেয়ে বড় আত্মহত্যা মানুষের ত আর হতেই পারে না।" আর 'শেষ প্রশ্ন'-এ আশুবাবু কমল সম্পর্কে বলছে, "আর একজন কেউ ওর জীবনকে ফাঁকি দিয়েচে বলে সে নিজের জীবনকে ফাঁকি দিতে কোন মতেই সম্মত নয়।" কিন্তু, প্রচলিত পারিবারিক ও সামাজিক সম্পর্ক, বহুদিন-থেকে-চলে-আসা মূল্যবোধ, ধ্যানধারণা, ইত্যাদি যদি ব্যক্তির আকাঙ্ক্ষার পরিপূরণের পথে অন্তরায় সৃষ্টি করে, তাহলে ব্যক্তি বনাম সমাজ এই সংঘাতের নিবৃত্তি অথবা সমাধান কোন পথে? সামাজিক সংগঠনের সংস্কার, না সমাজবিপ্লব?

এবংবিধ প্রশ্ন স্বভাবতই বৃহত্তর জিজ্ঞাসার দ্বার উন্মুক্ত করে; তা হলো, সামাজিক প্রগতির স্বরূপ কি, তাৎপর্য কি? শরৎ-সাহিত্যে এই জিজ্ঞাসার প্রক্ষেপ উপলব্ধি করার জন্য আমাদের নিকট ইঙ্গ-ভারতীয় সংস্কৃতির পটভূমিটি সর্বদাই স্মরণীয়। ঔপনিবেশিক শাসনব্যবস্থার প্রবর্তন এবং দুটি ভিন্ন আদর্শাবলম্বী সংস্কৃতির সংঘাত থেকে যে বর্ণসংকর ঔপনিবেশিক বুদ্ধিজীবী দলের আবির্ভাব হয়েছিল, শ্রীঅরবিন্দ তাঁদের বলেছিলেন স্বাজাত্যধর্মচ্যুত, de-nationalized. ইওরোপের সভ্যতা-সংস্কৃতির মশালের আলোকে তাঁরা পথ চলতে এবং পাশ্চাত্যের চোখ ও মন নিয়ে সামাজিক রূপান্তরের চিত্র আঁকতে অভ্যস্ত ছিলেন। ফলে, তাঁদের নিকট ভারতীয় সমাজকাঠামোর নবায়নের অর্থ ছিল পাশ্চাত্যীকরণ; এমন কি প্রগতি এবং পাশ্চাত্যীকরণ ছিল তাঁদের নিকট সমার্থক। শরৎচন্দ্র তাঁর পঠনপাঠন, ব্যবহারিক অভিজ্ঞতা, ইতিহাসের বোধ, ইত্যাদি থেকে পাশ্চাত্যীকরণের দুর্বার শক্তির প্রতিফলন মানুষের চলনে বলনে ভাবনায় আদর্শানুসরণে প্রত্যক্ষ করেছেন। সুতরাং, এর মধ্যে ব্যক্তি-সত্তার স্বীকৃতি, বাসনার চরিতার্থতার প্রতিশ্রুতি, এককথায় শ্রেয়সের সন্ধান নিহিত আছে কি না, শিল্পকর্মের মাধ্যমে সেই তত্ত্বানুসন্ধানের আগ্রহ তাঁর স্বাভাবিক। তারই নিদর্শন 'শেষ প্রশ্ন'। এই উপন্যাসে তিনি নায়িকা কমলের মাধ্যমে পাশ্চাত্যীকরণের মনোভঙ্গিকে তার শক্তি, উপস্থিত উপযোগিতা ও মহিমায়

মধ্যে বিধৃত করেছেন, এবং ঐ মূল্যবোধ ভারতবর্ষের সামাজিক প্রগতির পক্ষে কতটা অনুকূল, সে বিচারও অনিবার্যভাবেই উপস্থাপিত হয়েছে।

সামাজিক জীবনপ্রাঙ্গণে যেমন, উপন্যাসেও তেমনি, ইওরোপের প্রেয়োবাদী সংস্কৃতি যা ইন্দ্রিয় সংবেদ্যতার মধ্যেই জীবনের পরমার্থ অন্বেষণ করে এসেছে, ভারতের অধ্যাত্মবাদী মননকে প্রচণ্ডভাবে আঘাত করে। কমলের কণ্ঠে সেই প্রেয়োবাদী মূল্যবোধ, আর আশুবাবুর কণ্ঠে ভারতের পারমার্থিক মূল্যবোধ। প্রত্যক্ষ জীবনসম্পর্কের মধ্যে যেমন, উপন্যাসেও তেমনি, দুটি বিপরীতধর্মী সংস্কৃতির আবর্ত থেকে উদ্ভূত, প্রাচীনের বন্ধন থেকে মুক্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তিমানস স্বাভাবিক কারণেই প্রত্যক্ষবাদী জীবনদর্শনকেই জীবনসর্বস্ব রূপে গ্রহণ করেছিল। ঔপনিবেশিক বুদ্ধিজীবীর দল পিতৃস্বত্বের অধিকারে ঐ ইন্দ্রিয় সংবেদ্যতার রস আকণ্ঠ পান করেছিল। কমলও করেছে; সেজন্যই, সে ওদেরই একজন অতি সোচ্চার, অতি আত্মসচেতন প্রতিনিধি। যুক্তিবিচারে এবং ব্যবহারিক দুঃসাহসিকতায় তার বিজয়ে এবং হৃদয়বৃত্তির অপরিচিত বিক্ষেপে আশুবাবুর ছোট্ট সংসারটির ও নির্ভরতার স্তম্ভগুলোর ধসে যাওয়ার মধ্য দিয়ে ভারতীয় সমাজমানস ও মূল্যবোধগুলোর আয়ুর ক্ষীণতার আভাস দেওয়া হয়েছে।

প্রসঙ্গত স্মরণীয়, কমল ইংরেজ পিতা ও ভারতীয় মাতার সন্তান, কিন্তু আইনসিদ্ধ বিবাহের প্রসূন নয়। আর, সাম্রাজ্যবাদ প্রবর্তিত শিক্ষাব্যবস্থার ফলশ্রুতিস্বরূপ যে বুদ্ধিজীবীদের আবির্ভাব, মানসবৈচিত্র্যে তাদেরও পিতা ইংল্যাণ্ড, জননী ভারতবর্ষ। কমলের সঙ্গে বুদ্ধিজীবীদের উৎপত্তিগত এবং চরিত্র বৈশিষ্ট্যের এই মিল নিছক একটা আকস্মিক ঘটনা, না গভীর মননশীলতায় উপলব্ধ, তা আজ নির্ণয় করা কঠিন। তবে, এটা নিশ্চিত যে, উভয়ের এই আবির্ভাবগত সাদৃশ্য যদি আকস্মিক না হয়ে থাকে তাহলে মানতেই হয় যে বুদ্ধিজীবীদের সম্পর্কে শরৎচন্দ্রের উপলব্ধি অতিশয় গভীর ছিল।

সাম্রাজ্যবাদকে অবলম্বন করে ইওরোপের যে বিশ্ববিহার সে সম্পর্কে কোন প্রশ্ন বা দ্বিধা নেই। সেই প্রেয়োবাদী বিশ্বদর্শনের আকর্ষণে মাতাল বিশ্বের মানুষ আজ যেন একই অভিষ্টের লক্ষ্যে দ্রুত ধাবমান। মানসবৈশিষ্ট্য এবং ব্যবহারিক জীবনবিন্যাস উভয় ক্ষেত্রেই যেন চলেছে, একীকরণের এক সর্বগ্রাসী খেলা। এই খেলায় ইওরোপ সার্বভৌম, তার আন্তর ও ব্যবহারিক সম্পদ সমগ্র মানবজাতির অঙ্গে দিয়েছে এক বিশ্বজনীনতার ভূষণ, যেমন মনোহর

তেমনি অপ্রতিরোধ্য। একে স্বীকার করে নিয়ে ভারতীয়ত্ব বর্জন করার জন্ত কমল সোচ্চার, "কোন একটা জাতের কোন একটি বিশেষত্ব বহুদিন চলে আসচে বলেই সে ছাঁচে ঢেলে চিরদিন দেশের মানুষকে গড়ে তুলতে হবে তার অর্থ কই? মানুষের চেয়ে মানুষের বিশেষত্বটাই বড় নয়। আর তাই যখন ভুলি, বিশেষত্বও যায়, মানুষকেও হারাই।" "ভারতীয় বলে চেনা যাবে না এই ত ভয়? নাইবা গেল চেনা। বিশ্বের মানবজাতির একজন বলে পরিচয় দিতে ত' কেউ বাধা দেবে না। তার গৌরবই বা কি কম?" পুনশ্চ, "পশ্চিমের জ্ঞান-বিজ্ঞান-সভ্যতার কাছে ভারতবর্ষ আজ যদি ধরা দেয়, দম্ভে আঘাত লাগবে, কিন্তু তার কল্যাণে ঘা পড়বে না আমি নিশ্চয় বলতে পারি।"

মানুষের হৃদয়বৃত্তি কতটা অনুষ্ঠাননির্ভর, প্রচলিত বৈবাহিক সম্পর্কের মধ্যে নারীর ব্যক্তিত্ব বিকাশের অবকাশ আছে কি নেই, একনিষ্ঠতা অথবা নিষ্ঠার অভাব সেই সম্পর্কে কি আবর্তের সৃষ্টি করে, ইত্যাদি সমস্যার অবতারণা শরৎ-সাহিত্যে নতুন নয়। অভয়া শ্রীকান্তকে প্রশ্ন করেছিল, "যার স্বামী এত বড় অপরাধ করেচে তার স্ত্রীকে সেই অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করতে সারা জীবন জীবন্মৃত হয়ে থাকাই তার নারী জন্মের চরম সার্থকতা? একদিন আমাকে দিয়ে বিয়ের মন্ত্র বলিয়ে নেওয়া হয়েছিল—সেই বলিয়ে নেওয়াটাই কি আমার জীবনে একমাত্র সত্য, আর সমস্তই একেবারেই মিথ্যা?" 'পথের দাবী'-তে সুমিত্রা অপূর্বকে বলেছিল, "আপনি সতীত্বের চরম উৎকর্ষের বড়াই করেছিলেন, কিন্তু, এই যে দেশে বিবাহের ব্যবস্থা [পুত্র কামনায় ভার্যা গ্রহণ], সে-দেশে ও-বস্তু বড় হয় না, ছোটই হয়। সতীত্ব ত শুধু দেহেই পর্য্যবসিত নয় অপূর্ববাবু, মনেরও তো দরকার?......আপনি কি সত্যই মনে করেন মন্ত্র পড়ে বিয়ে দিলেই যে-কোন বাঙালী মেয়ে যে-কোন বাঙালী পুরুষকে ভালবাসতে পারে? একি পুকুরের জল যে যে-কোন পাত্রে ঢেলে মুখ বন্ধ করে দিলেই কাজ চলে যাবে?" 'শেষ প্রশ্ন'-এ কমল বলছে, "একদিন যাকে ভালবেসেছি কোন দিন কোন কারণেই আর তার পরিবর্তন হবার যো নেই, মনের এই অচল অনড় জড়ধর্ম সুস্থও নয়, সুন্দরও নয়।" "সংসারে অনেক ঘটনার মধ্যে বিবাহটাও একটা ঘটনা, তার বেশি নয়; ওটাকেই নারীর সর্বস্ব বলে যেদিন মেনে নিয়েচেন, সেই দিনই শুরু হয়েছে মেয়েদের জীবনে সবচেয়ে ট্রাজিডি।" এই সব উক্তির মাধ্যমে কমল যে কথাটার উপর গুরুত্ব আরোপ করতে চেয়েছে তা হলো, মানুষের হৃদয়বৃত্তিকে তার স্ব-নিয়মে,

এর উৎস, অভিব্যক্তি এবং সার্থকতার নিয়মে বিচার করতে হবে। এবং ব্যক্তিমানসে সুখপ্রবণতা ও তা চরিতার্থ করার যে আত্যন্তিক বাসনার অস্তিত্ব রয়েছে, তার দাবি মেনে নিয়ে তার হৃদয়বৃত্তিকে শাসন করা উচিত। কমল তার যুক্তিবাদী মননের শাণিত বাণ এবং ব্যক্তিগত আচরণ উভয়ত এর যৌক্তিকতা প্রমাণ করেছে। তাই, শিবনাথের মানসিক চাঞ্চল্য ও বিচলন প্রত্যক্ষ করার সঙ্গে সঙ্গে সে তাকে মুক্তি দিয়েছে, এবং স্বয়ং, পরিবর্তিত পরিবেশে, অজিতকে কেন্দ্র করে রসিয়ে উঠেছে। গ্রন্থ শেষে উভয়ে প্রেম-সমৃদ্ধ মিলিত জীবনযাপনের দরুণ আগ্রা ত্যাগ করেছে, আনুষ্ঠানিক বিবাহ সম্পর্কে আবদ্ধ হয়নি। অন্যত্র, বিতর্কের সময়, সে নিঃশঙ্কচিত্তে ঘোষণা করেছে, প্রাণহীন প্রেমহীন বিবাহ-সম্পর্ক থেকে ইওরোপীয় নারীগণ যেভাবে বিচ্ছেদের পথে মুক্তি অর্জন করছে এবং নতুনভাবে বাঁচার প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ উদ্দীপ্ত হচ্ছে, ভারতীয় মহিলাগণও যদি সে পথ অনুসরণ করে তাহলে এর থেকে কল্যাণকর আর কিছুই হতে পারে না।

কমলের এ সম্পর্কে বলবার কথা, হৃদয় যেখানে শুষ্ক, প্রেম মৃত, সেখানে শুধু অনুষ্ঠানপূত সম্পর্কের গ্লানি বহন করা কেবল অর্থহীন নয়, আত্মপ্রবঞ্চনাও। আত্মপ্রবঞ্চনা কোন বিচারেই শ্রেয়স্কর বলে গ্রাহ্য হতে পারে না। সেইজন্যই, এর পীড়ন থেকে মুক্তিলাভ করে নতুনতর প্রেম-প্রীতি-ভালবাসায় রসিয়ে ওঠার দাবি। আর 'নারীর মূল্য' শীর্ষক সুদীর্ঘ প্রবন্ধের পরিসমাপ্তিতে যে দীর্ঘ উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছে, তাতেও শরৎচন্দ্রের এই বিশ্বাস ঘোষিত হয়েছে যে, নরনারীর সহজ প্রেমসম্পর্ককেই মানবগোষ্ঠী একদিন আইনগত বা অনুষ্ঠানসিদ্ধ সম্পর্ক থেকে মহত্তর বলে স্বীকৃতিদান করবে।

কিন্তু, পাশ্চাত্ত্য ভুবনের নারীগণ প্রেম বা বিবাহ সম্পর্কে, বিশেষত প্রেমাস্পদ নির্বাচনের বিষয়ে, যে স্বাধীনতা ভোগ করে, তার প্রেক্ষিতে এবং সামাজিক সম্পর্ক ও শ্রেয়সের পরিপ্রেক্ষিতে এ প্রশ্ন অনিবার্য হয়ে ওঠে, নরনারীর প্রেমসম্পর্ক কতটা সার্বভৌম? এ কি পরম অর্থে অন্য-নিরপেক্ষ? সামাজিক সম্পর্কের সম্পূর্ণ উর্ধ্বে? উপন্যাসে কমলকে সরাসরি এ প্রশ্ন কেউ জিজ্ঞাসা করেনি; কিন্তু, শরৎচন্দ্র যে যুক্তিবিচারে আপন মনে এর উত্তর অনুসন্ধান করেছেন এবং পেয়েছেনও, তাঁর সাহিত্যে এর প্রমাণ অপর্যাপ্ত। তাঁর যুক্তিবাদ মানবহৃদয়ের নব নব পরিবেশে নব নব প্রেরণায় রসিয়ে ওঠার সম্ভাবনার অকাট্য স্বীকৃতিতে প্রস্তুত, কিন্তু যে শ্রেয়সের আশ্রয় লাভের জন্য

তাঁর চিত্ত উৎসুক সেখানে এর স্বীকৃতি অনুপস্থিত। উদাহরণ স্বরূপ, 'চরিত্রহীন' উপন্যাসে সাবিত্রী তার প্রেমাস্পদ সতীশকে বলছে, "তুমি বলবে সত্য হোক মিথ্যা হোক আমি সমাজ চাইনে, তোমাকে চাই। কিন্তু আমি ত তা বলতে পারিনে। সমাজ আমাকে চায় না, আমাকে মানে না জানি, কিন্তু আমি ত সমাজ চাই, আমি ত তাকে মানি।" সাবিত্রী-সতীশের প্রেমকে শরৎচন্দ্র শিল্পে প্রতিষ্ঠিত বা মর্যাদাদান করতে পারেননি; সতীশকে সরোজিনীর মত একটি অপ্রয়োজনীয় চরিত্রের সঙ্গে বিবাহ দিয়েছেন। 'শ্রীকান্ত' দ্বিতীয় পর্বে স্বামী কর্তৃক নিগৃহীত অভয়া, পাশ্চাত্ত্য মহিলাদের মতই, বিবাহ সম্পর্ক থেকে নিজেকে সরিয়ে এনে নতুন প্রেমাস্পদ রোহিনীর সঙ্গে জীবনযাপনের দুঃসাহসিক পদক্ষেপ গ্রহণ করে। কিন্তু, অভয়ার এই স্বাধিকারপ্রমত্ততা শ্রীকান্তর মনঃপূত হয়নি। সে বলছে, "আমার জীবনে আমি যে-ক'টি নারী-চরিত্র দেখতে পেয়েচি, সবাই তারা দুঃখের ভেতর দিয়েই আমার মনের মধ্যে বড় হ'য়ে আছেন। আমার অন্নদাদিদি যে তাঁর সমস্ত দুঃখের ভার নিঃশব্দে বহন করা ছাড়া জীবনে আর কিছুই করতে পারতেন না, এ আমি শপথ করেই বলতে পারি। সে ভার অসহ্য হ'লেও যে তিনি কখনো আপনার পথে পা দিতে পারেন, এ কথা ভাবলেও হয়ত দুঃখে আমার বুক ফেটে যাবে।" 'স্বামী' নামক মাঝারি উপন্যাসেও দেখা যায়, নারী-পুরুষের হৃদয়বৃত্তির স্বাভাবিক প্রক্ষেপকে মর্যাদা দান করা শরৎচন্দ্রের পক্ষে সম্ভবপর হয়নি। সেখানে ভারতীয় সমাজমানসের দৃষ্টিতে নিষিদ্ধ প্রেমের উপর অনুষ্ঠানসিদ্ধ দাম্পত্য সম্পর্কের বিজয় বিঘোষিত হয়েছে। 'গৃহদাহ' উপন্যাসে মৃণালকে ঘোষণা করতে দেখা যায়, "স্বামী জিনিসটি আমাদের কাছে ধর্ম, তাই তিনি নিত্য। জীবনেও নিত্য, মৃত্যুতেও নিত্য।" পুনশ্চ, "স্বামীকে যে স্ত্রী ধর্ম বলে অন্তরের মধ্যে ভাবতে শেখেনি, তার পায়ের শৃঙ্খল চিরদিন বদ্ধই থাক্, আর মুক্তই থাক্ এবং নিজের সতীত্বের জাহাজটাকে সে যত বড় বৃহৎই কল্পনা করুক, পরীক্ষার চোরাবালিতে ধরা পড়লে তাকে ডুবতেই হবে।" আর, 'বিপ্রদাস' গ্রন্থে তিনি বন্দনার মত পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা-সংস্কৃতিতে বিদগ্ধ নারীকে ব্রাহ্মণ্যসমাজের সনাতন মূল্যবোধের নিকট ঐকান্তিক আত্মসমর্পণ করিয়েছেন।

তাছাড়া, ইওরোপ সম্পর্কে শরৎচন্দ্র খুব যে শ্রদ্ধাশীল ছিলেন, তা মনে করারও কোন হেতু নেই। 'পথের দাবী'-তে সব্যসাচীর উক্তি, "প্রবল দুর্ব্বলের সম্পদ কেন ছিনিয়ে নেবে না, একথা যে সভ্য ইয়োরোপের নৈতিকবুদ্ধি

ভাবতেই পারে না।" আর, চীন ভূখণ্ডে ইওরোপীয় সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলোর তাণ্ডব সম্পর্কে সে ভারতীকে বলছে, "ইয়োরোপের সমস্ত সভ্যতা এক হয়ে তার [জন দুই পাদ্রী হত্যার] যে প্রতিশোধ নিলে, হয়ত, কোথাও তার তুলনা নেই। তার অপরিমেয় খেসারতের ঋণ কতকাল যে চীনেরা শোধ দেবে তা যীশুখ্রীষ্টই জানেন।" ইত্যাদি।

এখানে লক্ষ্য করার বিষয়, 'পথের দাবী'-র প্রকাশ-কাল ১৯২৬, 'শেষ প্রশ্ন'-এর ১৯৩১; 'স্বামী'-র ১৯১৮, 'শ্রীকান্ত' দ্বিতীয় পর্ব-এর ১৯১৮, 'গৃহদাহ'-এর ১৯২০, 'বিপ্রদাস'-এর ১৯৩৫। প্রথমোক্ত দু'টি উপন্যাসে নারীর সতীত্ব এবং নারী-পুরুষের হৃদয়বৃত্তির সার্বভৌম প্রক্ষেপ সম্পর্কে অতিশয় বিপ্লবাত্মক বাণী উচ্চারিত হলেও, ঐ উপন্যাস দুটি রচিত হওয়ার আগে এবং পরেও শরৎচন্দ্র কিন্তু সম্পূর্ণ বিপরীত আদর্শ ও শ্রেয়সের প্রতি আনুগত্য জ্ঞাপন করেছেন।

সেজন্য, এই সিদ্ধান্ত অপরিহার্য হয়ে পড়ে যে, শরৎচন্দ্রের গল্প-উপন্যাসে যে বিদ্রোহের বাণী শ্রুতিগোচর হয়, তা ব্রাহ্মণ্য সমাজব্যবস্থা যা কৃষিভিত্তিক সামন্ত সম্পর্কের মধ্যে আশ্রিত এবং বিবর্ধিত হয়েছিল, তার শ্রেয়োবোধের ব্যূহ ভেদ করতে সমর্থ হয়নি, বরং এর চিরাচরিত 'অভ্যাসের গরিয়সীসত্তা' স্বীকার করে নিয়েছে। এ প্রশ্নটা বিশ্বাসের; একে অন্ধ বিচারহীন আনুগত্য বলে গণ্য করা বোধ করি সমীচীন হবে না। যুক্তিবিচারে তিনি সম্ভবত এই বিশ্বাসেই স্থিত হয়েছিলেন যে, মানবিক, ব্যক্তিক, এবং ব্যক্তিক-সামাজিক সম্পর্কের ও সামগ্রিক কল্যাণের যে নির্দেশ এই সমাজ-ব্যবস্থায় নির্দেশিত, তা-ই তুলনায় শ্রেষ্ঠ। তাই, এ প্রশ্নও পুনরায় উচ্চারিত হয়, শরৎচন্দ্র ঐ সমাজব্যবস্থার বৈপ্লবিক রূপান্তর কি কখনও কামনা করেছিলেন? না শুধু বহিরঙ্গের সংস্কারের পক্ষপাতী ছিলেন?

সংস্কার, বিপ্লব, ইত্যাদি বিষয়ে তাঁকে নানান ধরনের মন্তব্য করতে দেখা গেছে নানা সময়ে। 'পথের দাবী'-তে সব্যসাচী ভারতীকে বলছে, "প্রতিষ্ঠান যত প্রাচীন, যত পবিত্র, যত সনাতনই হোক, মানুষের চেয়ে বড় নয়,—আজ সে-সব আমাদের ভেঙ্গে ফেলতে হবে। ধুলো ত উড়বেই, বালি ত ঝরবেই, ইট পাথর খসে মানুষের মাথায় পড়বেই ভারতী, এই ত স্বাভাবিক।" অন্যদিকে, চন্দননগর আলোচনা সভায় বলেছেন, সংস্কার মানেই যেটা খারাপ জিনিস, অনেকদিন চলে খড়খড়ে নড়বড়ে হয়ে পড়েছে তাকেই মেরামত করে আবার

মজবুত করে তোলা ; সংস্কার দ্বারা অচলকে সচল করে তোলা হয়। আবার 'তরুণের বিদ্রোহ' শীর্ষক ভাষণে বলেছেন, "বিপ্লবের সৃষ্টি মানুষের মনে, অহেতুক রক্তপাতে নয়। তাই ধৈর্য্য ধরে তার প্রতীক্ষা করতে হয়। ক্ষমাহীন সমাজ, প্রীতিহীন ধর্ম্ম, জাতিগত ঘৃণা, অর্থনৈতিক বৈষম্য, মেয়েদের প্রতি চিত্তহীন কঠোরতা, এর আমূল প্রতিকারের বিপ্লব-পন্থাতেই শুধু রাজনৈতিক বিপ্লব সম্ভবপর হবে।" আর, এও সত্য যে, গল্প-উপন্যাসে সামন্ততান্ত্রিক সমাজবিন্যাসের অধীন পারিবারিক ও গ্রামীণ সমাজসম্পর্কের যে চিত্র তিনি উন্মোচিত করেছেন, তাতে, বিষয়গতভাবে অন্যায়ের বিরুদ্ধে তাঁর ঘৃণা, অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ, মানবতার শত্রুর বিরুদ্ধে তাঁর চিত্তবিক্ষোভ, ইত্যাদি অজস্রধারায় আনুভূতিক সত্যতা লাভ করেছে। ঐসব কাহিনীর আস্বাদন লাভ করে পাঠকের মনে হয়, শরৎচন্দ্রের বিদ্রোহী সত্তা যেন এই অবক্ষয়ী সামন্ত ব্যবস্থার আমূল রূপান্তর কামনা করে, যেন বিপ্লবই তাঁর একান্ত কামনীয় বস্তু। কিন্তু, তৎসত্ত্বেও, এ কথাও তর্কাতীত যে, ঐ ব্যবস্থারও অন্তাবরণ কিছু মূল্যবোধকে [পূর্বকথিত হিন্দু নারীর পতিধর্মের সংস্কার ছাড়াও অন্যান্য উদাহরণ, ভ্রাতৃপ্রেম, পারিবারিক সম্পর্কের পবিত্রতা যেখানে ব্যক্তিক সুখান্বেষণ অপেক্ষা সমষ্টিগত কল্যাণ ও স্নেহসম্পর্ক বড়, ইত্যাদি] তিনি চিরায়ত সত্যের মর্যাদা দান করেছেন। এসব মূল্যবোধের অবলুপ্তি তিনি কখনও কামনা করেননি, আশ্রয়ও হারাতে চাননি।

অবশ্য, তর্ক করা যেতে পারে, রসসাহিত্য প্রচারপত্র নয়, বা নীতিধর্ম প্রচারের বাহনও নয় ; শিল্পের আপন সত্যই তার বিচারের ন্যায়সঙ্গত মানদণ্ড। এই শিল্পগত দৃষ্টিমার্গ থেকেই শরৎচন্দ্র একদা 'কৃষ্ণকান্তের উইল'-এর আলোচনায় বঙ্কিমচন্দ্রের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ উত্থাপন করেছিলেন, "তাঁর কবি-চিত্ত যেন তাঁরই সামাজিক এবং নৈতিক বুদ্ধির পদতলে আত্মহত্যা করে মরেছে।" বলেছিলেন, "উপন্যাসের চরিত্র শুধু উপন্যাসের আইনেই মরতে পারে, চোখ রাঙানিতে তার মরা চলে না।" এই দুটি মন্তব্যকে মনের পশ্চাদপটে রেখে 'চরিত্রহীন'-এ সতীশ-সাবিত্রী, 'পল্লীসমাজ'-এ রমেশ-রমা সম্পর্কের পরিণতির কথা স্মরণে রাখলে তাঁর বিরুদ্ধেও, একই কারণে, আত্মহত্যার অভিযোগ আনয়ন করা যায়। শরৎচন্দ্রের সৃষ্টিসম্ভারে সামাজিক বিপ্লবের, জীর্ণ অচলায়তনকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করার যে প্রতিশ্রুতি ছিল, শিল্পের নিজস্ব আইনের মানদণ্ডেই ব্যক্তি-সত্তার স্বাধীনতার যে অঙ্গীকার ছিল,

সে প্রতিশ্রুতি রক্ষিত হয়নি। তা যেন শুধু বেদনার প্রকাশ, শুধু অনুকম্পা, শুধুই মানবিক সহানুভূতির অশ্রুতে নিঃশেষিত হয়েছে। সম্পদ হিসাবে মানবিকতা নিশ্চয়ই অমূল্য, কিন্তু সামাজিক রূপান্তর মানুষের নিকট আরও বেশি কিছু প্রত্যাশা করে। সেই প্রত্যাশা পূরণ হয়নি।

তথাপি, ভারতীয় সাহিত্যের ইতিহাসে শরৎচন্দ্রের শিল্পকর্মের অবদান, নানাবিধ অসম্পূর্ণতা সত্ত্বেও, অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ। অবক্ষয়ী সমাজের অর্থনৈতিক, সামাজিক পীড়নের চাপে পরাভূত ব্যক্তি-সত্তার ক্রন্দন তিনি যতটা এবং যেরূপ হৃদয় সংবেদনায় উপলব্ধি করেছেন, ততটা অন্য কোন শিল্পীর পক্ষে সম্ভব হয়নি। উপরন্তু, তাঁর সাহিত্য ব্যক্তিক দায়িত্ববোধের স্বীকৃতিতে ভাস্বর, শ্রেয়সের অনুধ্যানে উদ্বেল, মানবিক কল্যাণচেতনায় উদ্বিগ্ন। এই বৈশিষ্ট্যের দাবিতেই তা প্রাগ্রসর চিন্তার সহায়ক ও সহযাত্রী।

[খ] শেষ প্রশ্ন-এর প্রশ্ন

'শেষপ্রশ্ন'-এর প্রশ্নের চমক আজ আর কিছু নেই, তা খুবই পুরাতন; আর এ নিয়ে বাদবিসম্বাদ তর্কবিতর্কও বহুকাল নীরব। সেজন্য, ঐ প্রশ্নটিকে কেন্দ্র করে আলোচনার অবতারণা অ-সময়োচিত বলে বিবেচিত হতে পারে। আমি তথাপি একেই আমার নিবন্ধের বিষয়বস্তু বলে গ্রহণ করছি একারণে যে, ঐ প্রশ্নের অন্তরালে প্রচ্ছন্ন যদি কোন সত্য থেকে থাকে তো শরৎচন্দ্র তার কি তাৎপর্য গ্রহণে সম্মত ছিলেন, এবং সমাজ সংস্কৃতির বিবর্তন ও রূপান্তরে ঐতিহ্যের দাবি কতখানি গ্রাহ্য, এই জিজ্ঞাসার উত্তর অন্বেষণের জন্য।

কিন্তু সেজন্য প্রারম্ভেই আলোচনার সীমানা চিহ্নিত করা সঙ্গত। আমার বিশ্বাস, শেষপ্রশ্নের বহুবিধ জিজ্ঞাসা ও সমস্যাকে তিন, চারটি মৌল জিজ্ঞাসায় কেন্দ্রীভূত করা যায়। যথা,—

(ক) সামাজিক মূল্য এবং সত্যের স্বরূপ কি? কমলের কথায়, "অনেকে অনেকদিন ধরে কিছু একটা বলে আসছে বলেই আমি মেনে নিইনে।" এর ইংগিত, যে মন মেনে নেয়, সে মন মৃত অথবা বার্ধক্যে জরাগ্রস্ত। "বর্তমান তার কাছে লুপ্ত, অনাবশ্যক, অনাগত অর্থহীন। অতীতই তার সর্বস্ব।" প্রশ্ন, মানুষ কি শুধুই তার অতীতের সংস্কার নিয়েই অচল, অবক্ষয়ের মধ্যেই সৃষ্টির সম্ভাবনাহীন অস্তিত্বের গ্লানি বহন করে একদা নিশ্চিহ্ন হবে?

(খ) আত্মপরিচয়ের যে বিশিষ্টতা জাতীয় আত্মম্ভরিতার জনক, পরিবর্তিত জাগতিক সম্পর্কের প্রেক্ষিতে তার মূল্য এবং গুরুত্ব কতটুকু? কমলের বক্তব্য, "কোন একটা জাতের কোন একটি বিশেষত্ব বহুদিন চলে আসচে বলেই সে ছাঁচে ঢেলে চিরদিন দেশের মানুষকে গড়ে তুলতে হবে তার অর্থ কই?" এ সম্পর্কে কমল বহু প্রাসঙ্গিক উক্তি করেছে। তার দু-একটি পূর্বগামী প্রবন্ধে উল্লেখিত হয়েছে। পুনরাবৃত্তির ভয়ে এই নিবন্ধে তা উল্লেখিত হলো না।

(গ) প্রেম-প্রীতি ভালবাসার সহজাত প্রেরণা, হৃদয়বৃত্তি অথবা তার দেহজ উৎস কতটা অনুষ্ঠাননির্ভর, অথবা সামাজিক বিধিনিষেধের শাসনে তাকে কতখানি বাঁধা সম্ভব? কমলের উক্তি, একদিন একজনকে ভালবেসেছি বলে আর কখনও কাউকে ভালবাসা যাবে না, এটা প্রাণধর্ম বা সজীবতার লক্ষণ

নয়। 'এক দিনের একটা অনুষ্ঠানের জোরে তার অব্যাহতির পথ যদি সারা জীবনের মত অবরুদ্ধ হয়ে আসে, তাকে শ্রেয়ের ব্যবস্থা বলে মেনে নেওয়া চলে না।' "তাই ত বিবাহের স্থায়িত্ব আছে, নেই তার আনন্দ। দুঃসহ স্থায়িত্বের মোটা দড়ি গলায় সে আত্মহত্যা করে মরে।'

(ঘ) ব্যক্তিক অভিজ্ঞতায় মুক্তির স্বরূপ এবং তাৎপর্য কি? কমল সম্পর্কে নীলিমার মন্তব্য, "এ কেউ কাউকে দিতে পারে না—দেনাপাওনার বস্তুই এ নয়; কমলকে দেখলেই দেখা যায় এ নিজের পূর্ণতায়, আত্মার আপন বিস্তারে আপনি আসে। বাইরে থেকে ডিমের খোলা ঠুকরে ভিতরের জীবকে মুক্তি দিলে সে মুক্তি পায় না—মরে।" আশুবাবু, "আর একজন কেউ ওর জীবনকে ফাঁকি দিয়েচে বলে সে নিজের জীবনকে ফাঁকি দিতে কোন মতেই সম্মত নয়।" ওর আশা যেমন দুর্বার, আনন্দও তেমনি অপরাজেয়; মুক্তি অদৃষ্টবাদের স্বীকৃতিতে নেই, আছে সম্মুখের পথে দুঃসাহসিক যাত্রায়।

বলা বাহুল্য, এইসব প্রশ্ন এবং আক্রমণের লক্ষ্য হলো, ভারতীয় সমাজ-মানস, যা কালপ্রবাহের সূত্রগুলো আত্মস্থ করতে পারেনি, এবং পারেনি বলেই সে প্রাণধর্মিতায় প্রবল এবং বোধের ব্যাপ্তিতে উজ্জ্বল সাড়া দিতে পারছে না। সেই সমাজমানসের শক্তি ও দুর্বলতা, সংস্কার ও পরমার্থ, ইত্যাদি উপন্যাসে আশুবাবুর চরিত্রে রূপায়িত হয়েছে। কমলের সমস্ত যুক্তিতর্কের লক্ষ্য হলো পাশ্চাত্ত্যীকরণ। এর পরোক্ষ প্রভাবে ও ধাক্কায় আশুবাবুর সংসার ভেঙে যায়। এর প্রতীকী অর্থ যদি গ্রহণ করা যায়, তা হলে মানতে হয় যে ভারতীয় সামাজিক আদর্শও এমনি ভঙ্গুর, ক্ষীণপ্রাণ।

॥ ২ ॥

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, শেষ প্রশ্নেই যে পূর্বোক্ত প্রশ্নগুলো সর্বপ্রথম উচ্চারিত হয়েছে তা নয়। এই উপন্যাসটির প্রকাশকাল ১৯৩১; এর পাঁচ বছর আগে অর্থাৎ ১৯২৬ সালে প্রকাশিত 'পথের দাবী'তে এই প্রশ্নগুলো উত্থাপিত ও বিতর্কিত হয়েছে। তারও আগে রবীন্দ্রনাথ বহু প্রবন্ধে জাতীয় অহমিকাকে আক্রমণে বিদ্ধ করেছেন, এবং সাংস্কৃতিক জাতীয়তাবাদের সঙ্কীর্ণতা যে বিশ্বমানব-চিত্তের আহ্বানের উপযুক্ত সাড়া নয়, আবেগপূর্ণ ভাষায় তা ব্যক্ত করেছেন। সংবেদনশীল চিত্তের এই বিক্ষোভ এই ইঙ্গিতই বহন করে যে,

ঐতিহ্য ও সংস্কার বনাম সমাজ রূপান্তর—এই সমস্যাটি যুগমানসকে বিশেষভাবে সঞ্চালিত করেছিল। শেষ প্রশ্নে তা উচ্চারিত হয়েছে উপলব্ধির প্রখরতায়, বুদ্ধির অসামান্য দীপ্তিতে এবং আক্রমণের প্রচণ্ডতায়।

কিন্তু, এই আক্রমণের তত্ত্বগত বৈশিষ্ট্য এবং বিষয়গত সংকেত অনুধাবন করার জন্য সর্বাগ্রে আক্রমণকারীকেই জানার প্রয়োজন। বলা বাহুল্য, আগ্রার ক্ষুদ্র প্রবাসী বাঙালী সমাজে যে আলোড়নের সৃষ্টি করেছিল সে এক-জন বিধবা যুবতী নারী, কমল। কমলের সঙ্গে আধুনিক ভারতের বুদ্ধিজীবীদের সম্পর্ক কি তা পুর্ব-প্রবন্ধে ইতিপূর্বেই বিশ্লেষিত হয়েছে। পুনরাবৃত্তি নিষ্প্রয়োজন।

ইংল্যাণ্ডের ভারতবিজয় এবং পরিণামে যে সাংস্কৃতিক সংঘাত, তার মর্মবাণীটিও কমল আত্মস্থ করেছে পুর্ণ মাত্রায়। ইংরেজের বক্ষকে আশ্রয় করে ইওরোপের প্রেয়োবাদী সংস্কৃতি, যা ইন্দ্রিয় সংবেদ্যতার মধ্যেই জীবনের পরমার্থ অন্বেষণ করে এসেছে, ভারতের অধ্যাত্মবাদী মননকে প্রচণ্ড ভাবে আঘাত করে। প্রেয়োবাদ ঐহিক সম্ভোগের গরজে ইওরোপকে সমগ্র বিশ্বে ছড়িয়ে দিয়েছিল; আর ভারতবর্ষ বস্তুসম্পর্কের প্রত্যক্ষ ভুবন থেকে মনকে সরিয়ে এনে এক অতীন্দ্রিয় অনুভূতির সন্ধানে ছিল ব্যাপৃত। এই দুই বিপরীতধর্মী সংস্কৃতির সংঘাত থেকে মুক্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তিমানস অতি স্বাভাবিক-ভাবেই প্রত্যক্ষবাদী জীবনদর্শনকেই জীবনসর্বস্ব রূপে গ্রহণ করে। উপস্থিত প্রাপ্তিটাই বড়, অনিশ্চিত স্বর্গ নয়। ঔপনিবেশিক বুদ্ধিজীবীরাও পিতৃত্বের অধিকারে ঐ ইন্দ্রিয়সংবেদ্যতার রস আকণ্ঠ পান করেছে। কমলও করেছে; পিতৃত্ব এবং শিক্ষা উভয় সূত্রেই সে ইওরোপের সন্তান। সেজন্য, তার কণ্ঠ থেকে অপরূপ শক্তি ও আত্মবিশ্বাস ধ্বনিত হয়, "যে জীবনকে সবার মাঝখানে সহজ বুদ্ধিতে পাই, এই আমার সত্য, এই আমার মহৎ। ফুলে, ফলে, শোভায়-সম্পদে এই জীবনটাই যেন আমার ভরে ওঠে, পরকালের বৃহত্তর লাভের আশায় ইহলোককে যেন না আমি অবহেলায় অপমান করি।"

উল্লেখ্য, কমল ভারতবর্ষীয় সমাজের সহিত সম্পর্কহীন, অনন্বিত। ভারতীয় বুদ্ধিজীবীদেরও এই একই সাধারণদৃষ্ট চারিত্র বৈশিষ্ট্য। শিক্ষায় দীক্ষায়, আদর্শের অনুধ্যানে, ব্যক্তিক সংস্কৃতিতে তারা বৃহত্তর জনসমষ্টির সঙ্গে সম্পর্কহীন, অনন্বিত। অনন্বয় সংবেদনশীল চিত্তে যেমন আত্মোপলব্ধির ক্রন্দন সঞ্চারে সক্ষম, তেমনি, অপরপক্ষে, লক্ষ্যবস্তুকে আঘাতে আঘাতে জর্জরিত করার

শক্তিরও এর অভাব নেই। যেমন অভাব নেই কমলের। সেই শক্তিতেই কমল পাশ্চাত্তীকরণের প্রবক্তা।

॥ ৩ ॥

সেই শক্তিতে বলীয়ান হয়েই কমল ভারতীয় সমাজের সংস্কার, তার মূল্য-বোধ, ঐতিহ্য, ইত্যাদিকে অস্বীকার করছে। এর উপযোগিতা আজ নিঃশেষিত; এর প্রাণ নেই। সুতরাং সত্যতাও নেই। এই উপলব্ধিকে প্রাথমিক সোপান হিসাবে গ্রহণ করে যুক্তিপরম্পরার যে কাঠামো সে সৃষ্টি করেছে তার সংকেত হলো, আধুনিক কালের বিশ্ব ব্যবস্থায় সব দেশেরই মানুষ অনিবার্য গতিতে এক বিশ্বজনীনতার পথে অগ্রসর হয়ে চলেছে। এ এমন এক বিশ্বজনীন সত্তা যা দেশের সীমা, জাতিগত স্বাতন্ত্র্য সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য, ইত্যাদির ব্যবধান ঘুচিয়ে দিয়ে একই নীল আকাশের নিচে সকলকে একাকার করে দেবে। এই সম্ভাবনা কমলের ধারণায় দুর্বার; এবং দুর্বার বলেই একে নমস্কার জানিয়ে কমল দেশের ঐতিহ্যকে অস্বীকারের আহ্বান জানিয়েছে। বলেছে, ভারতীয় হিসেবে পরিচয় যদি ঘোচেই, বিশ্বমানুষ হিসেবে বৃহত্তর পরিচয় তো রইলোই। কমলের আহ্বানের মধ্যে আত্যন্তিকতার এবং অবশ্যম্ভাবিতার ছাপ সুস্পষ্ট।

এই আহ্বানে শরৎচন্দ্রের সমর্থন আছে কি নেই সে জিজ্ঞাসা আপাতত মুলতুবী রেখে সাংস্কৃতিক রূপান্তরে ঐতিহ্যের ভূমিকা কি, সে সম্পর্কে ঈষৎ আলোচনা করা যাক। ঐতিহ্যের সংজ্ঞা নিরূপণের স্থান এ নয়; তবে, একথা স্বীকার্য যে আধুনিককালের মানুষের নিকট ঐতিহ্যের অভিধা অনেক ব্যাপক ও গভীর। বিশেষ ভৌগোলিক সীমায় আশ্রিত বলে নিজস্ব সৃষ্টিশীলতার যে গৌরব ঐতিহ্যের বেগবান দিক, তার অধিকার তো মানুষের বংশানুক্রমিক। এ ছাড়াও আছে সমগ্র মানব গোষ্ঠীর সৃষ্টিসম্ভার, তার ঐতিহ্যের সঞ্চয়, শ্রেয়সের ধ্যান, বিভেদজয়ী ঐক্যের সাধনা। এই সাধনায় স্থানিক বিশেষত্ব ততটা স্বীকার্য নয়, যতটা স্বীকার্য বিশ্ববিহারের সত্যতা এবং মানবিক অভিজ্ঞানের সৌন্দর্য। অর্থাৎ, ঐতিহ্যের বোধে জাতীয় সাংস্কৃতিক প্রবাহমানতার চেতনার সঙ্গে বিশ্বমানবিক উত্তরাধিকারের চেতনা সম্পৃক্ত।

কিন্তু, বিকাশের অসমতার দরুন ঐ সাধনায় সব দেশ বা সব জাতির অবদান ঐশ্বর্যের গুরুত্বে এক বা সমান নয়; বিশেষত, ধনবাদী সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বব্যবস্থায় বিভিন্ন জাতির স্বাধীনতা ও মুক্তিসংগ্রামের প্রশ্নটি জড়িত বলে

একটি পরাধীন দেশের মানুষের ঐতিহ্যের বোধ স্বাধীন দেশের মানুষের বোধ থেকে স্বতন্ত্র হতে বাধ্য। জাতীয় মুক্তিসংগ্রামে লিপ্ত মানুষের নিকট ঐতিহ্যের বোধ—সেই ঐতিহ্য যদি তার বেগবান সত্তা হারিয়েও ফেলে থাকে—আনে সংগ্রামের প্রেরণা, যেমন 'শেষপ্রশ্ন' রচনাকালীন ভারতবর্ষেও এনেছিল। সেই বোধে আশ্রিত থেকে আক্রমণকারীকেও অনায়াসেই প্রত্যাক্রমণ করা যেতে পারত। ইওরোপের প্রেয়োবাদ কমলের কণ্ঠ আশ্রয় করে যখন ভারতীয় সমাজ-সংস্কৃতির মূল্যবোধগুলোকে আক্রমণে বিদ্ধ করছিল, তখন পাল্টা এই প্রশ্ন উচ্চারণ করা যেত—ইওরোপীয় বিশ্বদর্শনকেই সর্বমানবিক আদর্শ বলে স্বীকৃতি দানের দাবি কেন, যেখানে জানি ইওরোপীয় সভ্যতার মশালটি আলো দেখাবার জন্য নয়, আগুন জ্বালাবার জন্য? (ঋণ স্বীকার, রবীন্দ্রনাথ) কিন্তু, আশুবাবু অবিনাশবাবুরা ঐতিহ্যের অবক্ষয়ী প্রভাবে সংকুচিত ছিলেন; তাই এ প্রতি-প্রশ্ন উত্থাপিত হয়নি।

ঐতিহ্যকে একটি প্রবাহ রূপে গণ্য করাই যুক্তিযুক্ত। প্রবাহে ক্লান্তি আসা স্বাভাবিক, আর সেই ক্লান্তিলগ্নে প্রবাহ গতিরুদ্ধও হয়। বহিরাক্রমণ বা বহুরাষ্ট্রিক সংযোগ, বিশ্বমানবিক ঐতিহ্যের অধিকার দান করে, পুনরায় গতিশীলতা অথবা রূপান্তরের পথ উন্মুক্তও করে। এ সম্পর্কে স্মরণ রাখা কর্তব্য, এই নতুন অধিকারের মাধ্যম কিন্তু বুদ্ধিজীবীর দল। সেজন্য, দেশের বৃহত্তর জনসমষ্টির সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের বোধ এবং অনন্বিত বুদ্ধিজীবীদের বোধ এক নয়, হওয়া বোধ করি সম্ভবও নয়। কারণ, হাজার হাজার বছর ধরে প্রবাহিত-হতে-থাকা একটি সমাজের পুরাতত্ত্বের বৃত্ত, প্রতীক, মূল্যবোধ, শ্রেয়সের আশ্রয়, ইত্যাদি থেকে গণমানসকে বিচ্যুত করা এক অবাস্তব অভাবনীয় প্রস্তাব। সম্ভবত সেজন্য সহস্র বছর ধরে সামাজিক মনোভূমি কর্ষণ করার প্রয়োজন হবে। তাই, জনসমষ্টি ঐতিহ্যের সঙ্গে সংযোগের সম্পর্কে সম্পর্কিত, কিন্তু বুদ্ধিজীবীরা যুগপৎ সংযোগ ও বিয়োগের সম্পর্কে। সংযোগ তাদের জন্মগত, আর বিয়োগের সম্পর্কে অর্জিত মূল্যবোধ ও বিশ্বমানবিক সঞ্চয়ের মাধ্যম হিসেবে এ বিষয়ে গণমানসকে সচেতন ও শিক্ষিত করে তোলে তারা ঐতিহ্যে গতিশীলতা অর্থাৎ রূপান্তরের জন্য জমি কর্ষণ করে। যেমন করেছিলেন, বিগত শতাব্দীর ভারতীয় বুদ্ধিজীবীরা। তাঁদের ক্ষেত্রে ঐক্য-বিরোধের দ্বান্দ্বিক সম্পর্কটা সৃষ্টির পথ দেখিয়েছে। কিন্তু সম্পর্কটা যেখানে শুধুই অস্বীকারের, শুধুই বিয়োগের,—যেমন কমলের ক্ষেত্রে—সেখানে সৃষ্টির মন ও

পথ দুই-ই অবরুদ্ধ। কমল তাই ব্যর্থ, তেমনি ব্যর্থ স্বদেশ পলাতক বুদ্ধিজীবীর দল; তেমনি ব্যর্থ ও নির্লিপ্ত ইওরোপীয় প্রেয়োবাদে আশ্রিত উচ্চকোটির ভারতীয়রা।

সত্য অর্থে ঐতিহ্য স্থিতিশীল বা কালাতীত সত্তা নয়, তা রূপান্তরশীল; মানুষের বাস্তব জীবনের রূপান্তরধর্মিতার সঙ্গে এর সম্পর্ক অঙ্গাঙ্গী। রূপান্তরের পথে অগ্রসর হতে হতে পারস্পরিক আত্মীকরণের মাধ্যমে বিশ্বের সমস্ত মানুষ একদিন নিজ নিজ ভৌগোলিক ও সংস্কারের সীমা লঙ্ঘন করে মিলিত হবে, এই ভবিষ্যদ্বাণীর সঙ্গেও বিবাদের কোন হেতু নেই। সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদ হয়তো একে স্বীকার করে নিতে কুণ্ঠিত, কিন্তু উদার জাতীয়তাবাদ তো এই শতাব্দীর গোড়াতেই জাতীয়তাবাদকে বিশ্বজাতীয়তাবাদের ঔদার্য ও বিশালতা দান করেছে। মহামিলনের সেই লগ্নটি কোন্ সুদূর ভবিষ্যতের গহ্বরে নিহিত, এই মুহূর্তে তা অনুমান করা কঠিন। তবে এটা নিশ্চিত যে, বর্তমানে অস্তিত্বশীল বিশ্বসংস্থাগুলোর বিবিধ প্রকল্পের মধ্য দিয়ে তার আবির্ভাবের সম্ভাবনা প্রশস্ততর হচ্ছে। কিন্তু এহ বাহ্য। প্রশ্ন, সেই শুভদিনে বিভিন্ন দেশ ও মানুষ কি উপঢৌকন নিয়ে পরস্পরকে আলিঙ্গন করবে? সে কি বিশিষ্টতাহীন সাদৃশ্য, না বিশিষ্টতাযুক্ত সহমর্মিতা? যদি সাদৃশ্যটাই মুখ্য হয়, তাহলে তার নবসৃষ্টির সম্ভাবনাহীন ক্লীবত্ব মানবগোষ্ঠীকে অবক্ষয়ের পথেই নিয়ে যাবে। আর যদি দ্বিতীয় সম্ভাবনাকে স্বীকার করে নেওয়া হয়, তাহলে সেদিন প্রত্যেক জাতিই আপন ঐতিহ্যের সৃষ্টিসম্ভার দিয়েই বিশ্বের মানবিক ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করবে, পাশ্চাত্ত্যীকরণের প্রবক্তা কমল যাই বলুন না কেন। কারণ, এ তো পরীক্ষিত সত্য, মানুষ আপন সৃষ্টির ঐশ্বর্য দিয়েই অপরকে আকর্ষণ করে, অনুকরণ-জনিত সাদৃশ্যে সৃষ্টি নেই, আকর্ষণও না।

মানুষের হৃদয়বৃত্তি কতটা অনুষ্ঠাননির্ভর, প্রচলিত বৈবাহিক সম্পর্কের মধ্যে নারীর ব্যক্তিত্ব বিকাশের অবকাশ আছে কি নেই, একনিষ্ঠতা অথবা নিষ্ঠার অভাব, সেই সম্পর্কে কী আবর্তের সৃষ্টি করে, ইত্যাদি সমস্যার অবতারণা শরৎ-সাহিত্যে নতুন নয়। কিন্তু কমল সেই সমস্যাগুলোর বিচারে গুরুত্ব আরোপ করেছে দু'টি বিষয়ের উপর: (১) ব্যক্তিমানসে সুখপ্রবণতা এবং তা চরিতার্থ করার আত্যন্তিক বাসনা এবং (২) হৃদয়বৃত্তিকে তার স্ব-নিয়মে, এর উৎস অভিব্যক্তি এবং সার্থকতার নিয়মে বিচারের দাবি।

প্রথমেই স্বীকার্য, নরনারীর প্রেম অথবা হৃদয়বৃত্তির প্রক্ষেপ এক অতিশয়

জটিল, রহস্যময় ব্যাপার। মানুষের যুক্তিবুদ্ধির যেমন অতীত, তেমনি এর গভীরতা পারাপারহীন। আর সেজন্যই প্রেমসম্পর্ক বা এর সম্ভাবনাময়তা কোনদিনই আঙ্কিক সূত্রে ধরা দেয় না। নৈয়ায়িকের শাসন এখানে ব্যর্থ। আর এও স্বীকার্য, মানুষের মন যেহেতু আত্মগত বিশ্বের বাইরে থেকে, অর্থাৎ যেসব উপাদান নিয়ে তার প্রতিবেশের সৃষ্টি তা থেকে, প্রেরণা আহরণ করে রসিয়ে ওঠে, সেইহেতু তার রসিয়ে ওঠার সম্ভাবনাও অনন্ত। সে জন্য কমলের দাবি—একদা কাউকে ভালবেসেছি বলে আর কথনও আর কাউকে ভালবাসতে পারব না, মনের এই জড়ধর্ম সুস্থ নয়—এর সঙ্গে বিবাদ অচল। অধিকন্তু, যে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ও ব্যক্তিক সুখান্বেষণের দাবিতে আধুনিক বিশ্ব সোচ্চার, সেই ব্যক্তির মানসবৈশিষ্ট্যকে মর্যাদাদানের প্রশ্নেও অসঙ্গত কিছু নেই। কিন্তু এ প্রসঙ্গে অবশ্যই স্মরণীয় যে, একান্তভাবে স্বাধীন অন্য-নিরপেক্ষ, পরম অর্থে স্বতন্ত্র ব্যক্তি অস্তিত্বহীন; তাকে কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবে না। কারণ, মানবিক বিশ্বে তার অধিষ্ঠান বলেই মানুষ মাত্রেই যুগপৎ সামাজিক ও ব্যক্তিক বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। তাছাড়া বৃহত্তর অর্থে, মানুষের প্রেম-সম্পর্কও সামাজিক সম্পর্কের অন্তর্ভুক্ত। কোন একজন মানুষের সঙ্গে বিবাহের সম্পর্কে আবদ্ধ হওয়ার অর্থই একটি বিশেষ সামাজিক সম্পর্কের অঙ্গীভূত হওয়া। সে-জন্যই বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন কালে বিভিন্ন সমাজ বিবর্তনের বিভিন্ন স্তরে নর নারীর প্রেম-সম্পর্ককে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য নানাপ্রকার অনুষ্ঠানগত প্রথা, বিধিনিষেধের অনুশাসন, দায়িত্বের বোঝা, ইত্যাদির প্রবর্তন করেছে। সামাজিক সম্পর্ককে যুগপৎ সৃষ্টিশীল ও স্থিতিশীল, এবং ভবিষ্যৎ সন্তান-সন্ততির পক্ষে নিরাপদ রাখার জন্যই এইসব আচরণবিধি এবং নৈতিক মানদণ্ডের সৃষ্টি। অর্থাৎ সমাজ তার নিজস্ব মূল্যবোধ এবং নৈতিক দৃষ্টিমার্গ ই মানুষের প্রেম-সম্পর্কের উপর আরোপ করেছে, করে আসছে।

আর সেজন্যই ব্যক্তিক কামনা বাসনার সঙ্গে কোন এক সময়ে ঐ সব মূল্যবোধের সংঘাত অনিবার্য হয়ে ওঠে। কারণ, নৈতিক মানদণ্ডের সীমা পূর্ব নির্ধারিত ও স্থিতিশীল; কিন্তু মানুষ রূপান্তরশীল সত্তা বলেই তার রূপান্তরের সম্ভাবনাও সীমাহীন। সুতরাং, বিবাহের সম্পর্কে আবদ্ধ দু'জন মানুষের পক্ষে অন্যের আকর্ষণের প্রেরণায় নতুনভাবে রসিয়ে ওঠার সম্ভাবনাও সর্বথা স্বীকার্য। আর, এই রসিয়ে ওঠা ব্যক্তিসত্তা যদি প্রেরণার বস্তুকে

অবলম্বন করে বেড়ে ওঠার পথে হৃদয়বৃত্তির চরিতার্থতা কামনা করে, তাহলে পূর্বতন বিবাহ সম্পর্ক অচল হয়ে পড়ে। এই জটিলতার সমাধান কি? মনের এই সৃষ্টিশীল সম্পর্ক স্থাপনের প্রবণতা কি স্বীকার্য, না অবদমনীয়? পাশ্চাত্যের বুর্জোয়া সমাজব্যবস্থার আদর্শ অনুসরণ করে কমল এ জিজ্ঞাসার উত্তর দিয়েছে। সে মুক্ত এবং সম্পূর্ণ দায়হীনভাবে অজিতের সঙ্গে বসবাস করার জন্য অনিশ্চিতের পথ ধরেছে। নিরাপদ পুকুর নিয়ে শুধুই প্রাণধারণ করতে চায়নি, বাঁচতে চেয়েছে বন্ধনহীন মুক্তির আস্বাদনে।

যুক্তি বিচার ও মানবিক মর্যাদার পরিপ্রেক্ষিতে কমলের বক্তব্য এবং আচরণের বিরুদ্ধতার কোন যুক্তিসিদ্ধ হেতু নেই। কিন্তু সামাজিক মূল্যবোধ এবং নৈতিক মানদণ্ডের নিরিখে প্রশ্ন অনেক। যেমন, নব উন্মেষিত প্রেম সম্পর্ক যদি পূর্বতন বিবাহ সম্পর্ককে অস্বীকার করতে চায়, তাহলে বিবাহ সম্পর্কজাত সন্তান সন্ততির দায়িত্ব কার উপর বর্তাবে? প্রেম সম্পর্কের মধ্যে নব ভাবে উজ্জীবিত হওয়ার বিশ্বজনীন সম্ভাবনার পটভূমিতে, সামাজিক সম্পর্কের স্থিতিশীলতা অথবা সামাজিক সংহতির রক্ষাকবচ কোথায়? যে সমাজ সংগঠনে আমাদের অধিষ্ঠান এবং অদূর ভবিষ্যতের যে সমাজ সংগঠনের চিত্র আমাদের মানসপটে উদ্ভাসিত হয়, তা নারীপুরুষের প্রেম সম্পর্কের সার্বভৌমত্ব কতটা স্বীকার করবে? প্রতিটি মানবসন্তান যদি আপন প্রেমসম্পর্ককে সামাজিক সম্পর্কের উর্ধ্বে স্থাপন করার দাবিতে সোচ্চার হয়, তাহলে মানব সমাজের ভবিষ্যৎ কতটা নিশ্চিত? আনুষ্ঠানিক বিবাহ সম্পর্কের প্রয়োজনীয়তা কি নিঃশেষিত? প্রেম-প্রীতি-ভালবাসার সম্পর্ক কি দায়হীন?

॥ ৪ ॥

'শেষপ্রশ্ন'-এর প্রশ্নটিকে অবলম্বন করে এতসব জিজ্ঞাসার মুখোমুখী দাঁড়াতে হয়। মানব অভিজ্ঞতার শেষ কথা আজও উচ্চারিত হয় নি, কোন দিনই উচ্চারিত হবে না। সেইজন্য, একথা কোনক্রমেই স্বীকার্য নয় যে, ভারত ইতিহাসের বা ইওরোপীয় ইতিহাসের বা চৈনিক ইতিহাসের কোন এক স্তরে উচ্চারিত বাণীই সেই সেই দেশের জাতীয় জীবনসাধনার চরম ও পরম বাণী। প্রতিটি রূপান্তরের সঙ্গে সঙ্গে সাংস্কৃতিক মূল্যবোধের, ঐতিহ্যের, সামাজিক সম্পর্কের রূপান্তর। যে বিশ্বজনীন ঐক্য ও একীকরণের পথে আধুনিক বিশ্ব দ্রুত ধাবমান, সেই ঐক্য সংসাধিত হওয়ার পর মানব সমাজ সম্ভবত নতুনভাবে

পূর্বোক্ত প্রশ্নগুলোর মূল্যায়নে প্রবৃত্ত হবে। আর, অধুনা পাশ্চাত্ত্য ভুবনে যে সহনশীল নির্বাধ (পারমিসিভ) সমাজ আবির্ভূত হয়েছে, তা-ই যদি বিশ্বজনীন স্বীকৃতি লাভ করে, তাহলে ভাবীকালের সমাজ হয়ত বিবাহ সম্পর্ককে সৃষ্টিশীল অথবা প্রয়োজনীয় সম্পর্ক বলেই গণ্য করবে না। আনুভূতিক সম্পর্কের দিক থেকে সে কালের সমাজ সংগঠন হবে অভিনব। আজকের মন ও চোখ দিয়ে সে সমাজকে চেনা দুষ্কর।

কিন্তু, মানবিক ইতিহাস বিবর্তনের বর্তমান স্তর পর্যন্ত যে শ্রেয়সের বোধে মানুষের উত্তরাধিকার, তার বিচারে কমল-অজিত সম্পর্ক নৈরাজ্যবাদী; কেননা সামাজিক সম্পর্কের মধ্যে এর স্বীকৃতি অনুপস্থিত। এই সম্পর্ক বিস্ফোরণের বারুদে ভরা, ব্যক্তিক স্বাধীনতা এবং সুখান্বেষণ প্রবৃত্তির চরম অভিব্যক্তি; কিন্তু সাংস্কৃতিক রূপান্তরে তাদের ভূমিকায় সৃষ্টিশীলতা সন্দেহজনক। লক্ষণীয় যে, কমল বা অজিত কেউই দেশের আর্থনীতিক সামাজিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে সৃষ্টিশীল সম্পর্কে সংযুক্ত নয়। পূর্বেই উল্লেখিত হয়েছে, কমল সমাজের সঙ্গে অনন্বিত; শুধু জন্মগত বিশিষ্টতার দরুন নয়, শিক্ষা ও আদর্শের অনুসরণেও। অজিতও তাই। পৈতৃক সম্পদের উত্তরাধিকার তাকে উচ্চকোটির এমন এক অংশে সংস্থাপিত করেছে, যারা অনুপার্জিত অর্থ সম্ভোগ করে। সুতরাং, সমাজের প্রত্যক্ষ বাস্তব কর্মসম্পর্ক বা সৃষ্টিশীলতা থেকে তারা বহুদূরে অবস্থিত। আরও লক্ষণীয় যে, কোন সংগ্রামী ঐতিহ্যও তারা বরণ করে নেয়নি, নতুন সমাজ ও সংস্কৃতি নির্মাণের কোন আন্দোলনের অথবা সংগঠিত ক্রিয়াকাণ্ডের অংশীদার তারা নয়। তাদের একক এবং যুগ্ম অভিজ্ঞতার ভুবন সেজন্যই অতিশয় ক্ষুদ্র, এবং ঐ ক্ষুদ্র পরিসরে স্বাধীনতা ও মুক্তির অনুভব, প্রখর এবং ব্যাপক হওয়া সত্ত্বেও, অনুর্বর। সুতরাং দ্বিধাহীনভাবেই একথা ঘোষণা করা চলে, তাদের পক্ষে নতুন সৃষ্টিশীল বা গভীর সামাজিক সংকেতবহ জীবনদর্শনের পথিকৃৎ হওয়া সম্ভবপর ছিল না।

প্রসঙ্গত এ প্রশ্ন মনে আসা স্বাভাবিক, শরৎচন্দ্র স্বয়ং পূর্ব আলোচিত প্রশ্নগুলোর উত্তর কিভাবে দিয়েছেন বা আদৌ দিয়েছেন কিনা। পাশ্চাত্ত্যী-করণের অনুকূলে কমলের যে সুতীক্ষ্ণ যুক্তি সওয়াল, তার সপক্ষে শরৎচন্দ্রের সায় বা সমর্থন আছে কি? উপন্যাসে কমল অপর সকলকে যুক্তিতর্কে এবং ব্যবহারিক আচরণের সাহসিক বলিষ্ঠতায় বিধ্বস্ত করে অজিতের সঙ্গে চলে গেল। তার অসামান্য বিজয়ে কমলের প্রতি লেখকের পক্ষপাতিত্বের ধারণা

পাঠকচিত্তে জাগ্রত হওয়া সম্ভব। [রাজেনের সঙ্গে বিতর্কে কমলের নিষ্প্রভ পরিচয় একটি অন্তর্বর্তীকালীন গৌণ অধ্যায় বলেই তেমন গুরুত্ববহ নয়।] কিন্তু এবম্বিধ ধারণার কোন বাস্তব ভিত্তি নেই। শরৎচন্দ্র পাশ্চাত্ত্যীকরণের সমস্যাটিকে তার আপন শক্তির ঐশ্বর্যের মধ্যে চিত্রিত করেছেন এবং এর সম্ভাব্য পরিণতি কি তার আভাস দিয়েছেন। কিন্তু অভিমত ব্যক্ত করেন নি, প্রশ্নের উত্তরও দেন নি। সে উত্তর তিনি দিয়েছেন 'শেষপ্রশ্ন'-এ নয়, 'বিপ্রদাস'-এ। 'বিপ্রদাস'-এ তিনি বন্দনাকে রক্ষণশীল মুখুজ্যে পরিবারের ঐতিহ্যের নিকট আত্মসমর্পণ করিয়েছেন। মানসবৈশিষ্ট্যে পাশ্চাত্ত্যের সন্তান বন্দনার হিন্দুসমাজের সনাতন মূল্যবোধের নিকট আত্ম-সমর্পণের মধ্য দিয়ে শরৎচন্দ্রের রক্ষণশীল মনোভঙ্গি যেমন নতুনভাবে পুনরুল্লেখিত হয়েছে, তেমনি এর মাধ্যমে এ ইঙ্গিতও তিনি দিয়েছেন যে, ঐতিহ্যের প্রাণধর্মিতা এখনও নিঃশেষিত হয়নি; তা বর্তমানকালেও সজীব এবং সম্ভাবনাময়। তাই এর আশ্রয় স্বীকার্য।

অন্যভাবে ব্যক্ত করলে বলা যায়, বন্দনাকে তিনি ঐতিহ্যের সঙ্গে অন্বিত করেছেন। ঐতিহ্যের সঙ্গে কমলের সম্পর্ক ছিল সম্পূর্ণ বিয়োগের, বন্দনার পরিপূর্ণ সংযোগের, আত্মসমর্পণের। বিশুদ্ধ সংযোগের সম্পর্ক শুধু দায়িত্ব আর কর্তব্যবোধের সচেতনতা জাগায়; যা আছে, চলে আসছে, তাকেই বাঁচিয়ে রাখার গরজে উদ্বুদ্ধ করে। ঐতিহ্যের সঙ্গে আত্মসমর্পণের পথে ব্যক্তিমানসের এই যে অন্বয়ের সম্পর্ক, তাকে আদর্শ বা সৃষ্টিশীল সম্পর্ক বলা কঠিন। কারণ, এ সম্পর্কের আগ্রহ শুধু সংরক্ষণের, সৃজনশীল রূপান্তরের নয়। আবার, বিশুদ্ধ বিয়োগের সম্পর্কও সত্য সম্পর্ক নয়। কারণ, 'নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখে' এ শুধু অস্বীকারেই তৎপর, ঐতিহ্যের সঙ্গে আত্মিক সম্পর্ক স্থাপন করে একে নতুন বন্দরের দিকে নিয়ে যাওয়ার দায়িত্ব গ্রহণে অনিচ্ছুক। ইতিপূর্বে যুগপৎ সংযোগ-বিয়োগের যে সম্পর্কের কথা আলোচনা করা হয়েছে, ব্যক্তিমানসের সেই মনোভঙ্গিই সৃজনশীল। স্বীকার করার পথে অস্বীকার অথবা অস্বীকারের পথে স্বীকার করার মাধ্যমেই ব্যক্তিমানুষ সামাজিক রূপান্তরের জমি সার্থকভাবে কর্ষণ করে।

[খ] শরৎচন্দ্রের শিল্পীসত্তা

শরৎচন্দ্রের শিল্পীসত্তার বিশ্লেষণে একটি সূক্ষ্ম স্ববিরোধের মুখোমুখী হতে হয়। সেটি এই: তাঁর বিভিন্ন উপন্যাসে বিভিন্ন চরিত্রের মুখে এমন সব কথা উচ্চারিত হয়েছে, এবং কয়েকটি নারীচরিত্রের জীবনচর্যার মাধ্যমে এমন মনোভঙ্গি অভিব্যক্ত হয়েছে যা প্রত্যক্ষভাবে প্রচলিত সামাজিক আদর্শের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ অথবা বিদ্রোহ, যার নিশ্চিত সংকেত অস্বীকার ও ভাঙনের পথে রূপান্তর ও প্রগতি। রবীন্দ্রনাথও শরৎসাহিত্যের এই লক্ষণটির প্রতি আকৃষ্ট হয়ে তাঁর "কালের যাত্রা" নাটিকাটি শরৎচন্দ্রের নামে উৎসর্গ করে লিখেছিলেন, "কালের রথ-যাত্রার বাধা দূর করবার মহামন্ত্র তোমার প্রবল লেখনীর মুখে সার্থক হোক এই আশীর্বাদসহ তোমার দীর্ঘ জীবন কামনা করি।" অথচ, সামগ্রিক বিচারে, উপন্যাসের কাহিনীবৃত্ত যেভাবে উন্মোচিত ও পরিসমাপ্ত হয়েছে এবং যে মূল্যবোধগুলোকে তিনি মানবিক কল্যাণের আধার বলে বিশ্বাস করেছিলেন, তার প্রবণতা কিন্তু সংরক্ষণের; ব্রাহ্মণ্য সমাজব্যবস্থার কাঠামো ও কাঠামো-আশ্রিত নৈতিক তত্ত্বগুলোকে সমষ্টিগত ও ব্যক্তিগতভাবে কল্যাণকর বলে স্বীকৃতি দান। শিল্পীমানসে যুগপৎ বিদ্রোহ ও সংরক্ষণ এই দুই বিরুদ্ধবাদী প্রবণতার অস্তিত্বের ব্যাখ্যা কি, স্বরূপ কি?

এই প্রসঙ্গের বিচারে সর্বদাই সাহিত্যে তাঁর কৃতিত্ব অথবা অর্জিত সাফল্যের কথা স্মরণ রাখা প্রয়োজন। এ ক্ষেত্রেও রবীন্দ্রনাথের উক্তির পুনরাবৃত্তি করে বলতে হয়, শরৎচন্দ্র মানুষের বেদনার কেন্দ্রে আপন বাণীর স্পর্শ দিয়েছিলেন, এবং দিতে পেরেছিলেন বলেই সাহিত্যপাঠকের "সর্বজনীন হৃদয়ের আতিথ্য" তিনি যতটা লাভ করেছিলেন অপর কোন সাহিত্যস্রষ্টার পক্ষেই তা অর্জন করা সম্ভবপর হয় নি, এমন কি স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের পক্ষেও না। কবির এই মন্তব্যের মধ্যেই শরৎ-সাহিত্যের মৌল আবেদন এবং এর প্রতিশ্রুতির দিকগুলো সত্য উপলব্ধিতে উন্মোচিত হয়েছে। তাঁর শিল্পসাধনার এটাই সম্ভবত মুখ্য কথা, তিনি দেশের সর্বাপেক্ষা দুঃখীজনের সুখদুঃখ আনন্দ-বেদনা সংগ্রামের সঙ্গে একাত্ম হতে চেয়েছেন। তাঁর নিজের ভাষায়, "সংসারে যারা শুধু দিলে, পেলে না কিছুই, যারা বঞ্চিত, যারা দুর্বল, উৎপীড়িত, মানুষ হয়েও মানুষ যাদের চোখের জলের কোন হিসাব নিলে না, নিরুপায় দুঃখময় জীবনে যারা কোন

দিন ভেবেই পেলে না সমস্ত থেকেও কেন তাদের কিছুতেই অধিকার নেই”, সমাজ-সংগঠনের অন্তর্গত বা বহির্ভূত ব্রাত্য সব মানুষের হৃদয়ক্রন্দনকেই তিনি সাহিত্যে শিল্পরূপ দিতে চেয়েছেন। এই উক্তি যে একজন অতিশয় সৎ, সামাজিক দায়িত্ববোধে উদ্বুদ্ধ, এবং ইতিহাসের প্রবাহে ব্যক্তিমানুষের ভূমিকা সম্পর্কে সচেতন লেখকের উক্তি, সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নেই। মানুষের ক্রন্দন, আকৃতি ও অন্তরবিক্ষোভকে শিল্পরূপ দানের আকাঙ্ক্ষা স্বভাবতই দুটি পরস্পর সম্পৃক্ত ধারায় প্রবাহিত হয়েছে: (১) সেইসব নিগৃহীত মানুষের মানবতাকে পাঠকের অনুভবে সঞ্চারিত করা, সত্য করে তোলা, এবং (২) সমাজ সংগঠনের যারা বিধায়ক তাদের অমানবিকতা ও অপ-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিবাদের বাণী উচ্চারণ করা। বলা বাহুল্য, এর যে কোন একটির স্বীকৃতি অপরটির স্বীকৃতিকে অপরিহার্য করে তোলে। সেইজন্য, তাঁর সাহিত্য একদিকে যেমন বেদনার সাহিত্য, মানবিক প্রীতির সাহিত্য, মানব স্বীকৃতির সাহিত্য, অপর দিকে তা তেমনি যা আছে তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদের স্বীকৃতিতে বাঙ্‌ময়।

সর্বশেষ বিচারে যদিচ একথা মানতেই হয় যে শরৎচন্দ্র সামাজিক ঐতিহ্যের আশ্রয় ত্যাগ করেননি, তথাপি তাঁর প্রতিবাদী সত্তাকে শ্রদ্ধায় স্মরণ করার প্রয়োজনীয়তা আজ অধিক; বিশেষত এই কারণে যে, ঐ মনোভঙ্গি ব্যক্তিমানুষকে তার স্বতন্ত্রতায়, স্ব-বৈশিষ্ট্যে সম্ভাবনাময়, এবং নিজস্ব এক স্বতন্ত্র ভুবনের অধিকারে স্থিত করতে চেয়েছে। এ দিকটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে যখন আমরা কিছু সংখ্যক নারী চরিত্রের দিকে তাকাই। ঔপনিবেশিক শাসন-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই, উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদ থেকেই, ভারতবর্ষে নারী মুক্তি আন্দোলনের সূত্রপাত। সুদীর্ঘকাল অতিবাহিত হওয়া সত্ত্বেও শুধু শরৎচন্দ্রের কালে কেন, আমাদের কালেও যে সে আন্দোলন প্রত্যাশিত সফলতা অর্জন করেনি তা অবশ্য স্বীকার্য। পিতৃপ্রধান সমাজে নারীত্বের অবমাননা, হৃতস্বতা, অমর্যাদা ও পীড়নের অজস্র পথ উন্মুক্ত। সেই অবমাননা ও অসহায়তা থেকে উদ্ভূত নারী হৃদয়ের হাহাকার ও বিক্ষোভ শরৎচন্দ্র শুনতে পেয়েছিলেন, তাঁর জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে তিনি এর আনুভূতিক সান্নিধ্যও লাভ করেছেন নিশ্চয়। আর, তাঁর চিত্তের যে সহজাত সংবেদনশীলতা, তা তাঁকে ঐ ক্রন্দনের শিল্পরূপ রচনার আগ্রহে ব্যাকুল করেছে। তাঁর একটি চিঠিতে দেখতে পাচ্ছি “দিদি; তোমাদের সম্বন্ধে কোনো সমাজই

কখনই সুবিচার করেনি ; আমার উপন্যাসের মধ্য দিয়ে আমি জীবনভোর তারই প্রতিবাদ করে যাব।" প্রতিবাদে সত্য সত্যই মুখর হয়েছেন তিনি ; প্রতারিত, বঞ্চিত, অস্বীকৃত নারীর মর্মবেদনা ও আন্তর বিক্ষোভকে পাঠকের সংবেদনায় সঞ্চারিত করেছেন গল্প উপন্যাসের পৃষ্ঠায়। সেই বিক্ষোভ মানুষের প্রেমপ্রীতি ভালবাসা ও হৃদয়বৃত্তিকে আশ্রয় করে এমনি সোচ্চার হয়েছে যে, মনে হয়েছে সতীত্ব সম্পর্কিত প্রচলিত আদর্শ ও ধারণার ভিৎগুলো বুঝি ভেঙে যাচ্ছে ; মনে হয়েছে, শরৎচন্দ্র যেন নারীপুরুষের প্রেম-সম্পর্কের সামগ্রিক এবং কালোপযোগী বিচারের পক্ষপাতী। এ প্রসঙ্গে পাশ্চাত্ত্যীকরণের প্রবক্তা শুধু কমলের বক্তব্য নয়, অভয়া, কিরণময়ী এবং 'পথের দাবী'-র সুমিত্রার বিভিন্ন সময়ে উচ্চারিত যুক্তিতর্কের কথাও স্মরণীয়। তাঁর শিল্পীসত্তা যেন এই দাবি উত্থাপন করতে চেয়েছে, হৃদয়হীন জীবনমৃত সমাজসম্পর্কের নিকট মানুষের প্রাণের সহজ প্রবণতার আত্মসমর্পণ নয় ; প্রাণধর্মের স্বাভাবিক প্রেরণা ও অভিব্যক্তিকে স্বীকার করে নিয়ে সামাজিক ন্যায়াদর্শ, ধর্মীয় অনুশাসন, এবং মূল্যবোধের সংস্কার ও নবায়ন প্রয়োজন। তাঁর শ্রেয়সের বোধ সম্ভবত এই দাবিতে অঙ্গীকারবদ্ধ হতে কুণ্ঠিত, কিন্তু শিল্পীমানসে ভিন্ন ভিন্ন চরিত্র সম্পর্কে যে মানব-স্বীকৃতি বিদ্যমান, তা-ই ঐ দাবিতে বাণীরূপ লাভ করেছে। শিল্পীসত্তা এভাবেই স্মৃতি-শ্রুতি বিশ্বাসের আকর্ষণ অতিক্রম করে, উত্তীর্ণ হয়। আর এই দাবি এবং প্রতিবাদ যে উচ্চারিত হয়েছে তাতেই তাঁর চিত্তের আধুনিক বৈশিষ্ট্যটি উন্মোচিত হয়েছে, এবং তাঁর সাহিত্য উত্তরকালের হৃদয় সান্নিধ্য লাভ করেছে। সামাজিক প্রগতিতে এই অবদান কোনমতেই অস্বীকার্য নয়।

প্রসঙ্গত, শিল্পসাহিত্যের আবেদনগত একটি বৈশিষ্ট্য বিচার্য। তত্ত্বগত বিচারে রক্ষণশীলতার ঝোঁক সত্ত্বেও সাহিত্য কি ভাবে সমাজপ্রগতির আনুকূল্য করে অথবা জমি কর্ষণ করে, এ প্রশ্ন বহু সময়েই জটিলতা সৃষ্টি করে। এ বিষয়ে লেনিনের সর্বকালসম্মত উক্তিটি পুনরায় স্মরণ করা যেতে পারে, যথা, উচ্চমানের অথবা ধ্রুপদী সাহিত্য কোন না কোনভাবে সমাজবিপ্লবকে প্রভাবিত বা ত্বরান্বিত করেই করে ; দৃষ্টান্ত, টলস্টয়। তাত্ত্বিক বিশ্লেষণে টলস্টয়ের সাহিত্যে প্রতি-ক্রিয়াশীলতা, নৈরাশ্যবাদ, কুসংস্কার, অকল্যাণকে মেনে নেওয়ার প্রবৃত্তি, ইত্যাদির স্বাক্ষর সুস্পষ্ট, তথাপি, তাঁর সাহিত্যকে লেনিন রুশবিপ্লবের দর্পণ বলে স্বাগত জানিয়েছিলেন। কারণ, বিষয়গত দিক থেকে সেই সাহিত্য সামন্ত-তান্ত্রিক রাশিয়ার মানব সম্পর্কের স্ববিরোধ ও মৃত্যুর অবশ্যম্ভাবিতার চিত্র

উন্মোচিত করেছিল, আর বিপ্লবের আত্যন্তিকতা সম্পর্কে পাঠকদের করেছিল সচেতন। অথবা, ধরা যাক বঙ্কিমচন্দ্রের কথা। 'আনন্দমঠ' উপন্যাসে তিনি একজন চিকিৎসক আমদানি করে ইংরেজদের বিরুদ্ধে বিজয়ী সন্তানদলের প্রতিজ্ঞাকে বিসর্জন করেন; বলেন, এখন ইংরেজই রাজা হবে, সুতরাং সংগ্রাম অর্থহীন। কিন্তু, বঙ্কিমের এই সিদ্ধান্ত কজন পাঠক মেনে নিয়েছেন? বরং 'আনন্দমঠ' পাঠ করে বঙ্কিম নির্দেশিত পথেই সহস্র সহস্র মানুষ সম্পূর্ণ ভিন্ন সিদ্ধান্তে উপনীত হয়ে ভিন্ন স্বাদের স্বদেশধর্মে দীক্ষিত হয়েছেন, এবং মুক্তি সংগ্রামে আত্মবিসর্জন করেছেন। সেজন্যই বলা যায়, সাহিত্যের আবেদন কখনও লেখক-নির্দেশিত সীমায় আবদ্ধ থাকে না।

শরৎ-সাহিত্যের ক্ষেত্রেও তাই। তাঁর বিদ্রোহী নারী চরিত্রের মুখে ও জীবনচর্যায় মুক্ত প্রেমের বাণী প্রচারিত হলেও শরৎচন্দ্র প্রচলিত পাতিব্রত্য ও নারী ধর্মের আদর্শ বর্জন করতে পারেন নি। কিন্তু, তাঁর পাঠকবর্গ যারা ব্যক্তিমানসের শূন্যতা ও হাহাকারে আন্দোলিত হয়েছেন, অথবা চমৎকৃত হয়েছেন ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের সোচ্চার ব্যাপ্তিতে, তারা সমাজনির্দিষ্ট সীমা মানবেন কেন? 'পথের দাবী'-তে সব্যসাচী বলছে, "মুক্তি কি তোমার এমনই ছোট্ট একটুখানি জিনিস? তাহাকে কি তোমার আরামে চোখ বুজিয়া স্নান করিবার চৌবাচ্চা স্থির করিয়া বসিয়া আছ? সে সমুদ্র—আছেই ত তাহাতে ভয়, আছেই ত তাহাতে উত্তাল তরঙ্গ, আছেই ত তাহাতে কুম্ভীর হাঙর! তরী সেখানেই ডোবে,—তবু সেইখানে আছে জগতের প্রাণ,—তারই মধ্যে আছে সকল শক্তি, সকল সম্পদ, সকল সার্থকতা! নিরাপদ পুকুর লইয়া কেবলমাত্র প্রাণ ধারণ করাটুকুই চলে, বাঁচা চলে না।" এই আহ্বানের উজ্জ্বলতায় যে মন সাড়া দিয়েছে এবং এর অন্তর্নিহিত রসের আস্বাদন লাভ করেছে, সে মন সামাজিক অনুশাসনের বন্ধন কিছুতেই স্বীকার করতে পারে না, সে বন্ধন লেখকের সমর্থন পেলেও না। কল্যাণচিন্তা অথবা শ্রেয়সের বোধে লেখক স্বয়ং সীমায় বিধৃত; কিন্তু আনুভূতিক আবেদনের প্রগাঢ়তায় ভিন্নতর ভাবনায় উদ্বিগ্ন পাঠকের নিকট সীমা লঙ্ঘনের সম্ভাবনা ও প্রতিশ্রুতি সর্বদাই উন্মুক্ত। শিল্পীমানসে রক্ষণশীলতার প্রবণতা ও প্রগতিশীলতার স্ব-বিরোধ পাঠকচিত্তে এমনিভাবেই মীমাংসিত হয়, এবং অনাস্বাদিতপূর্ব ভাবনায় পাঠককে উদ্বুদ্ধ করে। রক্ষণশীলতা সত্ত্বেও শরৎচন্দ্র যে এতাবৎকাল বিদ্রোহী কথাসাহিত্যিক বলে পরিচিত হয়ে আসছেন, এও তার একটি অকাট্য প্রমাণ।

তাঁর প্রতিবাদী শিল্পীসত্তা সমাজের নিম্নকোটির মানুষের চরিত্রচিত্রণ এবং মর্মবেদনার মধ্য দিয়েও প্রকাশিত হয়েছে। সামন্ততান্ত্রিক পল্লীসমাজের নিম্ন স্তরের মানুষ দু একটি ছোট গল্প ছাড়া উপন্যাসের মুখ্য চরিত্র রূপে আসন পায়নি; এও সত্য যে, মানুষের সামাজিক অস্তিত্ব অথবা শ্রেণীরূপ তাঁর সাহিত্যে বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের সত্যতায় উদ্‌ঘাটিত হয়নি। তথাপি এ কথারও প্রতিবাদ চলে না যে, তাদের দুঃখতাপসহা জীবনের অভিজ্ঞতাকে আত্মগত করার প্রয়াস তিনি কখনও বিস্মৃত হননি। বরং, তাদের জেগে ওঠার সাড়া, অন্যায় ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ, এমনকি সংঘবদ্ধ সংগ্রামের সংকল্প ও চিত্র উপন্যাসে চিত্রিত হয়েছে; যেমন, 'পল্লীসমাজ' গ্রন্থে জমিদার বেণী ঘোষাল ও রমার বিরুদ্ধে, হিন্দু-মুসলমান প্রজাদের সম্মিলিত আন্দোলন এবং প্রতিরোধ, 'দেনাপাওনা' উপন্যাসে জমিদার জীবানন্দের জমি হস্তান্তর করার সংকল্পের বিরুদ্ধে দরিদ্র কৃষকদের গণআন্দোলনের প্রস্তুতি, ইত্যাদি। আবার, কোন কোন ছোট গল্পে শোষণবাদী সমাজব্যবস্থার বিরুদ্ধে উচ্চারিত হয়েছে দরিদ্র মানুষের অভিশাপের বাণী। বলা বাহুল্য, ঐ বাণীকে উচ্চগ্রামে বেঁধে তিনি তার প্রচারে আত্মনিয়োগ করেননি; অথবা শিল্পকর্মকে নান্দনিক দিক থেকে দূষিত করেননি। কাহিনীবৃত্তের সহজ পরিণতিতে তার আন্তর গরজেই সেই সত্য প্রতিভাত হয়েছে। 'মহেশ' 'অভাগীর স্বর্গ' ইত্যাদি গল্প স্মরণীয়।

ব্যক্তিগত জীবনেও তিনি ছিলেন সহজের সাধক। এমন আড়ম্বরবিহীন, অহংবর্জিত, আটপৌরে, সাদাসিধে জীবন খুব স্বল্পসংখ্যক প্রতিষ্ঠিত সাহিত্যিককেই যাপন করতে দেখা যায়। যাঁরা তাঁর ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে এসেছিলেন, তাঁদের রচনা থেকে জানা যায় যে অনেক সময় তাঁরা তাঁর গ্রাম্যতায় বিব্রত বোধ করেছেন; সহুরে ভব্যতা ও আনুষ্ঠানিক রীতিনীতির কৃত্রিমতা মেনে নেওয়া তাঁর পক্ষে কঠিন হতো, আর গ্রাম্যসমাজের বিধায়কদের রক্তচক্ষুকে তিনি থোড়াই তোয়াক্কা করেছেন, একঘরে হওয়ার বিচ্ছিন্নতাবোধকে সাহসিকতার সহিত লালন করেছেন। তাঁর সমগ্র জীবনই যেন কৃত্রিমতা, হৃদয়হীনতা, প্রথাসিদ্ধ অমানবিকতার বিরুদ্ধে এক মূর্ত প্রতিবাদ, যার মৌল প্রত্যয় হলো সহজে স্থিত হওয়া, সহজের মধ্যে স্থিত মনুষ্যত্বকে স্বীকৃতি দান করা। সামাজিক সংগঠনে মনুষ্যত্বের অবমাননা ও অস্বীকৃতি শরৎচন্দ্রকে চিরকাল বিক্ষুব্ধ করেছে, করেছে অস্থির। ফলে, এর বিরুদ্ধে সামগ্রিক প্রতিবাদ তাঁর শিল্পী-সত্তারই প্রাথমিক অঙ্গীকার। একটি চিঠিতে তিনি লিখেছেন, "একথা বোধ

করি বহু লোকেই স্বীকার করবেন যে সাহিত্য রসের মধ্য দিয়ে পাঠকের চিত্তে যেমন সুবিমল আনন্দের সৃষ্টি করে, তেমনি পারে করতে মানুষের বহু অন্তর্নিহিত কুসংস্কারের মূলে আঘাত। এরই ফলে মানুষ হয় বড়, তার দৃষ্টি হয় উদার। তার সহিষ্ণু ক্ষমাশীল মন সাহিত্যরসের নতুন সম্পদে ঐশ্বর্যবান হয়ে ওঠে।" এই বিশ্বাসের আলোকে তাঁর সাহিত্য যে ঐশ্বর্যশীল তার প্রমাণ, কালান্তরেও তাঁর সাহিত্যের সমাদর হ্রাসপ্রাপ্ত হয়নি, বরং শ্রদ্ধায় মমতায় অনুরাগে লালিত হচ্ছে।

অথচ, রবীন্দ্রসাহিত্যের যে ব্যাপ্তি, উপলব্ধির যে প্রগাঢ়তা, তার অধিকার শরৎচন্দ্রের ছিল না। তিনি স্বয়ং সে কথা মেনে নিয়ে লিখেছেন, "আমার সাহিত্যসাধনা তাই চিরদিন স্বল্প-পরিধি-বিশিষ্ট। হয়ত, এ আমার ত্রুটি, হয়ত এ-ই আমার সম্পদ, আপনাদের স্নেহ ও প্রীতি পাবার অধিকার।" ঐ স্বল্প-পরিধিযুক্ত পরিবেশে যে জীবন বিধৃত, তার বাস্তবতা বা সত্যতা একদা পাঠককে চমকিত সচকিত করেছিল, সম্ভবত এখনও করে। আর সেজন্যই তাঁর উপন্যাস-কাঠামোর অসংখ্য শিল্পগত ত্রুটি বিচ্যুতির প্রতি দৃষ্টিদানের অবসর পাঠকের হয়নি।

পূর্বেই কথিত হয়েছে, শরৎসাহিত্য মানব স্বীকৃতির সাহিত্য। রবীন্দ্রনাথের মত মানুষের প্রতি তাঁরও বিশ্বাস ছিল অপরিসীম। তাঁর উপন্যাসগুলো বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, কাহিনী-বিবর্তনের মাধ্যমে পরিসমাপ্তিতে তিনি মানুষকে লালসা, স্বার্থপরতা, নীচতা, পরশ্রীকাতরতা, হিংসাদ্বেষ, ইত্যাদির বন্ধন থেকে মুক্ত করতে চেয়েছেন; এবং সমস্ত বিরোধ উত্তীর্ণ হয়ে তাকে ব্যক্তিক সততা ও ন্যায় এবং সমষ্টিগত কল্যাণবোধের সঙ্গে সংযুক্ত করতে চেয়েছেন। পারিবারিক ও সামাজিক সংগঠনের ঐতিহ্য যে শ্রেয়সের উত্তরাধিকার দান করেছে, তারই আকর্ষণে পুনরায় পারিবারিক ঐক্য সংস্থাপন করেছেন; এবং হৃদয়বৃত্তির যে প্রক্ষেপ পারিবারিক-সামাজিক শান্তি ও স্থিতিশীলতা বিনষ্ট করার নেশায় প্রবৃত্ত হয়েছিল, তাকে সেই পরিণতির পথ থেকে সরিয়ে এনে অন্য খাতে প্রবাহিত করেছেন। এতে ব্যক্তিক সুখান্বেষণের প্রবণতা যেমন অস্বীকৃত হয়েছে, তেমনি অপরদিকে এই রূপান্তরের মধ্যেই মানুষের প্রতি তাঁর অবিচল বিশ্বাসের স্বাক্ষরও বিদ্যমান। মানুষের প্রতি বিশ্বাসের অভাব ঘটলে সংস্কার অথবা কল্যাণ অথবা আত্মশাসনের প্রেরণা জাগ্রত হয় না। মানবস্বীকৃতির এই বিশিষ্টতার দরুণই 'দেনাপাওনা'-র

জীবানন্দ চৌধুরীর মত অত্যাচারী নীতিধর্মহীন জমিদার পরিশেষে রূপান্তরিত হয়, মানবিক কল্যাণের শুভ চিন্তায় তাঁর হৃদয় ভরে ওঠে। সামাজিক ও রাষ্ট্রব্যবস্থার বহুবিধ অন্যায়, গ্লানি ও অসত্যতা সম্পর্কে তিনি আমাদের সচেতন করেছেন এমন সহৃদয়তার সঙ্গে যে অন্যায় অসত্যকে চিনে নিতে আমাদের কোন অসুবিধা হয় না। সাহিত্যকর্মের মাধ্যমে পাঠককে এভাবে সচেতন করার পশ্চাতে এই প্রত্যয়ই ক্রিয়াশীল যে, নানাবিধ গ্লানিতে দীন হলেও মানুষ জ্ঞান বুদ্ধি উপলব্ধিতে উন্নততর জীবনযাপনে সমর্থ। শরৎসাহিত্যে মানুষের এই যে রূপান্তর, শিল্পের নিয়মে এর উপযুক্ত জমি কর্ষিত হোক বা না হোক এর সংকেত—বৃহত্তর মহত্তর সত্তায় পরিণত হয় মানুষ, ক্ষুদ্র থেকে বৃহতে তার উত্তরণ।

এই প্রশ্নেই আধুনিক কালের এক শ্রেণীর উপন্যাসের সঙ্গে শরৎ-উপন্যাসের পার্থক্য প্রকট। শিল্পবিচারে আধুনিক কালের উপন্যাস অনেক বেশি নিপুণ; কাহিনীবৃত্তের উপর কঠোর নিয়ন্ত্রণ, মনোবিশ্লেষণ, বাক্‌সংযম, জীবন সম্পর্কে অন্তর্দৃষ্টি, বিস্তৃত পটভূমির পরিকল্পনা, ইত্যাদি বিষয়ে এই উপন্যাস শরৎচন্দ্রের কাহিনী অপেক্ষা অনেক বেশি সংহত, শিল্পোত্তীর্ণ। কিন্তু, একটি বিষয়ে সে অতিশয় দীন; সেটা হলো, মানব স্বীকৃতির অভাব। সেইজন্য, এ উপন্যাস মানুষকে খাটো করে দেখতে অভ্যস্ত; বৃহতের পথে তার উত্তরণের সম্ভাবনা এখানে প্রায় অস্তিত্বহীন। কিন্তু, শরৎ-সাহিত্যে মানুষ ক্ষুদ্র নয়, কারণ, তার মহত্তর সত্তার বিকাশের পথ কোন অবস্থায়ই অবরুদ্ধ হয় না। যে কোন পরিবেশেই মানুষ স্ব-মহিমায় স্থিত হয়ে অমৃতত্ব লাভের পথে অগ্রসর হতে পারে।

শরৎচন্দ্রের উপন্যাসের সামাজিক পটভূমি আজ বিলুপ্তপ্রায়, পারিবারিক সম্পর্কের পবিত্রতা ও দায়িত্বের বন্ধন শিথিল, একটি কৃষিভিত্তিক সমাজ-সংগঠন যে শ্রেয়সের সৌধ নির্মাণ করেছিল তা দ্রুত অপস্রিয়মান, শিল্পকর্ম হিসাবে উপন্যাসের সাম্প্রতিক বিবর্তনও বিস্ময়কর; তথাপি এ যুগের পাঠক যে শরৎ-সাহিত্যের আস্বাদনে প্রসন্ন হয় তার কারণ ঐ সাহিত্য আমাদের আশ্রয় দান করে। মানবিক কল্যাণ, শুভবুদ্ধি এবং শ্রেয়সের বোধে তা উদ্দীপ্ত বলেই মানুষ হিসাবে আমরা তাতে আশ্রিত থেকে প্রীত হই, আত্মবিশ্বাসে বলীয়ান হই, এবং ঐ সাহিত্যের পৃষ্ঠায় আপন মনুষ্যত্বের স্বীকৃতি দেখে আনন্দিত হই। এই প্রবন্ধের আরম্ভে যে স্ব-বিরোধের উল্লেখ করা হয়েছে, তা লেখক এবং পাঠকের

অগোচরে এমনি ভাবেই বিলীন হয়, এবং উত্তরকালের জন্ত একটি সুখকর স্মৃতি এবং নির্ভয় মানব অভিযানের অঙ্গীকার রেখে যায়।

বাংলা গদ্য : রূপান্তরের প্রতিশ্রুতি ও সম্ভাবনা

ইতিহাসের যে-কোন বিন্দুতে সাংস্কৃতিক হাওয়া বদলের পশ্চাতে যেমন কালের আন্তর গরজ সংগোপনে ক্রিয়াশীল থাকে, তেমনি ব্যক্তিক ভাবনাচিন্তা, অনুসন্ধিৎসা, শ্রেয়সের ধ্যান এবং সাহিত্যে আত্মপ্রকাশের ভঙ্গিতেও কালের মর্মবাণী ও অনুশাসনটি আবিষ্কার করা কঠিন নয়। এই একটি সূত্রের মধ্যেই একটি বিশেষ ঐতিহাসিক কালের সঙ্গে আরেকটির, এক যুগের মানুষের সঙ্গে আর আরেক যুগের মানুষের পার্থক্য, মনোভঙ্গিতে ব্যবধান এবং বাচনভঙ্গিগত স্বাতন্ত্র্য আবিষ্কার করা সম্ভব। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম, দ্বিতীয় তৃতীয়-চতুর্থ পাদের সাহিত্য ও মানসভঙ্গির সঙ্গে তাই অত্যন্ত স্বাভাবিক কারণেই আধুনিক কালের, বর্তমানে সৃজ্যমান প্রবন্ধসাহিত্য ও মানসভঙ্গির প্রভেদ। এই প্রভেদ ব্যক্তিতে, ব্যক্তিত্বেও। স্মরণীয়, এই প্রভেদ শুধুমাত্র ব্যক্তিত্বের প্রভেদ নয়, তা মননশীলতায়, যুক্তির পারম্পর্য-নির্মাণে, বাচনভঙ্গিতে এবং সর্বোপরি বাক্যগঠনের শিল্পবোধে। বিগত প্রায় দুশো বছরের বাংলা গদ্যসাহিত্যের বিবর্তনের যদি সামান্যতম রূপরেখার পরিচয় গ্রহণ করা যায়, তাহলে এর গতিশীলতায়, ঐতিহ্য বিস্মরণে ও নবতর মূল্যসৃষ্টির প্রয়োগে, বিষয়নিষ্ঠতায় এবং বাচনভঙ্গির সুষমতা-অর্জনের সাধনায় বিস্মিত না হয়ে পারা যায় না।

ঔপনিবেশিক শাসনব্যবস্থা প্রবর্তিত হওয়ার পর ইংরেজি শিক্ষার পত্তন ও বিস্তার, এবং এর ফলশ্রুতিস্বরূপ ইওরোপীয় মানসের সঙ্গে পরিচয় থেকে যে সাহিত্য-সংস্কৃতির উন্মেষ, তার আগেও বাংলা গদ্যের অস্তিত্ব ছিল—সাহিত্যের ইতিহাসকারগণ তা প্রমাণ করেছেন। তবে একথা স্বীকার্য, সেই গদ্য আত্মমগ্ন একটি সমাজের ব্যক্তিক অনুভূতি এবং নৈতিক অনুশাসনের বাহন বলে এর উপলব্ধির পরিসর বিস্তৃত নয়; আর দীর্ঘকাল ব্যবহৃত হতে হতে সাবলীলতার দিকে অগ্রসর হলেও তা ঊনবিংশ শতাব্দীর আরম্ভের লগ্ন পর্যন্ত শিল্পিত বৈশিষ্ট্য অর্জন করেনি। বোধকরি, এ লগ্ন থেকেই বাংলা গদ্যের শিল্পস্বভাব অর্জনের প্রবণতা সর্বপ্রথম অনুভূত হয়।

কিন্তু, এক্ষেত্রেও কালের আন্তর প্রেরণাও নিরন্তর ক্রিয়াশীল। দুটি পরস্পর-বিরোধী সংস্কৃতির সংঘাতের আবর্ত থেকে উদ্ভূত সম্ভাবনাময়তা ও মূল্যবোধ-

গুলিকে কর্ষণ করে সমাজের ঈপ্সিত রূপান্তরসাধনে প্রায় প্রত্যেক অগ্রচারী নায়কই আগ্রহী। সেজন্য, দেখা যায়, রামমোহন থেকে বঙ্কিমচন্দ্র পর্যন্ত সামাজিক ক্রমের প্রতিটি স্তরেই প্রগতি আন্দোলনে যাঁরাই নেতৃত্বদান করেছেন, তাঁদের সকলকেই যুগপৎ নানা ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে হয়েছে। রাজনীতি, সমাজতত্ত্ব, ধর্মসংস্কার, মানবিক শ্রেয়, ইত্যাদি সর্ববিধ সমস্যায়ই তাঁরা ভাবিত ছিলেন। তাঁদের গদ্যরীতিতে এই ভাবনার স্বাক্ষর বিদ্যমান। রামমোহনের কথাই ধরা যাক। ইউরোপীয় সভ্যতা ও শ্রেয়সের সঙ্গে সংযোগের ফলে যে সম্ভাবনাময় আবর্ত সৃষ্টি হয়েছে, তার পূর্ণ সুযোগ গ্রহণের জন্য তিনি ভারতীয়দের সামাজিক এবং ধর্মীয় আচরণের রূপান্তরের পক্ষপাতী ছিলেন। সেজন্য, সামাজিক রীতিনীতি ও ধর্মাচরণের সংস্কারের জন্য তাঁর প্রভূত উদ্যম ব্যয়িত হয়েছিল। তাঁর বাংলা গদ্যভঙ্গি তার্কিকসুলভ মেজাজের প্রতিচ্ছবি মাত্র; তাঁর বক্তব্য যেমন গুরুগম্ভীর, বাচনরীতিও অতিশয় আক্রমণাত্মক। যেন, সর্বদাই শত্রুপক্ষকে প্রদক্ষিণ করে করে তা বিবর্তিত হয়েছে। তাছাড়া, সংস্কৃত শাস্ত্রের ভাষ্যকারদের রচনাপদ্ধতি অনুসরণে তাঁর গদ্যরীতি নির্মিত হয়েছে বলে তাতে বৈদগ্ধ্যের ছাপ যেমন সুস্পষ্ট, শিল্পসুষমার অনুপস্থিতি তেমনি অনায়াসলক্ষ্য। তাঁর বক্তব্যকে যুক্তি ও অনুভবগ্রাহ্যতা দান করাই ছিল তাঁর আশু লক্ষ্য, বক্তব্যকে শিল্প-প্রকৃতি দান করা নয়। অন্যদিকে, পূর্বকথিত আবর্তের সন্তান বলে তাঁর পক্ষে বর্ণহীন নিরাসক্তি অর্জন করাও সম্ভব ছিল না। তাই তাঁর বক্তব্য শ্লেষে, বিদ্রূপে, কটাক্ষে, পক্ষপাতে ভারাক্রান্ত।

অথচ, সমকালীন গদ্য যে শিল্পস্বভাবলাভের একান্ত অনুপযুক্ত ছিল তাও তো নয়। মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালংকারের 'প্রবোধচন্দ্রিকা'য় কৃষাণীর জবানিতে পাচ্ছি, "মোরা চাষ করিব ফসল পাবো রাজার রাজস্ব দিয়া যা থাকে তাতেই বছর শুদ্ধ অন্ন করিয়া খাবো ছেলেপিলে পুষিব।" যতি-চিহ্নাদির ব্যবহারে এ গদ্য সংহত হয়নি সত্য, কিন্তু তথাপি এর সজীব সাবলীলতা উপভোগ্য। আসলে, সৃজ্যমান প্রত্যক্ষকে তাঁর বহুান্বিত সম্পর্ক দ্বারা প্রভাবিত ও রূপান্বিত করার আকাঙ্ক্ষায় উদ্বেল ছিলেন বলেই রামমোহনের নিকট গদ্যের শিল্পসুষমার প্রশ্নটি গুরুত্ব লাভ করেনি।

সম্ভবত নান্দনিক সমস্যাটি 'তত্ত্ববোধিনী'-র কালেও তেমন প্রাধান্য লাভ করেনি। তথাপি, অক্ষয়কুমার দত্তের গদ্য যেন একটি সহজাত শিল্পস্বভাব অর্জন করেছিল। তাঁর প্রবন্ধে সামাজিক অগ্রগতির লক্ষণটিও স্পষ্ট। শুধু সামাজিক

আচরণ অথবা ধর্মাচরণ তাঁর প্রবন্ধের উপজীব্য নয়, সমাজসংগঠন থেকে আরম্ভ করে অর্থনীতি, রাষ্ট্রনীতি, শিক্ষা, সংস্কৃতি, বিজ্ঞান ইত্যাদি যাবতীয় প্রশ্ন তাঁর জিজ্ঞাসার বিষয়। আর সেজন্যই প্রতিপক্ষকে পদে পদে প্রদক্ষিণ করার কোনই প্রবণতা বা হেতু তার নেই, গদ্য আপন অন্তর্নিহিত মননশীলতা অবলম্বন করে পৌরুষদৃপ্ত ছন্দোময়তায় অগ্রসর। তাঁর হাতে প্রবন্ধ অসামান্য ব্যাপ্তি অর্জন করে, এবং যুগমানস তাতে প্রতিবিম্বিত হয় বলেই এর আবেদনও প্রত্যক্ষ এবং গাঢ়। 'তত্ত্ববোধিনীর' পক্ষে তাই সুদীর্ঘকাল ধরে সামাজিক রূপান্তরের আবর্তসঞ্জাত সম্ভাবনাময়তাকে লালন করা সম্ভব হয়েছিল। সেই যুগের অন্যতম প্রধান পুরুষ বিদ্যাসাগরের শিল্পীসুলভ সংবেদনশীলতা তৎকালীন গদ্যে যুগপৎ নমনীয়তা ও কমনীয়তা সংযোগ করে। পূর্বকালের পণ্ডিতি ঠাট পরিত্যাগ করে প্রবন্ধ সর্বজনীনতায় দীক্ষিত হয়। আর, একথা বোধ করি অস্বীকার করা যায় না যে, অক্ষয়কুমার দত্তের লেখনী থেকেই মননশীল প্রবন্ধের আবির্ভাব।

॥ ২ ॥

অথচ স্বীকার্য, উনবিংশ শতাব্দীতে প্রবন্ধসাহিত্য অ-জনপ্রিয় ছিল না। অবশ্য কালভেদে মানুষের রুচি ও মানসভঙ্গি অনুযায়ী প্রবন্ধসাহিত্যের জনপ্রিয়তার তারতম্য হওয়া স্বাভাবিক। বর্তমানকালের কথাই প্রসঙ্গত যাচাই করা যাক। বাংলা সাহিত্যের সম্প্রতিকালের সৃষ্টিপ্রাচুর্য আমাদের প্রত্যাশাকে উপপ্লাবিত করে দিগন্তপ্রসারী হয়ে উঠেছে; বিষয়বস্তুর এবং দূরবগাহী ভাবের বৈচিত্র্যে যেমন, তার বিশ্লেষণ রূপায়ণেও তেমনি এর সাফল্য বিস্ময়কর। পত্রপত্রিকা সংখ্যায় যেমন বিপুল, রূপসৃষ্টির কর্মে নিয়োজিত শিল্পীর সংখ্যাও তেমনি অগণিত, আর তেমনি সংখ্যাতীত ঐ সৃষ্টিতরঙ্গে অবগাহনেচ্ছু পাঠকের সংখ্যা। কিন্তু, অন্যান্য শাখার তুলনায় প্রবন্ধসাহিত্যের সমাদর অল্প। অথচ, বঙ্কিমচন্দ্রের 'বঙ্গদর্শন' পত্রের একাধিক সংখ্যা পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে, মুদ্রিত পৃষ্ঠাসংখ্যার অর্ধেক বা তার বেশি স্থান প্রবন্ধের জন্য সংরক্ষিত। আর তার বৈচিত্র্যই বা কত; তৎকালীন বিদগ্ধ সমাজকে দেশ সমাজ-জীবন সম্পর্কে সচেতন করার জন্য সম্পাদকের কী অপরিসীম আগ্রহ, মননশীলতা এবং বাস্তবকে বুদ্ধিগ্রাহ্যতায় উপলব্ধি করার উপর কী অসাধারণ গুরুত্বদান!

এর হেতু সম্পর্কে প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক। সামাজিক ক্রমের লক্ষণগুলো

মিলিয়ে দেখলে দেখা যাবে, উনবিংশ শতকের শেষ পাদে, ইঙ্গ-ভারতীয় সম্পর্কের ভারসাম্য ঈষৎ বিচলিত হলেও, নতুন সমাজ সংস্কৃতি বিকাশের সমস্ত সম্ভাবনা নিঃশেষিত হয়ে যায়নি; অঙ্গে তখনও সৃষ্টির প্লাবন। আর রাজনীতির ক্ষেত্রে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী জাতীয়তাবাদী মনোভঙ্গি আত্মপ্রকাশ করায় ঐ প্লাবনের সঙ্গে সংযুক্ত হয় আত্মজ্ঞানে ও আত্মপরিচয়ে স্থিত হওয়ার একটি আবেগতপ্ত অনুপম বাসনা। সেই সৃষ্টিশীলতায় অবগাহন করে তখনকার দিনের সংবেদনশীল বুদ্ধিজীবীদের পক্ষে সহস্র কৌতূহলে, জিজ্ঞাসায়, অনুভবে উদ্দীপ্ত না হয়ে উপায় ছিল না। তাঁদের চিৎপ্রকর্ষ এবং সামাজিক প্রশ্নগুলো সম্পর্কে গভীর অনুরাগ আজও আমাদের বিমুগ্ধ করে। কিন্তু তাঁদের যে বৈশিষ্ট্যটি সর্বাধিক উজ্জ্বল এবং গভীর বলে মনে হয়, তা হল, তাঁরা তাঁদের মনোরাজ্যে দেশ ও দেশের সমাজকে নিয়ত অস্তিত্বশীল রেখেছিলেন, এবং এ দেশে জন্মগ্রহণের সহজাত অহংকার ও ঐতিহ্যের সঙ্গে সংযুক্ত থেকে কালের চ্যালেঞ্জকে গ্রহণ করার সাহসিকতা দেখিয়েছিলেন। কোন ভাবনায় সমৃদ্ধ হলে দেশের মানুষ শ্রেয়সের সন্ধান লাভ করবে, কোন বিশেষ ধারায় পরিশীলিত হলে জীবনের বোধ সামগ্রিক কল্যাণের সন্ধান পাবে, এই একান্ত ভাবনায় সেকালের প্রাবন্ধিকদের চিত্তপট ভাস্বর ছিল। এক কথায়, তাঁদের সমস্ত ভাবনাকে তাঁরা জীবনের সঙ্গে সম্পর্কিত করতে চেয়েছেন নবভাবে জেগে-ওঠার আত্যন্তিক ভাবনায়।

কিন্তু, সেই মানসভঙ্গিটি বর্তমানে প্রায় অনুপস্থিত। সেটা ছিল সৃষ্টির যুগ, এটা অবক্ষয়ের; সেটা নির্মাণের, এটা আত্মক্ষয়ের; সেটা জাতীয়তাবাদের সমব্যথিত্বে সংবদ্ধ অগ্রগমনের কাল, এটা নৈরাজ্যের, সমাজহীনতার। ফলে, তখনকার প্রবন্ধরচয়িতাদের মধ্যে যে বৃহত্তর সামগ্রিক বোধ জাগ্রত ছিল, আজকের অধিকাংশ মননশীল রচনায় তার অনুরণন খুঁজে পাওয়া কঠিন। জীবনের প্রতি যে গভীর ভালবাসা বঙ্কিমচন্দ্রের প্রবন্ধে এনে দিয়েছে এক অপরূপ গাম্ভীর্য, হৃদয়াবেগ এবং গতির প্রাচুর্য, অথবা যে কল্যাণবোধ ও বর্ণাঢ্য জীবনের স্পৃহা অক্ষয়কুমার দত্তের রচনার প্রাণসম্পদ, অথবা আত্মপরিচয়ের যে আকৃতি ও ঐতিহ্যের স্মারকগুলো আবিষ্কারের উল্লাস রাজেন্দ্রলাল মিত্র ও হরপ্রসাদ শাস্ত্রীকে দিগ্‌বিদিক ছুটিয়েছে, তা আজ প্রত্যাশা করা বৃথা।

স্ব-ধর্মে ও স্ব-ঐতিহ্যে আশ্রিত থাকার আকাঙ্ক্ষা কীভাবে বহুসংখ্যক প্রবন্ধকারের হৃদয়মন অভিভূত করেছিল, তার দুটি উদাহরণ দিচ্ছি সাহিত্য-

সমালোচনার ক্ষেত্র থেকে। দেখা যাবে, এখানে সাহিত্য অথবা নান্দনিক তত্ত্ব অপেক্ষা অন্য এক চেতনা প্রাধান্য লাভ করেছে। প্রথমটি পূর্ণচন্দ্র বসুর রচনা থেকে :

"প্রকাশ্য রঙ্গভূমিতে এই স্ত্রীহত্যার অভিনয় প্রদর্শন করা হিন্দু ধর্মাদর্শের সম্পূর্ণ বিপরীত। রঙ্গভূমিতেই তদ্দ্বারা অনর্থ ঘটিবার সম্ভাবনা,……পাছে হত্যাদর্শনের পাপ লোকের কল্পনাকে মলিন করে, তাই আমাদের নাট্যকারগণ কোনখানে এরূপ হত্যা-ব্যাপার প্রদর্শন করেন নাই।…বাস্তবিক যাহা ইউরোপে tragedy বলিয়া বিখ্যাত, আমাদের দেশে দশরূপক মধ্যে তাহার স্থান হইতে পারে না। কারণ তাহা হিন্দু ধর্মাদর্শের বিপরীত হওয়াতে নাটকীয় নিয়ম ও আদর্শেরও বিপরীত হইয়াছে। সেই ট্রাজেডি এদেশে আসিয়া কি অনর্থই না ঘটিয়াছে।" [সাহিত্যে খুন]

দ্বিতীয়টি হীরেন্দ্রনাথ দত্তের রচনা থেকে :

"ভিন্ন ভিন্ন জীবাত্মাকে আধার করিয়া পুণ্য ও পাপশক্তির সমরকাহিনী কালিদাস কোথাও বিবৃত করেন নাই; কারণ সে বিবরণে পুণ্যশক্তির সহিত পাপশক্তির সাহচর্য অবশ্যম্ভাবী; পাপশক্তি অসুন্দর; সুন্দরের বর্ণনা আমরা কালিদাসে পাইব কেন? ইহার একটি ধ্রুব প্রমাণ দিতেছি। নরনারায়ণ রামচন্দ্রের অলৌকিক চরিত্রে অবশ্যই কালিদাস আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। এমন সুন্দর চরিত্র আর কোন দেশে আছে? শীতল জল জমিয়া যেরূপ শীতলতাঘন তুষার হয়, রামচরিত্র সেইরূপ অধ্যাত্মতা-ঘন, আধ্যাত্মিকতাময়। বন্যার পঙ্কিল জল যেমন নভঃস্পর্শী গিরিচূড়া স্পর্শ করিতে পারে না, জগতের পাপশক্তি সেইরূপ ঐ মহাপুরুষকে স্পর্শ করিতে পারে নাই। তাই এ সুন্দর চরিত্রের বর্ণনায় কালিদাস রঘুবংশের ছয় সর্গ নিয়োজিত করিয়াছেন।"

[কালিদাস ও সেক্সপীয়র]

বলা নিষ্প্রয়োজন যে, দুটি উদ্‌ধৃতিতেই জাতীয় আত্মম্ভরিতার ছাপ সুস্পষ্ট, সাহিত্যতত্ত্ব বা রসের নৈর্ব্যক্তিক, স্বীকৃতি ও বিচার প্রায় উপেক্ষিত। কালের আন্তর গরজ এমনি অতর্কিতভাবেই রসিক চিত্তে প্রভাব বিস্তার করে। আর, এও স্বীকার্য যে, উভয় ক্ষেত্রেই, এবং দ্বিতীয় উদ্‌ধৃতিটির গম্ভীর চলনভঙ্গি সত্ত্বেও, গদ্য অনায়াস শিল্পপ্রকৃতি অর্জন করেছে যা পূর্বকালে অনায়ত্ত ছিল।

॥ ৩ ॥

বর্তমান যুগকে অবক্ষয়ের যুগ বলে চিহ্নিত করার পরেও একথা স্বীকার করতেই হয় যে, বর্তমানকালের প্রবন্ধসাহিত্য মননশীলতায়, বোধের গভীরতর দীপ্তিতে, বাকসংযমে, জীবনের প্রবহমান চেতনায় ও ব্যাপকতর অধ্যয়নের ফলশ্রুতিতে বিগত শতকের প্রবন্ধের তুলনায় অনেক বেশি সমৃদ্ধ। গত আশি বা পঁচাশি বছরের মধ্যে প্রকাশিত কয়েকটি সাহিত্যবিষয়ক প্রবন্ধ থেকে কিছু নির্বাচিত অংশ উদ্ধার করা যাক; তুলনামূলকভাবে এগুলোর তত্ত্বগত এবং আঙ্গিক বা কাঠামোগত বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করলেই বাংলা প্রবন্ধসাহিত্যের বিবর্তন সুস্পষ্ট অনুধাবন করা যাবে।

বঙ্কিমচন্দ্রের সমালোচনা: "আমরা উত্তরচরিত নাটকের প্রকৃত সমালোচনা করি নাই। পাঠকের সহিত আনুপূর্বিক নাটক পাঠ করিয়া যেখানে যেখানে ভাল লাগিয়াছে, তাহাই দেখাইয়া দিয়াছি। গ্রন্থের প্রত্যেক অংশ পৃথক পৃথক করিয়া পাঠককে দেখাইয়াছি। এরূপ গ্রন্থের প্রকৃত দোষগুণের ব্যাখ্যা হয় না। এক একখানি প্রস্তর পৃথক পৃথক করিয়া দেখিলে তাজমহলের গৌরব বুঝিতে পারা যায় না। একটি একটি বৃক্ষ পৃথক করিয়া দেখিলে উদ্যানের শোভা অনুভূত করা যায় না। একটি একটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বর্ণনা করিয়া মনুষ্য-মূর্তির অনির্বচনীয় শোভা বর্ণনা করা যায় না। কোটি কলসজলের আলোচনায় সাগরমাহাত্ম্য অনুভূত করা যায় না। সেইরূপ কাব্যগ্রন্থের।" ইত্যাদি

পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের আলোচনা: "মূলতঃ বঙ্কিমচন্দ্র আদিরসের মহাকবি। তাঁহার সকল উপন্যাসেই আদিরসের নানা অবস্থাগত বিশ্লেষণ আছে। তিনি বাংলার ইংরেজি-নবীশ বা উদ্ধত নায়ক-নায়িকাই ভাল করিয়া আঁকিয়াছেন, মাতা পিতা ভ্রাতা বন্ধু সখা অন্য কোন ভাবের কথাই ভাল করিয়া ব্যাখ্যা করেন নাই। বিলাতের যে আদিরসের Romanticism বায়রন হইতে ব্রাউনিং পর্যন্ত ফুটিয়া উঠিয়াছিল, বঙ্কিমচন্দ্র তাহার মোহ এড়াইতে পারেন নাই। শেষের তিনখানি উপন্যাসে সমাজতত্ত্ব বিশ্লেষণ করিতে যাইয়াও তিনি আদিরসের হাত এড়াইতে পারেন নাই।"......ইত্যাদি

ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়ের কাব্যতত্ত্ব বিশ্লেষণ: "কাব্যশাস্ত্রের প্রকৃতি কল্পনা। কল্পনা অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডবিহারিণী। তাই কাব্যশক্তিও সৌন্দর্যশালিনী। অসীম গগনের শীতল স্বাধীন বায়ু সর্বদা সমভাবে না পাইলে কল্পনা জীবিত

থাকে না, কবিতারও মৃত্যু। অনন্তের মহামধ্যাহ্নে কল্পনার জন্ম, অসীমতা, উধাও আকাশ তাহার কর্মভূমি এবং ক্রীড়াঙ্গন। কবিতার আন্ত,, মধ্য ও অন্ত তিনই অসীমতার সহিত মিশ্রিত। মায়ের স্বাধীনতায় মেয়ের পুষ্টি, মায়ের খাতে মেয়ের খাত।" ইত্যাদি

বিষ্ণু দে-র মধুসূদন সম্পর্কে আলোচনা: "মাইকেল অতাক্তরকম উনিশ শতকী নবমধ্যবিত্ত বাঙালী যিনি ইওরোপের রেনেসান্স আর আমাদের মহারানীর যুগ প্রায় সমার্থক ভেবে বসেছিলেন। তাই তাঁর জীবন করুণ অপরিচ্ছন্নতায় অকালে শেষ হয়, কিন্তু কীর্তির দিক থেকে তিনি নব্যভারতীয় কবিদের মধ্যে অসংহত অথচ বিরাট পুরুষ, রূপক হিসাবে মহান। বড় কথা হচ্ছে ঐ কবিতা প্রাণ পেয়েছিল ইএটস্-কথিত সেই মহাজননীতে, যুগ-যুগান্তব্যাপী জাতীয় জীবনে ভাঙন সত্ত্বেও, সমগ্র দেশের মানুষের স্মৃতিমন্থনে……" ইত্যাদি

এই উদ্ধৃতি কয়টি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, বঙ্কিমচন্দ্র ও পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় সাহিত্যকে রসের সীমাবদ্ধ পরিধিতে, শেষের জন অতিশয় স্থূল পরিধিতে স্থাপন করে বিচার করেছেন। আমাদের কালের মানুষের নিকট মূল্যায়ন শব্দটির যে ব্যাপক ও সুগভীর তাৎপর্য ও ব্যঞ্জনা রয়েছে, তাঁদের রচনায় তা একান্তভাবেই অনুপস্থিত। কিন্তু, আধুনিক কালের বিষ্ণু দে বৃহত্তর জাতীয় জীবনের প্রেক্ষিতে ইতিহাসের বিবর্তনশীল সত্তার প্রশ্নটি জাগ্রত রেখে মধুসূদনের কবিমানস বিশ্লেষণ করেছেন, এবং তাঁর মূল্যায়নে প্রবৃত্ত হয়েছেন। ফলে তাঁর আলোচনা যেমন তত্ত্বগভীর, বিষয়নিষ্ঠ, তেমনি ইতিহাসচেতনায় দীপ্ত। জীবনের বৃহত্তর পটভূমির অভাব পূর্বসূরীদের রচনাকে যে গভীরতা দান করতে ব্যর্থ হয়েছে, তার অনায়াসস্বীকৃতি বিষ্ণুবাবুর আলোচনাকে সহজে সে গভীরতায় সমৃদ্ধ তো করেছেই উপরন্তু দিয়েছে এক গভীর অন্তর্দৃষ্টি যার পরিচয়ে হৃদয় প্রসন্ন হয়। তাছাড়া, বিষ্ণুবাবুর গদ্যরীতিও বিগত শতাব্দীর প্রাবন্ধিকদের বাচনভঙ্গি অপেক্ষা অধিকতর সুসংবদ্ধ, পরিমিত এবং গভীরতা-সন্ধানী। পূর্বগামীদের বিরুদ্ধে এ অভিযোগও উত্থাপিত হতে পারে যে, তাঁদের প্রবন্ধে উপযুক্ত মননশীলতার স্বাক্ষর অনুপস্থিত, কিন্তু বিষ্ণুবাবুর ক্ষেত্রে এ অভিযোগ সর্বাংশে অচল। আধুনিক কালের প্রবন্ধের প্রাগ্রসরতা যদি কোনো বিষয়ে পরিস্ফুট তো তা এখানে।

বস্তুত, আধুনিকযুগের সার্থক প্রাবন্ধিকদের রচনায় সেইসব বৈশিষ্ট্য

সহজেই লক্ষণীয় যা বিষ্ণু দে-র রচনার বৈশিষ্ট্য বলে এইমাত্র চিহ্নিত হয়েছে। নির্মীয়মান ইতিহাসের বোধ, জীবনের সামগ্রিক চেতনা, এবং ব্যাপক অধ্যয়ন—অনুশীলনের স্বীকৃতিতে এসব রচনা চিত্তহারী শিল্পপ্রকৃতি লাভ করে আত্মপ্রকাশ করে। এছাড়াও আরও দু-একটি গুণ মনোযোগী পাঠকের দৃষ্টিগোচর হবে। যেমন—বিষয়নিষ্ঠা। আধুনিক কালের প্রবন্ধাবলী সাধারণত ব্যক্তিগত অভিরুচিপ্রবণতা অথবা পছন্দ-অপছন্দের খামখেয়ালিপনা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নয়, এর মুখ্য উদ্দেশ্য নিরপেক্ষ বিষয়নিষ্ঠ বিশ্লেষণ, এবং এর ভিত্তিভূমি যুক্তির পারম্পর্য। সমালোচনার ক্ষেত্রে বিশুদ্ধ রসবাদী যে সমালোচনা আমরা পূর্বসূরীদের মধ্যে লক্ষ্য করি, সে ধারা আজ বিশুষ্কপ্রায়। এখানেও রসবস্তুর হেতু বা স্রষ্টা যেমন, তাকে ইতিহাস ও জীবন সম্পর্কের সমগ্রতায় আবিষ্কার এবং আলোচনায় বিধৃত করার চেষ্টা প্রবল। আর, সাধারণভাবে একথাও বলা যেতে পারে, যেসব লক্ষণগুলোকে আমরা সাম্প্রদায়িক অথবা গ্রাম্যতা-দোষযুক্ত অথবা মানসিক অন্ধতাপ্রসূত বলে অভিহিত করে থাকি, এ কালের প্রবন্ধ সে সবের সীমাকে অতিক্রম করে চলেছে। পূর্বে বঙ্কিমচন্দ্রের যে উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছে সেখানে একটি মূল্যবান মন্তব্য করা হয়েছে—অরণ্যের সৌন্দর্যোপভোগে তার সমগ্র চিত্রটি দৃষ্টিপথে প্রসারিত রাখা প্রয়োজন। এই উক্তির অনুসরণে বলা যায়, একটি স্বমহিমায় স্থিত পুষ্পের সৌন্দর্য উপভোগের সময়ও পুষ্পটিকে তার অরণ্য-সম্পর্কের সমগ্রতায় উপলব্ধি করা প্রয়োজন। রসিকের হৃদয়-সংবেদনা সেই সমগ্রের উপলব্ধিতে সর্বপ্রধান হাতিয়ার। যে কোনো বস্তু অথবা বিষয়কে তার জীবন সম্পর্কের সমগ্রতায় উপলব্ধি করাই প্রকৃত পরিপ্রেক্ষিত। আলোচনার বিষয়বস্তু যাই হোক না কেন—সাহিত্যসমালোচনা, অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক জিজ্ঞাসা, সাংস্কৃতিক সমস্যা অথবা মানবিক অধিকারের সমস্যা, যে বিষয়কে কেন্দ্র করেই প্রবন্ধ রচিত হোক না কেন, সর্বক্ষেত্রে না হলেও, মোটামুটিভাবে সেই সমস্যাকে জীবনসম্পর্কের সামগ্রিকতায় বিশ্লেষণ করার বৃহত্তর ও যথার্থ প্রেক্ষিত আধুনিক প্রবন্ধ অর্জন করেছে। তুলনামূলকভাবে এই গৌরব তার প্রাপ্য।

॥ ৪ ॥

প্রবন্ধের আঙ্গিক অথবা শিল্প-কাঠামোর বিষয়েও যে আধুনিককালের প্রবন্ধ সার্থকভাবে জমি কর্ষণ করছে তা উল্লেখের অপেক্ষা রাখে না। মননশীল প্রবন্ধের

বৈশিষ্ট্য কী অথবা কী হওয়া উচিত, সে বিষয়ে মতভিন্নতার অবকাশ বিদ্যমান। মনতেন, যিনি প্রবন্ধসাহিত্যের আদিপিতা, তাঁর রচনায় বাচালতার একটি হালকা আবরণ সৃষ্টি করেছিলেন; কিন্তু আসলে তাঁর উদ্দেশ্য ছিল গুরুগম্ভীর। আর, তাঁর প্রবন্ধে নানান ধরনের উদ্ধৃতি, প্রবচন, ঐতিহাসিক ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত, স্বপ্ন-কল্পনার বিহার ইত্যাদি এমনভাবে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকত যে আপাতদৃষ্টিতে শিল্পকাঠামোয় কোনো শৃঙ্খলা ধরা পড়ত না। অন্যদিকে, বেকনের প্রবন্ধের স্বাদ ও প্রকৃতি সম্পূর্ণ ভিন্ন। প্রবন্ধের শিল্পশরীর নির্মাণে শৃঙ্খলা যেমন অপরিসীম, এর আবেদনও প্রত্যক্ষ। পাঠকের মন ও চোখ যাতে অকারণ পল্লবিত বিহারে অন্যপথগামী না হয়, সেজন্য বেকন তাঁর বক্তব্য ও যুক্তিপরম্পরার উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখেন আর গদ্যরীতিকে ভূষণের বাহুল্যে দ্বিধাগ্রস্ত করেন না। তাঁর প্রবন্ধেরও লক্ষ্য ছিল, পাঠকের কর্মে ও হৃদয়ে স্থিত হওয়া। পরবর্তীকালে স্টীল ও এডিসন প্রবন্ধকারের ভূমিকাকে যুগবৈশিষ্ট্যের ভাষ্যকাররূপে চিহ্নিত করেছেন, এবং তদ্দ্বারা একটি মননশীল প্রবন্ধের যে বৈশিষ্ট্য পরিস্ফুট তা হল, বিষয়বস্তুর একনিষ্ঠতা ও একাগ্রতা, আর ঐ একাগ্রতাকে একটি সুঠাম, বাকসংযমে নির্মিত কাঠামোয় উপস্থাপন।

এই তত্ত্বের নিরিখে বাংলা প্রবন্ধের বিবর্তন লক্ষ্য করা যাক। রামমোহনের গদ্যরচনাকে এ আলোচনার অঙ্গীভূত করা সংগত নয়। কারণ, শাস্ত্রীয় প্রশ্নের মীমাংসার জন্য তিনি দীর্ঘায়তন নিবন্ধ রচনা করেছিলেন; পাঠকের বোধ ও উপলব্ধিকে উন্নীত পরিশীলিত করা তাঁর অন্যতম উদ্দেশ্য হলেও শিল্পকাঠামোর প্রশ্নটি তাঁর বিবেচনার অন্তর্ভুক্ত ছিল না; সম্ভবত, এ ব্যাপারে তাঁর সচেতন হওয়ার কোনো প্রয়োজনও ছিল না। অক্ষয়কুমার দত্তের হাতে প্রবন্ধ শিল্পরূপ লাভ করে সত্য, কিন্তু আঙ্গিকের বিচারে তার নির্দোষিতা বোধ করি দাবি করা যায় না। নিঃসন্দেহ যে, তাঁর নিবন্ধে বিষয়বস্তুর একাগ্রতা এবং যুক্তি-ধারার পারম্পর্য স্বীকৃত, কিন্তু তথাপি তাঁর 'পল্লীগ্রামস্থ প্রজাদিগের দুরবস্থা' বিষয়ক প্রবন্ধগুলো এবং বিধবাবিবাহ সম্পর্কিত আলোচনাগুলো স্থানে স্থানে বেশ পল্লবিত হয়ে উঠেছে; যুক্তিপরম্পরা ছাপিয়ে বিবৃতি প্রধান হয়ে উঠেছে। সেজন্য, শিল্পকাঠামোর সামগ্রিকরূপের সঙ্গে অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সম্পর্কটা সুসংহত বা সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়নি।

আমার ধারণা, উনবিংশ শতাব্দীর প্রায় সমস্ত প্রবন্ধ, রবীন্দ্রনাথ-রচিত প্রবন্ধাদিসহ, সম্পর্কেই ঐ মন্তব্য প্রযোজ্য। উপরে যে কয়টি প্রবন্ধ থেকে

উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছে, বঙ্কিমচন্দ্রের 'উত্তরচরিত', পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বঙ্কিমচন্দ্রের ত্রয়ী', হীরেন্দ্রনাথ দত্তের 'কালিদাস ও সেক্সপীয়র' অথবা পূর্ণচন্দ্র বসুর 'সাহিত্যে খুন' ইত্যাদি যে কোনো একটি বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, বিষয়ের একনিষ্ঠতা ক্ষুণ্ণ করে, যুক্তির পারম্পর্যকে শিথিল করে বিবৃতির আশ্রয় নেওয়া হয়েছে; এমন কি, কোনো ক্ষেত্রে, যেমন পূর্ণচন্দ্র বসুর প্রবন্ধে, ব্যক্তিগত অভিরুচির ও মানস-প্রতিক্রিয়ার প্রক্ষেপে বক্তব্যকে রঞ্জিত করা হয়েছে। তাতে যুক্তিবাদী নিস্পৃহ নিরপেক্ষতার যেমন অভাব ঘটেছে, তেমনি কাঠামোর সামগ্রিক ঐক্যও বিনষ্ট হয়েছে। অথচ, তাঁদের প্রায় সকলের গদ্যই একটা অনায়াস শিল্পস্বভাব অর্জন করেছে।

কিন্তু আধুনিককালের কোনো সার্থক প্রাবন্ধিকের রচনাই দেহসৌষ্ঠবের বিচারে ত্রুটিপূর্ণ নয়। উপরে বিষ্ণু দে-র 'মাইকেল ও আমাদের রেনেসান্স' শীর্ষক যে নিবন্ধটি থেকে উদ্ধৃতি দেওয়া, তার কথাই ধরা যাক, অথবা সুধীন্দ্রনাথ দত্ত বা আবু সয়ীদ আইয়ুবের যে কোনো প্রবন্ধই বিশ্লেষণ করা যাক, দেখা যাবে প্রবন্ধের বিষয়বস্তুর একাগ্রতা যেমন সযত্নে রক্ষিত, তেমনি যুক্তির পারম্পর্যও একটি সুশৃঙ্খল ধারায় প্রবাহিত হয়ে একটি বিন্দুতে অনিবার্য পরিণতি লাভ করে। সেজন্য প্রবন্ধ একটি দৃঢ়সংবদ্ধ শিল্পরূপ ও ঐশ্বর্যে মণ্ডিত হয়। শিল্পকাঠামো সম্পর্কে এই সংযম ও শৃঙ্খলাবোধ পূর্বসূরীদের অনায়ত্ত ছিল। এটা নিঃসন্দেহে অগ্রচারিতার লক্ষণ।

যে কোনো বিষয়কে জীবনের বৃহত্তর সম্পর্কের সমগ্রতায় উপলব্ধি করা, উপলব্ধ সত্যকে পুনরায় জীবনপ্রাঙ্গণে প্রতিষ্ঠা করার আগ্রহ, এবং শিল্পের দায়িত্বে আত্মসংযমের অভ্যাস, এসব বৈশিষ্ট্যের জন্যই বলা যায়, বাংলা প্রবন্ধ-সাহিত্য এখন বয়ঃপ্রাপ্ত এবং সমৃদ্ধ।

গ্রন্থপঞ্জী

অনুবাদ-সাহিত্য : একটি সমীক্ষার খসড়া

"দূরের সঙ্গে নিকটের, অনুপস্থিতের সঙ্গে উপস্থিতের সম্বন্ধপথটা সমস্ত দেশের মধ্যে অবাধে বিস্তীর্ণ হইলে তবেই তো দেশের অনুভবশক্তিটা ব্যাপ্ত হইয়া উঠিবে। মনের চলাচল যতখানি, মানুষ ততখানি বড়ো।"[১]—লিখেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। মন-চলাচলের জন্য যে সামাজিক মনোভূমির কর্ষণ প্রয়োজন, তার সূত্রপাত হয়েছিল ভারতবর্ষে ইউরোপীয়দের আগমনের ফলে বাহির বিশ্বের সঙ্গে সংযোগ স্থাপনের মধ্য দিয়ে। বিশেষতঃ, এদেশে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের পত্তন ও বিস্তারের পথেই ভারতীয় সমাজ-সংস্কৃতির রূপান্তর, এবং গুণগত দিক থেকে সম্পূর্ণ অভিনব এক সংস্কৃতির আবির্ভাব ঘটেছিল। যেসব কারণে সমাজ-মানস গতিশীলতা অর্জন করেছিল, রাষ্ট্রনৈতিক ও আর্থনীতিক সম্পর্কের রূপান্তর ছাড়াও, তাদের অন্যতম ছিল ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্য। শাসকগোষ্ঠীর পক্ষ থেকে সাম্রাজ্যিক প্রয়োজন, ও পরাভূত জাতির পক্ষ থেকে শাসনযন্ত্রের সঙ্গে অন্বিত থাকার প্রয়োজন,—এই উভয়বিধ গরজেই ভাষা ও সাহিত্যগত আদানপ্রদানের বাতাবরণ সৃষ্টি হয়েছিল। একটি রাষ্ট্র জয়ের উল্লাস ও ঔদ্ধত্যের মধ্যেও ঐ সাম্রাজ্যের অন্যতম প্রধান স্তম্ভ ওয়ারেন হেস্টিংসকে বিলাতের কোর্ট অব ডিরেক্টরদের নিকট লিখতে দেখি : সর্বপ্রকার জ্ঞানসঞ্চয়, বিশেষ করে যুদ্ধজয়ের অধিকার বলে যাদের উপর আমরা আধিপত্যের কর্তৃত্ব করে থাকি, তাদের সঙ্গে সামাজিক আদানপ্রদানের মাধ্যমে লব্ধ জ্ঞান রাষ্ট্রের নিকট আশু প্রয়োজনীয়; সমগ্র মানবজাতিরই এতে লাভ; আর আমি যে বিশেষ দৃষ্টান্তের উল্লেখ করেছি, সেক্ষেত্রে তা অনুপস্থিত অনুরাগকে আকর্ষণ ও বশীভূত করে; যে পরবশ্যতার শৃঙ্খলে আমরা এ-দেশীয়দের শাসন করি, সে ভার তা লাঘব করবে; আর আমাদের স্বদেশীয়দের মনে মহানুভবতার বোধ ও দায়িত্ব উদ্বুদ্ধ করবে।[২]

সাম্রাজ্যিক প্রয়োজন মহানুভবতার ভাষাকে আশ্রয় করে ব্যক্ত হয়েছে সত্য কিন্তু এর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ফলশ্রুতিকে বোধ করি কোনভাবেই অস্বীকার করা যায় না। ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্যের সংস্পর্শে বুদ্ধিগত বিচারে আমাদের জন্মান্তর ঘটেছিল; অনুভবে, উপলব্ধিতে, ভাবাদর্শের অনুশীলনে, এবং সাহিত্যকর্মে আমরা বিস্তৃততর, সমৃদ্ধতর, এবং সংবেদনায় অধিকতর মানবিক

হতে শিখেছিলাম। আর, রবীন্দ্রনাথ যে দেশের অনুভবশক্তিকে ব্যাপ্ত করার কথা বলেছিলেন, নানাভাবে তার সূত্রপাত হয়ে থাকলেও এর অন্যতম বাহন ছিল অচেনা ভাষা থেকে রক্তে-চেনা ভাষায় ভাষান্তর বা অনুবাদ। অনুবাদকে যদি আমরা শুধুই প্রতিধ্বনি বলে গণ্য করি এবং যদি একথাও অনায়াসেই মেনে নিই যে, ধ্বনির সঙ্গে প্রতিধ্বনির যে পার্থক্য তা অনুবাদে থেকেই যাচ্ছে, তাহলেও কত বিচিত্রভাবে যে অনুবাদ আমাদের মনের ক্ষেত্রকে অভিষিক্ত করে তার ইয়ত্তা নেই। বিশেষ করে নতুন সাম্রাজ্য পত্তনের প্রাথমিক পর্যায়ে, এবং দুটি সম্পূর্ণ ভিন্নাদর্শী সমাজ-সংস্কৃতির সংঘাতের লগ্নে।

যে পরিবেশে বাংলা অনুবাদগ্রন্থের ঐতিহাসিক আবির্ভাব, তাতে দুটি সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য সম্মুখে রেখেই এর বিকাশ ঘটেছিল বলে সিদ্ধান্ত করা অযৌক্তিক নয়: ১ উপস্থিত বা প্রত্যক্ষ প্রয়োজনসিদ্ধি, এবং ২ বিভিন্ন সাহিত্যের সৃষ্টিশীল মানসবৈশিষ্ট্যের সঙ্গে পরিচয় সংঘটন, ও সেই পথে বোধ-বুদ্ধি-মনন-কল্পনার বিস্তারে সহায়তা। প্রথমোক্ত পর্যায়ে অবশ্যম্ভাবীরূপেই আসে রাষ্ট্র-শাসনের পক্ষে অপরিহার্য আইনকানুন, রীতিনীতি, নির্দেশনামা ইত্যাদির অনুবাদ। সম্ভবতঃ, ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে অনূদিত গ্রন্থগুলোকেও আমরা এই শ্রেণীভুক্ত করতে পারি; কেন না, ধর্মান্তরের উপস্থিত গরজেই তা আত্মপ্রকাশ করেছিল। আর দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়ে কাব্যকাহিনী-উপাখ্যান জাতীয় রসসমৃদ্ধ ও ইতিহাস-দর্শন-বিজ্ঞান ইত্যাদি মননসর্বস্ব সাহিত্যের অনুবাদ, যা পাঠককে বৃহৎ মনের সংস্পর্শে আনে, তার হৃদয়ে আনে অভূতপূর্ব রসাস্বাদনের আনন্দ আর চিন্তামননে ঘটায় রূপান্তর। উনবিংশ শতকের প্রথম দশক থেকেই এই জাতীয় গ্রন্থ বিপুল সংখ্যায় প্রকাশিত হতে থাকে, এবং বাংলা সাহিত্যের ভাণ্ডার পূর্ণ থেকে পূর্ণতর হয়।

প্রসঙ্গতঃ অনুবাদের সমাজতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যটুকু স্মরণীয়। বিভিন্ন ইউরোপীয় এবং ভারতীয় ভাষা থেকে ভাষান্তরিত হয়ে বাংলায় যে গ্রন্থাদি প্রকাশিত হচ্ছিল তা থেকে এটা নিশ্চিত প্রতীয়মান হয় যে, তৎকালে শিক্ষিতের সংখ্যা অথবা হার যাই থাক না কেন, বাংলার সমাজমানস তার আত্মনিমগ্ন তন্ময়তা থেকে মুক্তি লাভ করছে; অনুবাদ তাকে ভৌগোলিক দূরত্ব জয় করে বিশ্বমানসের সঙ্গে সংযুক্ত হওয়ার অবকাশ এনে দিচ্ছে, তার বিচরণক্ষেত্র হচ্ছে সুদূরপ্রসারী। অনুবাদ সম্পর্কে এটাই বোধ করি চরম কথা, যে দূরবস্থিত পৃথিবীকে তা মনের অভ্যন্তরের নিকট সম্পর্কে বাঁধে, মানব-অভিজ্ঞতার বৈচিত্র্য দিয়ে হৃদয়কে

প্রসারতর করে, এবং অনুচ্চারিত এ তত্ত্বটুকু সে বলে যায় যে, মানব-বিশ্ব এক এবং অবিভাজ্য। সভ্যতার বিকাশে ও মানবিক সম্পর্কের বিচারে এই তার নিশ্চিত অবদান। কোন দেশ যতদিন আপন সীমার মধ্যে অবরুদ্ধ থাকে এবং সে জন্য সমাজমানসের বিচরণভূমি হয় সংকীর্ণ, ততদিন সে দেশে অনুবাদ-সাহিত্যের কোন অস্তিত্ব প্রত্যক্ষ করা যায় না। যেমন প্রাচীন গ্রীস অথবা ভারত। বিভিন্ন দেশের সঙ্গে স্থায়ী সংযোগের পথেই সাংস্কৃতিক যোগবিয়োগ অতএব অনুবাদের আবির্ভাব।

বাংলা অনুবাদ-সাহিত্যের আদি পর্ব থেকে আধুনিক কাল পর্যন্ত বৈচিত্র্যময় ইতিহাসের একটি সংক্ষিপ্ত কাঠামো বর্তমান প্রবন্ধে উপস্থাপিত করা হল। স্বভাবতঃই, পূর্ণতার দাবি এর নেই; এমন কি, বিশিষ্ট অনুবাদক ও অনূদিত গ্রন্থ অনুল্লেখিত থাকাও বিচিত্র নয়। লেখকের সবিনয় নিবেদন, তেমন কিছু ঘটে থাকলে তার কারণ শুধুই অনবধানতা।

॥ ২ ॥

গদ্য-সাহিত্যের বিবর্তনে যেমন, অনুবাদেও ইংরেজ লেখকবৃন্দ অগ্রচারীর ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। পূর্বেই উল্লেখিত হয়েছে, এর প্রত্যক্ষ অনুপ্রেরণা ছিল রাষ্ট্রশাসনের উপস্থিত গরজ। তাই, বাংলা হরফে মুদ্রিত প্রথম বাংলা অনুবাদ-গ্রন্থটিও একটি সরকারী আইনের বিশদ অনুবাদ, যা 'ইম্পে কোড' নামে পরিচিত। পাঁচ-ছয়টি ভারতীয় ভাষায় পারদর্শী জোনাথান ডানকান, পরবর্তীকালে বোম্বাই-এর গভর্নর, এটি অনুবাদ করেন। বাংলায় গ্রন্থটির পরিচিতি ছিল এইরূপ : 'মপস্বল দেওয়ানি আদালত সকলের ও সদর দেওয়ানি আদালতের বিচার ও ইনসাফ চলন হইবার কারণ ধারা ও নিয়ম।" সরকারী ছাপাখানায় মুদ্রিত, প্রকাশকাল ১৭৮৫।[৩] দ্বিতীয় ও তৃতীয় গ্রন্থ দুটিও সরকারী আইনের অনুবাদ, অনুবাদক এন. বি. এডমনস্টোন; প্রথমোক্তটি বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার ফৌজদারী আদালতে কার্যকর ১৭৯০ খ্রীষ্টাব্দে গৃহীত ফৌজদারী আইনের ভাষান্তর, প্রকাশকাল ১৭৯১। আর, পরেরটি ১৭৯২ খ্রীষ্টাব্দে রাজস্ব বিভাগের বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য প্রচারিত জেলাশাসকদের প্রতি নির্দেশাবলী। প্রকাশকাল ১৭৯২।[৪] এর পরের গ্রন্থটিও একটি আকর আইন গ্রন্থের অনুবাদ, নাম 'কর্নওয়ালিশ কোড'; অনুবাদক এইচ. পি.

ফরস্টার, যিনি ছিলেন কোম্পানীর অধীনস্থ একজন ব্যবসায়ী, কিন্তু যিনি বাংলা-ইংরেজী, ইংরেজী-বাংলা অভিধান সংকলন করে যশস্বী হয়েছিলেন। আলোচ্য আইনগ্রন্থটির আখ্যাপত্রে লিখিত হয়েছিল: "শ্রীযুক্ত নবাব গবর্নর জেনারেল বাহাদুরের হজুর কৌন্‌সেলের ১৭৯৩ সালের তাবৎ আইন। তাহা নবাব গবর্নর জেনারেল বাহাদুরের হজুর কৌন্‌সেলের আজ্ঞাতে মুদ্রাঙ্কিত হইল। ১৭৯৩।" এই গ্রন্থটি ছিল একটি দ্বিভাষিক গ্রন্থ, বাঁ দিকের পৃষ্ঠায় বাংলা ও ডানদিকের পৃষ্ঠায় ইংরেজী ধারাগুলো মুদ্রিত হয়েছিল।

এর পরেই আমরা প্রবেশ করি কেরী যুগে, এবং গদ্যসাহিত্যের তীর্থস্থান শ্রীরামপুরে। শ্রীরামপুরে আমরা যে কর্মোদ্যোগ প্রত্যক্ষ করি, তা যেমন বিস্ময়কর তেমনি চিত্তাকর্ষক; কিন্তু এ সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা এ নিবন্ধের উদ্দেশ্য নয়। প্রতিনিধিস্থানীয় দু' চার জনের নিরলস প্রচেষ্টার উল্লেখ করেই আমরা প্রসঙ্গান্তরে যাত্রা করব। প্রথমেই উচ্চারণ করতে হয় সেই বিচিত্র মনীষার অধিকারী উইলিয়াম কেরীর কথা। ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশে এসেই তিনি বাংলা ভাষার কমনীয়তা ও মনোহারিত্বে আকৃষ্ট হন, এবং অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি তা শুধু আয়ত্তই করেননি, ১৭৯৮ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে কয়েকটি পর্ব বাদে সমগ্র বাইবেল গ্রন্থটি অনুবাদও করে ফেলেন। দশ হাজার সংখ্যক বই ছাপানোর বিপুল ব্যয়ভার সম্বন্ধে বিচলিত থাকলেও শেষ পর্যন্ত এক বন্ধুর কাছ থেকে কাঠে-তৈরি একটি মুদ্রাযন্ত্র উপহার পেয়ে কেরী উৎসাহিত হন। মুদ্রাযন্ত্রটি প্রথম নিয়ে যাওয়া হয় মদনাবাটীতে, সেখান থেকে পাকাপাকিভাবে কেরী সব নিয়ে চলে আসেন শ্রীরামপুরে। এখানে সহকর্মীদের সহায়তায় ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর নিউ টেস্টামেন্টের অনুবাদ প্রকাশিত হয়; ওল্ড টেস্টামেন্টের অনুবাদ প্রকাশিত হয় ১৮০২ থেকে ১৮০৯-এর মধ্যে। কেরীর আগে জন টমাস অংশতঃ বাইবেল অনুবাদ করেছিলেন ১৭৯১ খ্রীষ্টাব্দে, এবং জন এফ. এলারটনও নিউ টেস্টামেন্ট অনুবাদ করেছিলেন; কিন্তু টমাস কেরীর কাছ থেকে অনুবাদকর্মে প্রভূত সাহায্য পেয়েছিলেন, এবং এলারটনের গ্রন্থ ১৮১৯-এর পূর্বে মুদ্রিত হয়নি বলে ডঃ দে উল্লেখ করেছেন।[৫] সে বিচারে কেরীর ভূমিকাই অগ্রচারীর। তাঁর অনুবাদের নমুনা: "প্রথমে ঈশ্বর সৃজন করিলেন স্বর্গ ও পৃথিবী। পৃথিবী শূন্য ও অস্থিরাকার হইল এবং গভীরের উপরে অন্ধকার ও ঈশ্বরের আত্মা দোলায়মান হইলেন জলের উপর। পরে ঈশ্বর বলিলেন দীপ্তি হউক তাহাতে দীপ্তি হইল তখন ঈশ্বর সে দীপ্তি বিলক্ষণ দেখিলেন। তৎপরে ঈশ্বর দীপ্তি অন্ধকার

বিভিন্ন করিলেন। ঈশ্বর ও দীপ্তির নাম রাখিলেন দিবস ও অন্ধকারের নাম রাত্রি। সন্ধ্যা ও প্রাতকাল হইলে হইল প্রথম দিবস।"

তাঁর পুত্র ফেলিক্স কেরীর দানও এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। বাংলায় এনসাইক্লো-পিডিয়া ব্রিটানিকার মত একটি কোষগ্রন্থ রচনার দুঃসাহসিক পরিকল্পনা ছিল তাঁর, এবং ঐ পরিকল্পনাকে বাস্তবায়িত করার জন্য তিনি পূর্বোক্ত এনসাই-ক্লোপিডিয়ার অংশবিশেষ (ব্যবচ্ছেদবিদ্যা) অনুবাদ আরম্ভ করেন। বাংলা গদ্যের সেই অসহায় শৈশবাবস্থায় তিনি দু' একজন সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত ও পিতার সহায়তায় বিজ্ঞান ও চিকিৎসাবিদ্যার দুরূহ ভাবার্থবাহী পরিভাষা সৃষ্টি করে ঐ কাজ সম্পন্ন করেন। ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দের অকটোবর থেকে আরম্ভ করে প্রতি মাসে এক খণ্ড করে মোট চৌদ্দ মাসে ঐ অনুবাদ 'বিদ্যাহারাবলী' নামে প্রথম খণ্ড সমাপ্ত ও প্রকাশিত হয়। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৬৩৮। প্রথম খণ্ডের আখ্যাপত্র ছিল এইরূপ : ব্যবচ্ছেদবিদ্যা। / ফিলিক্স কেরিকর্ত্তৃক / পঞ্চমবারছাপাকৃত এনসাক্লো-পেদিয়াব্রিটানিকাম-গ্রন্থাবলী হইতে বাংলাভাষায় কৃত / পরিষ্ঠ উইলিয়াম কেরিকর্ত্তৃক তর্জ্জমাবিবেচিত / শ্রীকান্তবিদ্যালঙ্কারকর্ত্তৃক ভাষাবিবেচিত এবং শ্রীকবিচন্দ্র / তর্কশিরোমণিকর্ত্তৃক সাহায্যীকৃত। / শ্রীরামপুরে মিশিয়ন্ ছাপাখানাতে ছাপা কৃত। / সন ১৮২০।"[৩] তাঁর ওপর উল্লেখনীয় অনুবাদগ্রন্থ হল বানিয়ানের 'পিলগ্রিমস্ প্রগ্রেসের' বাংলা অনুবাদ। এটি 'যাত্রীরদের অগ্রেসরণ বিবরণ' নামে দুই খণ্ডে ১৮২১ ও ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়েছিল। এ ছাড়া তিনি ক্যালকাটা স্কুল বুক সোসাইটির হয়ে অন্য দুটি গ্রন্থও ভাষান্তর করেছিলেন; একটি গোল্ডস্মিথের 'হিস্ট্রি অব ইংল্যাণ্ড', এবং অন্যটি মিলের 'হিস্ট্রি অব বৃটিশ ইণ্ডিয়া'। বিচিত্র চরিত্র ফেলিক্সের নিকট বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ঋণ স্বীকার্য এ কারণেই যে, বাংলায় বিজ্ঞানগ্রন্থ রচনায় তিনিই পথিকৃৎ।

জশুয়া মার্শম্যানের পুত্র এবং পরবর্তীকালে 'সমাচার দর্পণ' 'ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া', 'গবর্নমেন্ট গেজেট' ইত্যাদি পত্রিকার সম্পাদক জন ক্লার্ক মার্শম্যানও তাঁর দিগন্তবিস্তারী কাজকর্মের অনবসরের মধ্যে অনুবাদে ও গদ্যরচনায় কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখে গেছেন। তাঁর বাংলা তর্জমার মধ্যে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য হল দুখণ্ড 'ক্ষেত্রবাগান বিবরণ', প্রকাশকাল ১৮৩১ ও ১৮৩৬। ব্রেজাঃ বাং-এর মতে রয়েল এগ্রি-হর্টিকালচারাল সোসাইটি দু'হাজার টাকার বিনিময়ে মার্শম্যানকে দিয়ে এই অনুবাদগ্রন্থটি প্রস্তুত করান। এই পুথিটির বিষয়বস্তু ভারতের বিভিন্ন

রাজ্যে উৎপাদিত কৃষিপণ্য সম্পর্কিত তথ্য ও নির্দেশনামা। দ্বিতীয় উল্লেখ্য গ্রন্থ জ্যোতির্বিদ্যা ও ভূগোল বিষয়ক একটি গ্রন্থের অনুবাদ, 'জ্যোতিষ ও গোলাধ্যায়'। (এস্ট্রোনমির বাংলা তর্জমায় জ্যোতিষ লেখাটা নিশ্চয়ই ঠিক হয়নি)। তাছাড়া, তিনি মিলের ভারতবর্ষের ইতিহাস, 'সদ্গুণ ও বীর্য্যের ইতিহাস', সরকারী আইন সংকলন, ইত্যাদি কয়েকটি অনুবাদগ্রন্থ রচনা করেন।

উইলিয়াম ইয়েটসও কয়েকটি গ্রন্থের অনুবাদক। তন্মধ্যে জেমস ফার্গুসন-কৃত 'অ্যান ইজি ইনট্রোডাকশন টু এস্ট্রোনমি' (ডেভিড ব্রুস্টার কর্তৃক পরিমার্জিত) গ্রন্থটির বঙ্গানুবাদ সুখ্যাতি অর্জন করেছিল।[৭] অন্যান্য গ্রন্থের মধ্যে আছে ইতিহাসপ্রসিদ্ধ জীবনচরিত গ্রন্থের অনুবাদ। প্রসঙ্গতঃ, শ্রীরামপুরের মিশনারিদের মধ্যে রেঃ জন ম্যাকের নাম শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়। কারণ, তিনি রসায়নবিদ্যার একটি পুথি বাংলায় তর্জমা করেন। নাম—'কিমিয়া বিদ্যার সার। শ্রীযুত জন মাক সাহেবের কর্তৃক রচিত হইয়া গৌড়ীয় ভাষায় অনুবাদিত হইল।' প্রকাশকাল ১৮৩৪। ম্যাকের গদ্যের নিদর্শন: "অনেক প্রকার বস্তুর কিমিয়ালয় উৎপন্ন হইলে আলোক নির্গত হয়। অতএব যে সময়ে দহন হয় সে সময় সকলেই জানে যে আলোক নির্গত হয় কিন্তু যে বস্তুতে কখন দহনোৎপত্তি হয় না সে বস্তুর লয়েতেও আলোক নির্গত হয়।"

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজকে কেন্দ্র করেও বাংলা গদ্যের এবং স্বভাবতঃই অনুবাদের চর্চা চলে। লং ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে বাংলা পুথির যে তালিকা প্রস্তুত করেছিলেন তাতে দেখা যাচ্ছে, জে. সার্জেণ্ট নামে কলেজের জনৈক ছাত্র ভার্জিলের 'ঈনিড' অনুবাদ করেন, মর্টন করেন সেক্সপীয়রের 'টেম্পেস্ট'। গোলকনাথ শর্মা অনূদিত 'হিতোপদেশ' প্রকাশিত হয় ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দে। মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের 'বত্রিশ সিংহাসন' পরের বৎসর। ১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয় তারিণীচরণ মিত্র অনূদিত 'ঈসপের গল্প'; এই গ্রন্থটি জে. গিলক্রিস্টের নির্দেশনা ও তত্ত্বাবধানে রচিত ও রোমান হরফে ছাপা হয়। সুশীলকুমার দে তারিণীচরণের অনুবাদ এবং তাঁর সহজ সাবলীল গদ্যভঙ্গির প্রশংসা করেছেন, এবং মন্তব্য করেছেন যে যদি তিনি মৌলিক রচনায় আত্মনিয়োগ করতেন, তাহলে সম্ভবতঃ তাঁর সমকালীন বাংলা লেখকদের চেয়ে অধিকতর শিল্পনৈপুণ্যের পরিচয় দিতেন।[৮] তাঁর গদ্যরীতির স্বাক্ষর: খেঁকশিয়ালী "কহিলেক, হে প্রিয় কাক, আজি সকালে তোমাকে দেখিয়া আমি বড় সন্তুষ্ট হইয়াছি; তোমার সুন্দর মূর্ত্তি আর উজ্জ্বল পালক আমার চক্ষের জ্যোতি, যদি নম্রতাক্রমে তুমি অনুগ্রহ করিয়া

আমাকে একটি গান শুনাইতে তবে নিঃসন্দেহ জানিতাম যে তোমার স্বর তোমার আর আর গুণের সমান বটে।"

ফারসী থেকে অনূদিত চণ্ডীচরণ মুনশির 'তোতা ইতিহাস' প্রকাশিত হয় ১৮০৫-এ, আর রামকিশোর তর্কালঙ্কার ও মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার উভয়ের পৃথক-ভাবে অনূদিত 'হিতোপদেশ' প্রকাশিত হয় ১৮০৮ সনে। সংস্কৃত থেকে অনূদিত হরপ্রসাদ রায়ের 'পুরুষ পরীক্ষা' প্রকাশিত হয় ১৮১৫-এ। লং-এর তালিকায় দেখা যায়, শ্রীরামপুর কলেজের দু'জন ছাত্র বেচারাম রায় ও বিশ্বম্ভর দত্ত মিলটনের 'প্যারাডাইস লস্ট' কাব্যগ্রন্থের প্রথম সর্গ অনুবাদ করেছিলেন, যদিও রচনার তারিখের উল্লেখ নেই। আরও জানা যায়, গিরিশচন্দ্র বসু দুঃসাহসিক আত্মবিশ্বাসে হোমারের 'ইলিয়াডে'র প্রথম পর্ব অনুবাদ করে প্রকাশ করেছিলেন ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দে। কেরী যুগের কয়েকটি সুখ্যাত এবং দু'চারটি দুঃসাহসিক তর্জমার উল্লেখ করা হল। এতে দেখা যাচ্ছে, শুধু যে ইংরেজী থেকেই গ্রন্থাদি অনূদিত হয়েছিল তা নয়, সংস্কৃত, ফারসী, হিন্দী বা হিন্দুস্থানী থেকেও সমান আগ্রহে ও ঐকান্তিকতায় গ্রন্থাদি তর্জমা করা হয়েছিল। শাসকগোষ্ঠীর সঙ্গে সাংস্কৃতিক বিনিময়ের এ ছিল একটি নিশ্চিত এবং অনুমোদিত কার্যক্রম। এই পর্বে রামমোহন রায় সংস্কৃত শাস্ত্রাদি বাংলা তর্জমায় প্রকাশ করে যে ভাব-তরঙ্গ সৃষ্টি করেছিলেন তা অতিশয় সুবিদিত বলেই বর্তমান প্রসঙ্গে তার কোন উল্লেখ করা হল না।

॥ ৩ ॥

ঔপনিবেশিক শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার ফলে ভারতবর্ষের রাষ্ট্রীয় ও আর্থনীতিক কাঠামোর রূপান্তর, গ্রামীণ স্বয়ংনির্ভরতার অবসান, ইংরেজী শিক্ষার প্রচলন ও প্রসার, ইত্যাদির ফলে সমাজমানসে অভূতপূর্ব গতিশীলতার সৃষ্টি হয়। তৎকালীন ভাবাবর্তে যাঁরা অবগাহন করেছেন, তাঁদের মধ্যে ছিল বিপুল এক উদ্দীপনার স্বাক্ষর, যা মন-চলাচলের বুদ্ধিগত জমি প্রস্তুত করার জন্য অধীর। সেজন্য, ইংরেজী ভাষা আশ্রয় করে বিশ্বের যে জ্ঞানভাণ্ডার অপ্রত্যাশিতভাবে ঘরের কোণে এসে উপস্থিত হয়েছে, তাকে মাতৃভাষার মাধ্যমে সর্বত্রগামী করার আগ্রহ দেখা দেয়; আবার, অন্য দিকে ইংরেজী সাহিত্য যে হৃদয়রসের সন্ধান দিয়েছে তাকে ছড়িয়ে দেবার, হৃদয়ের সঙ্গে বুদ্ধিকে মিলিত করার, আকাঙ্ক্ষাও ছিল প্রবল। বিদ্যাচর্চা বা জ্ঞানানুশীলনের জন্য সেকালে কলকাতা ও অন্যান্য

অঞ্চলে নানাবিধ সমাজ বা সমিতি স্থাপিত হয়েছিল। যুক্তিমার্গীয় চিন্তার আলোচনায় তাদের অবদান যেমন স্মরণীয়, তেমনি কোন কোন সমাজ বাংলা অনুবাদের মধ্য দিয়ে পূর্বকথিত লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্ত বাস্তব কর্মপন্থাও গ্রহণ করেছিল। ঐরূপ একটি সমাজ ছিল 'গৌড়ীয় সমাজ'। ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দে এর প্রাণপ্রতিষ্ঠা হয়। সমাজের অন্যতম উদ্দেশ্য বলে ঘোষিত হয়েছিল, "দেশবাসীদের ভিতরে জ্ঞানের উন্নতি ও প্রসার"; "এই উদ্দেশ্য সাধনকল্পে বিভিন্ন ভাষা হইতে বাংলা ভাষায় গ্রন্থাদি অনুবাদ করাইয়া সমাজের ব্যয়ে প্রকাশ করিতে হইবে।" এই কাজে সমাজ কতদূর অগ্রসর হয়েছিলেন সে সম্পর্কে বিস্তৃত সংবাদ না পাওয়া গেলেও অনুবাদ সম্পর্কে এই আত্যন্তিক আগ্রহ ব্যক্তিক জীবনে ও মননে নিশ্চয়ই স্থায়ী প্রভাব বিস্তার করেছিল।[৭] এর প্রমাণ আমরা তৎকালে অনূদিত গ্রন্থাদির মধ্যেই পাই। যেমন, রাজা কালীকৃষ্ণ ডঃ জনসনের 'রাসেলাস' গ্রন্থের অনুবাদ করেছিলেন ১৮৩৩-এ, গে'র উপকথা ১৮৩৬-এ; নীলমণি বসাক 'পারস্ত ইতিহাস' অনুবাদ করেছিলেন ১৮৩৪ খ্রীষ্টাব্দে, তর্জমা করেছিলেন 'বত্রিশ সিংহাসন'; হরিমোহন সেন অনূদিত 'আরব্য রজনী' প্রকাশিত হয় ১৮৫৯-এ; অজ্ঞাত অনুবাদকের 'বেতাল পঞ্চবিংশতি'র প্রকাশ কাল ১৮১৮। হানা মূরের 'শেফার্ড অব সেলিসবেরি প্লেন' গ্রন্থের অনুবাদ 'মেষপালক বিবরণ' (অনু. স্বরূপ) প্রকাশিত হয় ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দে। লং-এর তালিকা থেকে জানা যায়, লে রিচমণ্ডের 'নিগ্রো সার্ভেন্ট' শীর্ষক পুস্তিকার বাংলা অনুবাদ 'কাফ্রি দাস' ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দে ছাপা হয়েছিল, কিন্তু তিনি অনুবাদকের নামোল্লেখ করেননি। এইসব দৃষ্টান্ত থেকে অনুবাদের বৈচিত্র্যের স্বাদ পাওয়া যাবে। আরও স্মরণীয়, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নেতৃত্বে তত্ত্ববোধিনী সভাও ঋগ্বেদ ও ঔপনিষদিক গ্রন্থাবলীর বাংলা তর্জমা প্রথমে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার এবং পরে পুস্তকাকারে নিয়মিত প্রকাশ করেছিলেন।

সমাজ হিসাবে কালজয়ী সাফল্যের অধিকারী হয়েছিলেন 'বঙ্গভাষানুবাদক সমাজ' (ভার্নাকুলার ট্র্যান্সলেশন সোসাইটি)। মুখ্যতঃ উত্তরপাড়ার জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের উদ্যোগেই ১৮৫০ সনে এই সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়। ইংরেজদের মধ্যে বেথুন, রেঃ কে. হজসন প্রাট, জন ক্লার্ক মার্শম্যান, সিটন-কার এবং বাঙালীদের মধ্যে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রসময় দত্ত, হরচন্দ্র দত্ত, বিদ্যাসাগর, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, প্যারীচাঁদ মিত্র, রাধাকান্ত দেব প্রমুখ বিভিন্ন স্তরে এই সমাজের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। এই সমাজ অবশ্য ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে স্কুল বুক

সোসাইটির সঙ্গে সম্মিলিত হয়ে যায়। সমাজ এইসব ইংরেজী গ্রন্থের বাংলা অনুবাদ প্রকাশের প্রস্তাব গ্রহণ করেছিলেন : রবিন্সন ক্রুসো ; বেকন সাহেবের প্রবন্ধ ; আবরক্রাম্বি সাহেবের রচিত মনোগুণ ; চেম্বর্স ও নাইট সাহেবের ও পেনি ম্যাগাজিনে প্রকাশিত নানাবিধ বিদ্যা বিবরণাদি সংগৃহীত এক পুস্তক ; মহাপীটরের আয়ুর বিবরণ ; কলম্বসের আয়ুর বিবরণ ; ক্লাইভ সাহেব ও ওয়ারেন হেষ্টিংস সাহেবের বিষয়ে মাকলি সাহেবের প্রবন্ধ বাক্য।[১০] পরিকল্পনামত রেঃ জে. রবিন্সন 'রবিন্সন ক্রুশো', ডঃ রোয়ার 'ল্যামস্ টেলস ফ্রম সেক্সপীয়র', হরচন্দ্র দত্ত বেকনের 'লাইফ অব ক্লাইভ' তর্জমা করেন, এবং ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে সেগুলো প্রকাশিত হয়। বঙ্গভাষানুবাদক সমাজের প্রধান অধ্যক্ষ বেথুন সমাজ প্রকাশিত পত্রিকা ও পুঁথির জন্য ইংলণ্ডের নাইট কোম্পানীর নিকট থেকে অল্প খরচে প্রচুর ব্লক আনিয়ে দিয়েছিলেন। ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে সমাজ যেসব বিষয়ে মৌলিক অথবা অনুবাদগ্রন্থ প্রকাশের পরিকল্পনা গ্রহণ করেন তাতে এইসব বিষয় অন্তর্ভুক্ত হয় : ১ "প্রাকৃতিক ইতিবৃত্ত এবং বিজ্ঞানশাস্ত্র। ২ দেশ-প্রদেশের বিবরণ ও ভূগোলের বৃত্তান্ত ; ৩ বাণিজ্য ও লোকবার্তা বিবরণ ; ৪ লোকপ্রিয় ও উপকারক বিজ্ঞানশাস্ত্র ; ৫ শিল্পবিদ্যা ; ৬ শিক্ষাবিধান ; ৭ জীবনচরিত এবং নীতিগর্ভ গল্প।"[১১] সমাজ লেখকদের সম্মান দক্ষিণা (দু'শ টাকা এককালীন) দেবারও ব্যবস্থা করেছিলেন, এবং সব ক'টি বিষয়ে না হোক কয়েকটি বিষয়ে মৌলিক ও অনুবাদ গ্রন্থ প্রকাশে যে সফল হয়েছিলেন, তা বলাই বাহুল্য।

আরব্য উপন্যাসের বেশ কয়েকটি অনুবাদ ১৮৬০-এর পূর্বেই হয়েছে। এদের মধ্যে অন্যতম অনুবাদ 'আরবীয়োপাখ্যান', মুক্তরাম বিদ্যাবাগীশ ও সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয় সম্পাদক কর্তৃক অনূদিত।

এই সময়কার একটি বিশিষ্ট কীর্তি রেঃ কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত 'এনসাইক্লোপিডিয়া বেঙ্গলেনসিস' নামক কোষ-গ্রন্থের আবির্ভাব। বাংলায় এর নামকরণ হয়েছিল 'বিদ্যাকল্পদ্রুম'; এটি তৎকালীন বাংলা সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় ও অর্থানুকূল্যে মোট ১৩ খণ্ডে ১৮৪৬-১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে প্রকাশিত হয়। এই কোষগ্রন্থটি ছিল দ্বিভাষিক, ইংরেজী ও বাংলা উভয় ভাষাতেই সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শন, বিজ্ঞান, গণিত ইত্যাদি বিষয়ে সুলিখিত প্রবন্ধ সংকলিত হয়েছিল। এতে সন্নিবিষ্ট অনূদিত নিবন্ধাবলীর মধ্য দিয়ে

বাঙালী পাঠক পাশ্চাত্যের সাহিত্য, বিজ্ঞান ও দর্শন সম্পর্কে তথ্য ও জ্ঞানলাভ করেন।

সমাজের অস্তিত্ব-সীমার মধ্যেই আমরা পাচ্ছি উর্দু থেকে উমাচরণ মিত্রের অনুবাদ 'চাহার দরবেশ' (১৮৫৪) এবং ফারসী থেকে 'গোলে বকাওলি' (১৮৫৫)। বর্ধমানের মহারাজার আনুকূল্যে গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য সংস্কৃত থেকে তর্জমা করেন 'পাকরাজেশ্বর' (১৮৫৪)। রলিন ও এনসাইক্লোপিডিয়া থেকে কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় সারানুবাদ করেন 'ইজিপ্ত দেশের পুরাবৃত্ত' (১৮৫৭)।

এই সময়সীমার মধ্যে সংস্কৃত ও ইংরেজী নাটকের অনুবাদও লক্ষণীয়। সাহিত্যের ইতিহাসকারদের রচনা থেকে জানা যায়, বিশ্বনাথ ন্যায়রত্ন 'প্রবোধ-চন্দ্রোদয়' নাটকের অনুবাদ করেছিলেন ১৮৩৯-৪০ খ্রীষ্টাব্দে, যদিচ সেটি মুদ্রিত হয় ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে। অনুরূপ এক অনুপ্রাণনায় উদ্দীপ্ত হয়েই হরচন্দ্র ঘোষ 'মার্চেন্ট অব ভেনিস' অবলম্বনে রচনা করেছিলেন 'ভানুমতী চিত্তবিলাস (১৮৫৩) এবং আরও পরে অনুবাদ করেন 'রোমিও জুলিয়েট'। বাংলা নামকরণ হল 'চারুমুখচিত্তহরা নাটক' (১৮৬৪)। কিন্তু স্বাভাবিক সাহিত্যপ্রতিভার অধিকারী ছিলেন না বলে সেক্সপীয়র থেকে হরচন্দ্র ঘোষের অনুবাদ সমাদৃত হয়নি। অপেক্ষাকৃত সরস হয়েছিল সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরকৃত 'সিম্‌বেলিনে'র অনুবাদ, 'সুশীলা-বীরসিংহ (১৮৬৮)। পরবর্তীকালে তিনি 'মেঘদূতে'র পদ্যানুবাদ প্রকাশ করেন, ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে। রামনারায়ণ তর্করত্ন অথবা 'নাটুকে' রামনারায়ণ এই সময়ে সংস্কৃত নাটক 'রত্নাবলী' (১৮৫৮) এবং 'অভিজ্ঞান শকুন্তল' (১৮৬০) অনুবাদ করেন।

বিগত শতাব্দীর ষাটের দশকে কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য ফরাসী ঔপন্যাসিক বার্নারদাঁ দ্য সাঁত-পিয়েরের রচিত 'পল এত্‌ ভার্জিনী' গ্রন্থটি মূল ফরাসী থেকে বাংলায় তর্জমা করে অনুবাদ-সাহিত্যে এক অনাস্বাদিতপূর্ব স্বাদ নিয়ে আসেন। এটি 'অবোধ-বন্ধু' পত্রিকায় পৌষ-চৈত্র, ১২৭৫ সালে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়।[১২] কী এক যাদুময় রসে ঐ অনুবাদ মানুষের হৃদয় ভরে দিয়েছিল, রবীন্দ্রনাথ পরবর্তীকালে তাঁর জীবনস্মৃতিতে এর উল্লেখ করে লিখেছেন, "এই অবোধবন্ধু কাগজেই বিলাতি পৌলবর্জিনী গল্পের সরস বাংলা অনুবাদ পড়িয়া কত চোখের জল ফেলিয়াছি তাহার ঠিকানা নাই। আহা, সে কোন্ সাগরের তীর! সে কোন্ সমুদ্রসমীরকম্পিত নারিকেলের বন! ছাগলচরা সে কোন্ পাহাড়ের উপত্যকা! কলিকাতা শহরের দক্ষিণের বারান্দায় দুপুরের রৌদ্রে

সে কী মধুর মরীচিকা বিস্তীর্ণ হইত! আর সে মাথায়-রঙিন-রুমাল-পরা বর্জিনীর সঙ্গে সেই নির্জন দ্বীপের শ্যামল বনপথে একটি বাঙালী বালকের কী প্রেমই জমিয়াছিল![১৩]

আর বিদ্যাসাগরের যে সাহিত্যকীর্তি, বলা চলে তা মূলত, অনুবাদ-নির্ভর। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের ছাত্রদের পঠনপাঠনের সুবিধার জন্য তিনি হিন্দী 'বৈতালপচীসী' নামক গ্রন্থ অবলম্বন করে 'বেতালপঞ্চবিংশতি' রচনা করেন, ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দে। তার আগেই অবশ্য তাঁর অনুবাদ-দক্ষতা প্রমাণিত হয় জন ক্লার্ক মার্শমানের 'হিস্ট্রী অব বেঙ্গল' অবলম্বনে রচিত 'বাঙ্গালার ইতিহাসে' (১৮৪৮)। কিন্তু অনুবাদ যে সৃজনধর্মী সাহিত্যকর্ম তার উজ্জ্বল প্রমাণ তিনি রেখেছেন 'শকুন্তলা'য় (১৮৫৪-৫৫)। এই গ্রন্থটি কালিদাসের 'অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্'-এর অনুবাদ নয়, হতেও পারে না, কারণ, কালিদাসের দৃশ্যকাব্য রূপান্তরিত হয়েছে উপাখ্যানে। আর, এই রূপান্তরের পথে অনুবাদ সম্পর্কে একটি মৌল সত্যও উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। তা হল, মূল গ্রন্থটি আত্মপ্রকাশের কালে তার পাঠকমণ্ডলীর চিত্তে যে রসের সঞ্চার করেছিল, অনুবাদের কালেও নতুন যুগের পাঠকচিত্তে অনুরূপ রসের সঞ্চার করবে—সেইখানেই অনুবাদের কালজয়ী সার্থকতা। বিদ্যাসাগরের উপাখ্যানে সেই রসমাধুর্যের প্রতিফলন, যা আধুনিক রুচি ও মনোভঙ্গির সঙ্গে একাত্ম, এবং সেজন্য তাঁর 'শকুন্তলা' এক ললিতমধুর অনবদ্য সৃষ্টি। ভবভূতির 'উত্তরচরিত' অবলম্বন করে রচিত 'সীতার বনবাস' (১৮৬০) গ্রন্থেও ভাষা ও ভাবের সমন্বয়ে আধুনিক পাঠককে মূল সংস্কৃত গ্রন্থের সৌন্দর্যসীমায় পৌঁছে দেয়। সেক্সপীয়রের 'কমেডি অব এররস্' নাটকটি অবলম্বন করে তিনি তেমনি একটি অতিশয় উপাদেয় ও সরস উপাখ্যান রচনা করেন, 'ভ্রান্তিবিলাস' (১৮৬৯)। তাছাড়া, মহাভারতের উপক্রমণিকা অংশও তিনি অনুবাদ করেছিলেন। বাংলা ভাষার অন্তর্নিহিত সৌন্দর্য, শক্তি ও দ্যোতনার উদ্ভাসে বিদ্যাসাগরের অনুবাদ সত্য সত্যই নতুন সৃষ্টি।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে আরও দুটি অনুবাদগ্রন্থ বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ ও সাহিত্যপাঠকের হৃদয়কে স্পর্শ করেছিল। তাদের একটি চণ্ডীচরণ সেন অনূদিত 'টম কাকার কুটির' (আঙ্কল্ টমস্ কেবিন), ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়; অপরটি গিরিশচন্দ্র ঘোষ অনূদিত 'ম্যাকবেথ'। আরও কয়েকজন ম্যাকবেথ অনুবাদে হাত দিয়েছিলেন, কিন্তু গিরিশচন্দ্র সেক্সপীয়রের মর্মবাণী যে ঐকান্তিকতায় আত্মস্থ করতে পেরেছিলেন তেমনটি আর কারও পক্ষেই সম্ভবপর

হয়নি। সেজন্য তাঁর অনুবাদ আজ পর্যন্তও দ্বিতীয়রহিত বলে স্বীকৃত। সে আমলে বায়রনের কাব্য খুবই সমাদৃত হত, বিশেষতঃ 'আইলস্ অব গ্রীস' কবিতাটি। একাধিক কবি এই কবিতা অনুবাদ করে কাব্যপুস্তিকা প্রকাশ করেন।

॥ ৪ ॥

বিংশ শতাব্দীর প্রথম চল্লিশ বছরে বাংলা অনুবাদসাহিত্য বিচিত্র বৈশিষ্ট্যে মণ্ডিত হয়েছে দেখা যায়। সাহিত্যপাঠের আনন্দে ও রসে শুধুই বিমোহিত হওয়া, বিশ্বমানুষের মনোজীবনে অভিজ্ঞতার স্বাদ গ্রহণ করার আগ্রহ, শুধু জ্ঞানের বিষয়ে নয়, রসের বিষয়ে তন্ময় হওয়ার বাসনা ইতিমধ্যে প্রবল থেকে প্রবলতর হয়েছে। এ সম্পর্কে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের অবদান সর্বাগ্রগণ্য। এই অসামান্য প্রতিভাধর মানুষটি শুধু যে ইংরেজী থেকেই অনুবাদ করেছেন তা নয়, মূল ফরাসী, মারাঠী এবং সংস্কৃত থেকে অসংখ্য নাটক, গল্প, উপন্যাস, জীবনী, প্রবন্ধ অনুবাদ করে বাংলাসাহিত্যের আনুভূতিক সীমা বিস্তৃত করেছেন। তাঁর অনুবাদেব মধ্যে উল্লেখনীয়, মূল ফরাসী থেকে মলিয়ের-এর দুটি প্রহসন, গতিয়ের থেকে অন্তত দুটি উপন্যাস, অসংখ্য ফরাসী গল্প, পিয়ের লোতি়র 'ইংরেজবর্জিত ভারতবর্ষ', ভিক্তর কুজ্যাঁর গ্রন্থ থেকে 'সত্য, মঙ্গল, সুন্দর'; মারাঠী থেকে 'ঝাঁসির রাণী', ইংরেজী থেকে 'মার্কাস অরেলিয়াসের আত্মচিন্তা', 'এপিকটিটাসের উপদেশ' এবং সংস্কৃত থেকে 'মালতীমাধব', 'মৃচ্ছকটিক', 'বিক্রমোর্বশী'। 'উত্তরচরিত', 'রত্নাবলী' প্রমুখ দশ-বারোটি বা ততোধিক নাটক। মারাঠী থেকে তিনি তিলকের 'গীতারহস্যও' অনুবাদ করেছিলেন। অনুবাদসাহিত্যে তাঁর দান সত্যই তুলনারহিত।

সত্যেন্দ্রনাথ দত্তেরও অনুবাদে বিশেষ দক্ষতা ছিল। কবিতা ছাড়াও তিনি ইংরেজী থেকে 'জন্মদুঃখী' (১৯১২) নামে একটি উপন্যাস তর্জমা করেছিলেন, যদিও মূল গ্রন্থট নরওয়ের ঔপন্যাসিক জোনাস লী-র রচনা। এটি সে আমলে খুবই জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। সত্যেন্দ্রনাথ 'রঙ্গমল্লী' (১৯১৩) গ্রন্থে কয়েকটি নাটকও অনুবাদ করেছিলেন; এতে আছে একটি চীনা, একট জাপানী এবং মেটারলিঙ্ক ও স্টিফেন ফিলিপসের একটি করে নাটক।

এই শতকের গোড়ায় দিকে দীনেন্দ্রকুমার রায় এ্যাবটের 'নেপোলিয়ান বোনাপার্ট', এবং বরদাকান্ত মিত্র টডের 'রাজস্থান' অনুবাদ করে খ্যাতি অর্জন

করেছিলেন। তাছাড়া, 'রহস্য-লহরী সিরিজ'-এ দীনেন্দ্রকুমারের অনূদিত গ্রন্থের সংখ্যা দুই শতাধিক। বাংলায় যামিনীকান্ত সোমই বোধ করি ইবসেনের 'ডলস্ হাউস' নাটকের প্রথম অনুবাদক ; ভাষান্তরে এর নামকরণ হয়েছিল 'খেলাঘর'। পরে ১৯২৭-২৮ সনে তিনি মেটারলিঙ্কের 'ব্লু-বার্ড' নাটকটি অনুবাদ করেন 'নীলপাখী' নামে। প্রমথ চৌধুরী ফরাসী থেকে অনুবাদ প্রকাশ করতেন 'সবুজপত্রে' ; তাঁর মার্জিত বাচনভঙ্গি ক্লাসিক পর্যায়ভুক্ত হবার দাবি রাখে। ঐ গোষ্ঠীভুক্ত কান্তিচন্দ্র ঘোষ কৃত 'রুবাইয়াৎ-ই-ওমর খৈয়াম' বাংলা অনুবাদ সাহিত্যে একটি চিরায়ত আসন অধিকার করে রয়েছে।

তারপর 'কল্লোল' যুগের সাহিত্যিকবৃন্দ বিশ্বসাহিত্যের খ্যাতনামা সাহিত্য-স্রষ্টাদের গল্প-উপন্যাস-কবিতা অনুবাদ করেন, এবং এই সূত্রে বাংলা সাহিত্যের পাঠক পরিচিত হন গোর্কি, ন্যুট হামসুন, জোহান বয়ার, বার্নাড শ, লরেন্স, টলস্টয়, মম্ প্রমুখ লেখকদের মানসবৈশিষ্ট্যের সঙ্গে। তাঁদের শব্দচয়ন, তির্যক বাচনভঙ্গি, গদ্যের শিল্পময় বৈশিষ্ট্যে অনুবাদ নবসৃষ্টির বিশিষ্টতা লাভ করে। এই গোষ্ঠীর লেখকদের মধ্যে গোকুল নাগের 'পরীস্থান' (মেটারলিঙ্কের ব্লুবার্ড অবলম্বনে উপাখ্যান), অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত কৃত হামসুনের 'প্যান'। পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় অনূদিত হামসুনের 'বুভুক্ষা' (হাঙ্গার), আঁদ্রে মরোয়া অবলম্বনে নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়ের 'শেলি', বুদ্ধদেব বসু অনূদিত অস্কার ওয়াইল্ডের 'হাউই' এবং আলডুস্ হাক্সলির 'ক্রোম ইয়েলো' অবলম্বনে রচিত 'রোডোডেনড্রন গুচ্ছ' একদা সাহিত্য পাঠকের মনোহরণ করেছিল। সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার কৃত আনাতোল ফ্রাঁসের একটি উপন্যাসের অনুবাদ 'বৈরিণী' এই আমলের আরেকটি বিশিষ্ট সংযোজন। আরও কিছুকাল পরে কাজী আব্দুল ওদুদ রচিত 'কবিগুরু গ্যেটে'-তে পাই সেই মহাকবির বহু রচনাংশের প্রাঞ্জল অনুবাদ। ডক্টর কানাইলাল গঙ্গোপাধ্যায় 'ফাউস্তে'র সুন্দর অনুবাদ করেছেন। দুটি সংস্করণ এই অনুবাদের জনপ্রিয়তার প্রমাণ।

বিশ্বের বরণীয় লেখকদের বিভিন্ন স্বাদের ও আবেদনের সাহিত্যের সঙ্গে এই পরিচিতি বাঙালী পাঠকের রুচি ও হৃদয়-সংবেদনা পরিশীলিত হয়ে ক্রমেই পূর্ণতার পথে অগ্রসর হচ্ছিল। বিশেষতঃ গল্প-উপন্যাসের বিশ্বজনীন মানদণ্ড সম্পর্কে বাঙালী সাহিত্যস্রষ্টাগণ যেমন, পাঠকরাও তেমনি সচেতন হয়ে উঠছিলেন। অনুবাদ ছিল সেই সচেতনতার বাহন।

॥ ৫ ॥

স্বাধীনতা-উত্তর বাংলা অনুবাদ-সাহিত্য আরও বেশী বিস্তার ও ব্যাপকতা অর্জন করেছে; সংখ্যার বিচারে যদি না-ও হয়, অন্তত বিষয়বৈচিত্র্যে, নব নব দেশের ও বিষয়বস্তুর সাযুজ্য লাভের আকাঙ্ক্ষায়। ইউনেস্কোর উদ্যোগে ও তত্ত্বাবধানে বিভিন্ন দেশের অনুবাদ-সাহিত্য সংক্রান্ত যে তথ্যপঞ্জী প্রকাশিত হয়, তার সাক্ষ্য থেকে তাই প্রমাণিত হয়। দেখা যায়, ১৯৪৭-১৯৫৮ এই বার বৎসরে বাংলায় অনূদিত গ্রন্থের সংখ্যা ৪২৯।[১৪] অবশ্য, এই হিসাব নির্ভুল না হওয়ারই সম্ভাবনা; কারণ, জাতীয় পাঠাগারে প্রাপ্ত তথ্যাদির ভিত্তিতে তা প্রস্তুত করা হয়েছে। আর, এও সত্য যে সব অনূদিত পুথিই জাতীয় পাঠাগারে পৌছায় না। যাই হোক, পূর্বোক্ত ৪২৯ খানা গ্রন্থের মধ্যে কোন্ কোন্ সাহিত্য থেকে অনুবাদ করা হয়েছে তার হিসাব এইরূপ; আরবী ১; চীনা ১১; চেক ১; ডেনিশ ২; ইংরেজী ১৭৪; ফরাসী ৫২; জর্জিয়ান ১; জার্মান ২১; গ্রীক ৫; হিব্রু ২; হিন্দী ৪; ইতালিয়ান ৩; কোরীয় ১; লাতিন ১; মারাঠী ১; নরুইজিয়ান ১; পালি ১; পাঞ্জাবী ১; ফারসী ১; পোলিশ ৪; রাশিয়ান ১১৯; সংস্কৃত ১৪; স্পেনিশ ১; সুইডিশ ২; তামিল ১; তেলুগু ১; উর্দু ৩।[১৫] উল্লেখিত মূল ভাষাগুলো থেকেই যে গ্রন্থাদি অনুবাদ করা হয়েছে, এমন না-ও হতে পারে। সম্ভবতঃ বেশীর ভাগ গ্রন্থই ইংরেজী থেকে অনূদিত। সর্বসাকুল্যে শতাধিক প্রকাশন সংস্থা ঐ গ্রন্থসমূহের প্রকাশক; আর ক্ষেত্রবিশেষে লেখক স্বয়ং অথবা তাঁর পক্ষে ব্যক্তিবিশেষ গ্রন্থ প্রকাশ করেছেন। আবার এ-ও লক্ষ্য করা গেছে, ঐসব প্রকাশন সংস্থার মধ্যে কিছু সংখ্যক ইদানীং অস্তিত্বহীন।

যাঁদের লেখা অনূদিত হয়েছে তাঁদের মধ্যে আছেন: ঔপন্যাসিক—বালজাক, স্তাঁদাল, দুমা, হুগো, জিদ্, জোলা মরিয়াক, বারবুস, রোলাঁ, ফ্রাঁস, বয়ে, হেসে, মপাসাঁ, লিও টলস্টয়, আলেক্সি টলস্টয়, টুর্গেনিভ, ডস্টয়ভস্কি, চেকভ, সলোকভ, গোর্কি, গোগল, সিন্‌কিউইচ, হামসুন, টমাস মান, দেলেন্দা, লাগেরকভিস্ট, হেমিংওয়ে, সিনক্লেয়ার, সেলমা লেগারলফ্, কুপরিন, ভলতেয়ার, লরেন্স, রেমার্ক, হাওয়ার্ড ফাস্ট, পার্ল বাক, লু শুন, লাও চাঙ, স্তেফান ৎস্‌ভাইগ, মেরি ওলস্টনক্র্যাফ্‌ট, ওডহাউস, কোয়েসলার, কৃষাণচন্দ্র, মুল্‌করাজ আনন্দ, ভবানী ভট্টাচার্য, আলডুস হাক্সলি প্রমুখ। কবিদের মধ্যে আছেন: হোমার, সেক্সপীয়ার, র‍্যাবোঁ, হুইটম্যান, ল্যাংস্টন হিউজেস, আরাগঁ প্রমুখ। দার্শনিক ও মননশীল চিন্তাবিদদের মধ্যে আছেন: প্লেটো, রাস্কিন, রাসেল,

টমাস পেইন, কৌটিল্য, জেমস্ জীনস, শ্রীঅরবিন্দ, অভেদানন্দ, রাধাকৃষ্ণন, রাজাগোপালাচারি, রাহুল সংকৃত্যায়ন প্রমুখ। রাজনৈতিক নায়কদের মধ্যে আছেন : মার্ক্স, এঙ্গেলস, লেনিন, স্তালিন, মাও, লিউ শাও চি, ক্রুপস্কায়া প্রমুখ। অন্যান্যদের মধ্যে আছেন, হোরেস, এইচ. জি. ওয়েলস, আনা লুই স্ট্রং, আরভিং স্টোন, চেষ্টার বোলস, নেহরু, টলার, হেভলক এলিস, মারি স্টোপস্, হ্যানিমান, জিম করবেট, ব্র্যাডম্যান, আনা সেগার্স্, রোজেনবার্গ, কীরো, ফুচিক, প্রমুখ। নাট্যকারদের মধ্যে আছেন : ঈসকাইলাস, অস্কার ওয়াইল্ড্, বার্নাড শ,' প্রমুখ। আরও অসংখ্য নাম বাদ দেওয়া হল, তালিকা ভারাক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কায়। বাংলায় সেক্সপীয়র অনুবাদের মোট সংখ্যা ১২৮। এই তালিকা থেকে অনুমান করা যাবে, বাংলা অনুবাদ-সাহিত্য কত বিচিত্রগামী ও সমৃদ্ধ ; আধুনিক বাংলা সাহিত্যের বর্তমান স্তরে মূল্যমান নির্ণয়ে ও সৃজনশীল সাহিত্যের শিল্পবোধ নিয়ন্ত্রণে অনুবাদ যে অপরিহার্য, তা বলাই বাহুল্য।

বাংলা অনুবাদকর্ম যে বর্তমান কালেও অব্যাহত, বিগত কয়েক বৎসরের পরিসংখ্যান থেকে তার স্বাক্ষর পাওয়া যায়। নিচে ১৯৭১ থেকে ১৯৭৮ পর্যন্ত বাংলায় অনূদিত গ্রন্থসমূহের একটি সারণী উপস্থাপিত হল।[১৬] এই বিবরণ যে সম্পূর্ণ, তা মনে করার কোন হেতু নেই। এ সারণী শুধু জাতীয় গ্রন্থাগারে প্রাপ্তব্য তথ্যের উপর নির্মিত ; আর পূর্বেই উল্লেখিত হয়েছে, সমস্ত বই ঐ গ্রন্থাগারে সময়মত জমা পড়ে না। প্রাপ্য তথ্যের ভিত্তিতে রচিত পরিসংখ্যান যে বিভ্রান্তিকর হয় তার আরও একটি প্রমাণ—সারণীতে উল্লেখিত ১৯৭৩ সনের অনূদিত গ্রন্থসংখ্যা ৫৪, কিন্তু ইউনেসকো ঐ বৎসরের জন্য অনূদিত বাংলা গ্রন্থের যে তালিকা প্রস্তুত করেছেন তাতে দেখা যাচ্ছে, ঐ বছরে মোট ৪৬টি গ্রন্থ অনূদিত হয়েছিল।[১৭] বাস্তব অবস্থার সঙ্গে এই সংখ্যাগত ব্যবধান হয়ত আরো প্রকট।*

---

* সংখ্যার এই বৈষম্যের কারণ এই যে, ইউনেসকো তার তালিকায় অন্তর্ভুক্তির জন্য কিছু শর্ত আরোপ করে। সেই শর্ত স্বীকার করতে গিয়ে কিছু সংখ্যক বই তালিকা থেকে বাদ দিতে হয়।

১৯১১—১৯১৮ মোট আট বছরের বাংলা অনুবাদের বিষয়ানুক্রম

	সাধারণ	দর্শন	ধর্ম	সমাজ-বিদ্যা	বিজ্ঞান	প্রযুক্তি-বিদ্যা	ললিতকলা ও খেলাধূলা	ভাষা ও সাহিত্য	ভূগোল ও ইতিহাস জীবনী	মোট
১৯১১	২	২	১৪	১৫	৭	৬	৯	৪৫	১৪	১০৮
১৯১২	—	৭	১০	৫	৪	২	—	২০	৬	৫৭
১৯১৩	২	১	৯	—	২	১	৩	৩২	৪	৫৪
১৯১৪	—	—	১৫	২	১	—	১	৪১	১৪	৭৫
১৯১৫	৪	৬	২০	১৯	৩	২	১	৬১	১৬	১৩৫
১৯১৬	—	৪	১৪	৮	—	১	৩	৫১	১৩	৯৪
১৯১৭	১	৮	১৭	৬	—	১	২	৪৭	১৪	৯৬
১৯১৮	—	—	১২	১৩	১	—	—	৫৪	১৪	৯৪

এই সারণী থেকে প্রমাণিত হচ্ছে, সৃজনধর্মী সাহিত্য অনুবাদের আকর্ষণ বরাবরই প্রবল কিন্তু ধর্ম-সমাজবিদ্যা-জীবনীগ্রন্থ ইত্যাদির প্রতি অনুরাগ একান্ত উপেক্ষণীয় নয়।

বাংলা শিশুসাহিত্যের একটি স্বতন্ত্র ধারা উনবিংশ শতাব্দীর গোড়া থেকেই প্রবাহিত হয়ে আসছে। সমকালের সামগ্রিক বিচারে শিশুসাহিত্যের স্রষ্টা অগণিত; তাঁদের সকলেই অনুবাদে হাত লাগিয়েছেন, একথা বলা যায় না। তবে, তাঁদের মধ্যে স্বল্প-সংখ্যক লেখক দেশবিদেশের সাহিত্যের তর্জমা করে শিশুমনকে স্পর্শ করতে চেয়েছেন হয় রূপকথার জাদুতে, বা ভয়ঙ্করের অভিযানে, বা জ্ঞানবিজ্ঞানের প্রলোভনে। সে দিক থেকে অনূদিত শিশু-সাহিত্যও কম ঐশ্বর্যমণ্ডিত নয়। উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ায় বিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তক রচনায় অনুবাদের সাহায্য নেওয়া হয়েছে নিশ্চয়, কিন্তু স্বাধীন স্বকীয় সত্তা নিয়ে কিশোরদের জন্য রচিত অনুবাদ সাহিত্যের আবির্ভাব ঐ শতকের মাঝামাঝি সময়ে। মধুসূদন মুখোপাধ্যায় বোধ করি প্রথম বাংলায় শিশুসাহিত্যের অনুবাদক। তিনি হান্স ক্রিশ্চিয়ান এণ্ডারসেন-এর রূপকথা অবলম্বনে তিনটি ক্ষুদ্রকায় বই রচনা করেন: 'কুৎসিত হংসশাবক ও খর্বকায়ার বিবরণ' (দি আগলি ডাকলিং), ১৮৫৭; 'মৎস্যেন্দ্র—অর্থাৎ মৎস্যনারীর উপাখ্যান' (দি লিট্‌ল্ মারমেড), ১৮৫৭, এবং 'হংসরূপি রাজপুত্র' (দি ওয়াইল্ড

সোয়ানস্), ১৮৫৯ (২য় মুদ্রণ)। তিনটি পুস্তিকারই প্রকাশক ছিলেন ভার্নাকুলার লিটারেচার সোসাইটি। সেই থেকে অবিচ্ছিন্ন ধারায় অনুবাদ-সাহিত্য আত্মপ্রকাশ করে আসছে।

এ প্রসঙ্গে অবিস্মরণীয় নাম কুলদারঞ্জন রায়। তাঁর অনূদিত 'রবিনহুড' (১৯১৪) হাজার হাজার কিশোরের স্বপ্নকল্পনায় দুঃসাহসিক এ্যাডভেঞ্চারের রোমাঞ্চ জাগিয়েছে বছরের পর বছর ধরে। ক্রমে ক্রমে তিনি রচনা করেছেন হোমার অবলম্বনে 'ওডীসিয়ুস' (১৯১৫), 'ইলিয়াড' (১৯২১, ২য় সং), স্কট অবলম্বনে 'ট্যালিসম্যান' (১৯২৮), জুল ভার্ন অবলম্বনে 'আশ্চর্যদ্বীপ', ১ম-২য় গল্প (মিস্টিরিয়াস আয়ল্যাণ্ড), ১৯৩০, ইত্যাদি এবং অসংখ্য পৌরাণিক কাহিনী। তাঁর প্রতিটি রচনায় ছিল সৃজনশীল প্রতিভার নিশ্চিত স্বাক্ষর।

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটি বইকে অন্তত অনুবাদের পর্যায়ে ফেলা চলে। সেটি 'বুড়ো আংলা' (১৯৪১), সেলমা লেগারলফের 'এ্যাডভেঞ্চার্স অব নিল্‌স' অবলম্বনে রচিত। কিন্তু ভাষা নিয়ে তাঁর যে বিস্ময়কর খেলা, তাতে এটি মৌলিক রচনার অপূর্ব স্বকীয়তা লাভ করেছে। ধনগোপাল মুখোপাধ্যায়ের মূল ইংরেজী গ্রন্থ থেকে অনুবাদ করে সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রকাশ করেন 'চিত্রগ্রীব' (গে-নেক), ১৯৩১ এবং 'যূথপতি' (করী, দি এলিফেন্ট), ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দে। তৎকালে এ দুটি গ্রন্থ ছিল শিশুসাহিত্যের উল্লেখযোগ্য সংযোজন। বিমল সেনকৃত আলেকজান্দার দুমার 'কাউন্ট অব মন্টিক্রিস্টো' গ্রন্থের অনুবাদ 'শোধবোধ' (১৯৩০) সে সময় অতিশয় জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। যামিনীকান্ত সোম অনূদিত মেটারলিঙ্কের নাটক 'নীল পাখির' কথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে; তিনি সারভেনটিসের 'ডন কুইকজোট' অবলম্বনে রচনা করেন 'ডন্ কুত্তি' (১৯৩৩)। এরিক মারিয়া রেমার্কের কাহিনীর মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায় কৃত বাংলা অনুবাদ 'অল কোয়ায়েট অন দি ওয়েস্টার্ন ফ্রন্ট' (১৯৩৩) একটি অনবদ্য রসোত্তীর্ণ রচনা; আজও এর আবেদন অক্ষুণ্ণ। হেমেন্দ্রকুমার রায়ের 'কিং কঙ' (১৯৩৪), ওয়েলসের কাহিনী অবলম্বনে রচিত 'অদৃশ্য মানুষ' (১৯৩৫, দি ইনভিজিবল্ ম্যান), মেরি ওলস্টনক্র্যাফ্‌ট শেলির ভয়ঙ্কর কাহিনী 'ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন' অবলম্বনে 'মানুষের গড়া দৈত্য,' ইত্যাদি গ্রন্থ একদা কিশোর বয়সের নিত্য সঙ্গী ছিল। পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়ের মেটারলিঙ্ক অবলম্বনে রচিত গল্প 'নীল পাখি' (১৯২৫) এবং হুগোর উপন্যাসের সংক্ষেপিত অনুবাদ 'ছোটদের লে মিজেরাব্‌ল' (১৯৫৬) ছিল অতিশয় সরস ও উপাদেয়

গ্রন্থ। তেমনি অপরূপ ও অনাস্বাদিতপূর্ব ছিল এণ্ডারসেনের 'ফেয়ারী টেলস্' এর বুদ্ধদেব বসুকৃত অনুবাদ দুখণ্ডে 'অপরূপ রূপকথা' (১৩৩৭); ভাষার আশ্চর্য মুনশিয়ানায় ও ব্যঞ্জনায় বুদ্ধদেবের অনুবাদ সত্যই অনবদ্য সৃষ্টি।

অনুবাদে শিশুসাহিত্যিক খগেন্দ্রনাথ মিত্রের দক্ষতাও সুবিদিত। তাঁর গ্রন্থাদির মধ্যে 'আঙ্কল টমস্ কেবিন' (১৩৪০), লিউ ওয়ালেসের 'বেনহুর' (১৩৪১), 'টলস্টয়ের ছোটদের গল্প' (১৩৫০), ডিকেন্সের 'এ টেল অব টু সিটিজ', ইত্যাদি একদা সমাদর লাভ করেছিল। সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় এবং নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় পরিণত বয়সে শিশুদের জন্য বিদেশী সাহিত্য অনুবাদে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। উভয়ের রচনায় ব্যস্ততার ছাপ স্পষ্ট; এর মধ্যেও নৃপেন্দ্রকৃষ্ণের গোর্কির 'মা', ডিকেন্সের 'অলিভার টুইস্ট', দুমার 'থ্রী মাস্কেটীয়ার্স' (১৩৪৯) উপভোগ্য হয়েছিল। আর সৌরীন্দ্রমোহনের ভাল রচনার মধ্যে ছিল হ্যাগার্ড থেকে অনূদিত 'কিং সলোমনস্ মাইনস্', এবং কিংসলি থেকে 'জলপরী' (ওয়াটার বেবিজ)।

বিগত পঁচিশ বছরে যেসব শিশুসাহিত্যিক অনুবাদকর্মে হাত পাকিয়েছেন, তাঁরা স্বাধীনতাপূর্ব আমলের সাহিত্যিকদের তুলনায় সংখ্যায় ভারি। এই অসংখ্যের ভিড়ে অল্প কয়েকজন বিশিষ্টতার আসনে প্রতিষ্ঠিত রয়েছেন রচনায় প্রসাদগুণের জন্য। তাঁদের মধ্যে মণীন্দ্র দত্ত গ্রন্থনির্বাচনে রুচি ও বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর অনূদিত গ্রন্থাদির মধ্যে আছে হুগোর 'রক্তরাঙা দিনে' (১৩৬৬, 'নাইনটি থ্রি'), 'দি লাফিংম্যান' (১৩৭৫), ডিকেন্সের 'অনেক আশা' (১৩৭৫, 'গ্রেট এক্সপেকটেশনস্'), 'ওল্ড কিউরিওসিটি শপ' (১৩৫৭), স্টিভেনসনের 'ট্রেজার আইল্যাণ্ড' (১৩৫৯), ইত্যাদি। সুধীন্দ্রনাথ রাহা অনুবাদ করেছেন হুগোর 'হাঞ্চব্যাক অব নোৎরডম' (১৩৫৩), কিংসলির 'ওয়েস্টওয়ার্ড হো', ব্যালানটাইনের 'কোরাল আইল্যাণ্ড', 'আফাতা' (১৩৫৮), ডিকেন্সের 'নিকোলাস নিকলবি' (১৩৬০), ইত্যাদি। ক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য দুমার 'দি ব্ল্যাক টিউলিপ' (১৩৫৪ ২য় সং), এবং হোমার থেকে 'দি ওডিসি' (১৩৫৪) ও 'দি ইলিয়াড' (১৩৫৩) অনুবাদে কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। অশোক গুহ সেক্সপীয়রের প্রায় সব নাটকই গল্পের মত পরিবেশন করেছেন কিশোরদের মনোরঞ্জনের জন্য, ভাষার প্রাঞ্জলতার দরুণ সেগুলো জনপ্রিয় হয়েছিল। মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় জুল ভার্নের অনেকগুলি বই অনুবাদ করেছেন। তিনি 'এরাউণ্ড দি ওয়ার্ল্ড ইন এইটি ডেস', 'জার্নি টু দি সেন্টার

অব দি আর্থ', 'ফ্রম দি আর্থ টু দি মুন', 'মিস্টিরিয়াস আইল্যাণ্ড', 'অকূলপাথার' (এড্রিফ্‌ট ইন দি প্যাসিফিক), ইত্যাদি অনুবাদ করেছেন পঞ্চাশের দশকে; তাছাড়াও আছে জেমস ফ্যানিমোর কুপারের 'দি লাস্ট অব দি মোহিকান্স', ব্যালানটাইনের 'মার্টিন র‍্যাটলার', ইত্যাদি।[১৮] শিশু-কবিতা অনুবাদকের সংখ্যাও নগণ্য নয়।

॥ ৭ ॥

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ পাদ থেকে বর্তমান কাল অবধি বাংলা অনুবাদ সাহিত্যের একটি রূপরেখা বর্ণিত হল। মনোযোগী পাঠক নিশ্চয়ই উপলব্ধি করবেন যে, রূপরেখাটি অসম্পূর্ণ। এই অসম্পূর্ণতার মধ্যেও অনুবাদ-সাহিত্যের আন্তর-সম্পদ বিশ্লেষণ করলে একটি বৈশিষ্ট্য ধরা পড়বে যা কালের অন্তর্নিহিত গরজের সঙ্গে ঐক্য-সম্পর্কে বাঁধা। উনবিংশ শতাব্দী ছিল নতুন সংস্কৃতির আবির্ভাব, বিকাশ ও সংহতির কাল; সুতরাং, ঐ সংস্কৃতির যাঁরা নির্মাতা তাঁদের লক্ষ্য ছিল মানুষের ধ্যানধারণা জীবনসাধনায় এমন কিছু নব-রূপায়ণ যা ঐ সংস্কৃতিকে করবে ঐশ্বর্যমণ্ডিত। অনুবাদ-সাহিত্যে এই উদ্দেশ্যের প্রতিফলন অনায়াসলক্ষ্য। যা কিছু জ্ঞানের বিষয় অথবা যা মনকে করবে পরিশীলিত, উচ্চভাবনায় উন্নীত, অনুবাদের মধ্য দিয়ে তা দেশে ব্যাপ্ত করার বাসনা ঐ কালে আমরা প্রত্যক্ষ করেছি। আরও দেখেছি, যা মানবিক বোধে উদ্দীপ্ত বা রসে উজ্জীবিত, তাতে স্নাত হওয়ার আকাঙ্ক্ষাও ছিল প্রবল; কেন না, এও নির্মীয়মান সংস্কৃতির আত্মোপলব্ধিরই একটি দিক। যা জ্ঞানের বিষয় বা ধর্মাচরণের অঙ্গ, প্রথম যুগে তার অবিসম্বাদী প্রাধান্য। কিন্তু শতাব্দীর বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সেই প্রাধান্য ক্ষুণ্ণ হয়ে রসের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়; যা আনন্দ দান করে, মনের সঙ্গে মনকে মেলায়, অথবা মানবিক ভুবনের বিশাল বৈচিত্র্য সম্পর্কে মনকে অভিভূত করে, শতাব্দীর শেষদিকে অনুবাদ-সাহিত্যে তারই নিঃসংশয় প্রাধান্য। আরও স্মরণীয়, ঐ সাহিত্য মানুষকে বৃহত্তের দিকে আকৃষ্ট করেছিল।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর বাংলা বিগত শতকের ঐ আন্তর প্রেরণা হারিয়ে ফেলেছিল। তখন যা ছিল স্বপ্রকাশমান, তা এখন অবক্ষয়ের পথে। ব্যাপ্ত হবার আকাঙ্ক্ষা তখন প্রায় অস্তমিত। তাই, অনেক ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে, যা আত্মনিমগ্ন থাকার প্রেরণা যোগায়, অথবা যা অবসন্ন বা ঈষৎ শ্লেষপূর্ণ, কল্লোলের

আমলে তার প্রতি একটু বেশী দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়েছিল। ইউরোপীয় সমাজ ও ব্যক্তিজীবনের সংকট অনুবাদের মাধ্যমে আমাদের মনকেও স্পর্শ করেছিল, অথচ এর জন্য আমাদের সামাজিক-সাংস্কৃতিক ক্ষেত্র প্রস্তুত ছিল একথা জোরের সঙ্গে বলা যায় না। অবশ্য পাশাপাশি আমরা এমন রচনারও সাক্ষাৎ পাই যা উজ্জ্বল জীবনের বার্তা বহন করে নিয়ে এসেছিল।

আমাদের সমকালীন অনুবাদ-সাহিত্য সম্পর্কে অন্য একটি লক্ষণ বিচার্য। এ ক্ষেত্রে অনুবাদকের চাইতে অনুবাদ প্রকাশকের ভূমিকাটা সম্ভবতঃ বড়। কারণ, যিনি অর্থ লগ্নী করছেন, তাঁর উপস্থিত লাভের বিচারটাই প্রধান, সংস্কৃতি বাঁচল কি মরল সেটা তেমন কিছু ধর্তব্যের মধ্যে নয়। এখনকার সাময়িক পত্রাদিতে প্রকাশিত অনূদিত সাহিত্যের বিজ্ঞাপনে সেজন্যই যৌনতার অতিশয়তায় উচ্ছল বা অপরাধপ্রবণ বা রহস্যভীষণতায় মুখর বিদেশী গ্রন্থের প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়। এমন দৃষ্টান্তও বিরল নয় যেখানে প্রকাশক শুধু আর্থিক লাভের আশায় অনুবাদককে দিয়ে ঐ শ্রেণীর গ্রন্থ লিখিয়ে নিয়েছেন। অতীতে লেখক-প্রকাশকের যৌথ দায়িত্ব ছিল সংস্কৃতির প্রতি, এখন অধিকাংশ ক্ষেত্রে তা একান্তই অনুপস্থিত। অবক্ষয়ী সমাজে এই প্রবণতা মুখ্য হলেও এটাই অবশ্য একমাত্র যুগলক্ষণ নয়। একালেও এমন সব সাহিত্যস্রষ্টা আছেন, অতীতেও ছিলেন, যাঁরা দেশ বিদেশের প্রগতিশীল সাহিত্য, যাতে আছে অন্যায়ের বিরুদ্ধে ক্রোধ, মানুষের প্রতি ভালবাসা, ভবিষ্যতের প্রতি বিশ্বাস, এক কথায় যা প্রগতিবাদী সাহিত্য,—অনুবাদের মাধ্যমে বাঙালী পাঠককে উপহার দিয়েছেন, দিচ্ছেন। নতুবা, বাংলায় নিগ্রো কবিতা, চীন-ভিয়েৎনামের সংগ্রামী কবিতা, অথবা ব্রেশ্‌টের নাটক কখনও অনূদিত হত না। স্বল্পসংখ্যক হলেও এই শ্রেণীর কবিতা-উপন্যাস-নাটকের অনুবাদক ও প্রকাশক যৌথভাবে সংস্কৃতির প্রতি দায়িত্বের বোধে সংযুক্ত, সাহিত্যের প্রতি ভালবাসায় অটল।

শুধু সাংস্কৃতিক কর্ম অথবা সংস্কৃতি বিনিময়ের মাধ্যম রূপে নয়, ব্যবসায়িক উদ্যোগ হিসাবেও অনুবাদ-সাহিত্য বাংলা প্রকাশন শিল্পকে প্রভাবান্বিত করেছে। শিশু সাহিত্যের প্রকাশক এমন দু-একটি সংস্থা আছে যাদের প্রকাশিত পুস্তক-তালিকার অধিকাংশই অনুবাদ। আধুনিক বিশ্বে বিভিন্ন দেশের মধ্যে সাংস্কৃতিক যোগসূত্র সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় অনুবাদসাহিত্যের প্রতি এই সমাদর অপ্রত্যাশিত নয়। এই মনোভঙ্গি প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে মুদ্রণ-শিল্পকে উৎসাহিত বা প্রভাবিত করেছে। উনবিংশ শতাব্দীর তো কথাই নেই;

শ্রীরামপুর মিশন প্রেস বা সংস্কৃত প্রেসের ব্যবসায়িক বিস্তার মুখ্যতঃ অনুবাদ-নির্ভরই ছিল। এখনকার মুদ্রণসংস্থাগুলো সম্পর্কে অবশ্য একথা বলা যায় না, তবে অনুবাদক-প্রকাশক সংযুক্ত প্রয়াস কোন না কোন ভাবে মুদ্রণশিল্পকে প্রভাবিত করেই। ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে রেঃ লং বাংলা সরকারের নিকট প্রদত্ত এক প্রতিবেদনে জানিয়েছিলেন যে, বাংলা পুস্তক বা ইস্তাহার ছাপায় এমন ছাপাখানার সংখ্যা ৪৬, আজ এই সংখ্যা যে বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে তাতে সন্দেহ নেই। সংস্কৃতিকর্ম হিসাবে অনুবাদ-সাহিত্যের অবদান সেই দিক থেকে স্বীকার্য। আর সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও সর্বদা স্মরণীয়, মানবিক বিশ্বের অভিন্নতার চেতনার উদ্‌বোধন ও বিকাশে অনুবাদ-সাহিত্য এক অপরিহার্য যোগসূত্র। আশার কথা, কেন্দ্রীয় সরকার জাতীয় সংস্কৃতির ক্ষেত্রে অনুবাদের গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পেরেছেন। বিগত কয়েক বছর যাবৎ সাহিত্য আকাদেমি এবং ন্যাশানাল বুক ট্রাস্ট অনুবাদগ্রন্থ প্রকাশে উদ্যোগী হয়েছেন। এঁদের ব্যবস্থাপনায় বিভিন্ন ভারতীয় এবং বিদেশী ভাষা থেকে ইতিমধ্যেই নানাবিষয়ক অনেকগুলি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ বাংলায় অনুবাদ হয়েছে।

নির্দেশিকা

১ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। 'লোকহিত' কালান্তর, রবীন্দ্ররচনাবলী বিশ্বভারতী সংস্করণ, ২৪ খণ্ড, পৃ ২৬৭

২ ওয়ারেন হেস্টিংস লিখেছিলেন, "Every accumulation of knowledge, and especially such as is obtained by social communication with people over whom we exercise a dominion founded on the right of conquest, is useful to the state : it is the gain of humanity : in the specific instance which I have stated, it attracts and conciliates distant affections ; it lessens the weight of the chain by which the natives are held in subjection ; and it imprints on the hearts of our own countrymen the sense and obligation of benevolence." বাংলা গদ্য-সাহিত্যের ইতিহাস, সজনীকান্ত দাস। চিরায়ত সংস্করণ, ১৯৭৫ ; পৃঃ ৫০-৫১

৩ De, S. K. *Bengali Literature in the Nineteenth Century*. Calcutta, 1919, p. 88.

সবিতা চট্টোপাধ্যায়। বাঙালা সাহিত্যে ইউরোপীয় লেখক; কলিকাতা, ১৯৭২, পৃঃ ১৫০-১৫১

৪ *Catalogue of Bengali Books in the British Museum*, (Blumhardt) থেকে এস. কে. দে তাঁর পূর্বোক্ত গ্রন্থে উদ্ধৃত করেছেন, পৃঃ ৮৮-৮৯

৫ পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ১০৮

৬ সাহিত্যসাধক চরিতমালা (১ম খণ্ড)—ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, কেলিক্স কেরী অংশ, পৃঃ ৩৬। সজনীকান্ত দাস—পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ২২৪

৭ এস. কে. দে গ্রন্থটির প্রকাশ কাল দিয়েছেন ১৮৩৮, সজনীকান্ত দাস এবং ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় উভয়েই গ্রন্থটি ১৮৩০ সনে প্রকাশিত হয়েছিল বলে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু সবিতা চট্টোপাধ্যায় জোরের সঙ্গে বলেছেন, উত্তরপাড়া গ্রন্থাগারে তিনি যে বইটি দেখেছেন, তাতে প্রকাশকাল দেওয়া হয়েছে ১৮৩৩; পৃঃ ৩০৯

৮ পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ১৮৭

৯ যোগেশচন্দ্র বাগল। বাংলার নব্যসংস্কৃতি; ১৯৫৮, পৃঃ ৪-৭

১০ ঐ; পৃঃ ৪৩। বাংলার নব্যসংস্কৃতি গ্রন্থের ৪১-৪৯ পৃষ্ঠায় বঙ্গভাষানুবাদক সমাজ সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা আছে।

১১ ঐ; পৃঃ ৪৬

১২ সাহিত্যসাধক চরিতমালায় পৌষ-চৈত্র ১২৭৫, এবং পৌষ-চৈত্র ১২৭৬, দুই তারিখেরই উল্লেখ আছে। প্রথম খণ্ড। কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য অংশ, পৃঃ ২২

১৩ রবীন্দ্র রচনাবলী, জন্মশতবার্ষিকী সংস্করণ; ১০ম খণ্ড, পৃঃ ৫৫

১৪ National Library, *Index Translationum Indicarum*; 1963, pp. 7-55

১৫ পূর্বোক্ত গ্রন্থের পরিশিষ্টে সন্নিবিষ্ট সারণী থেকে

১৬ এই সারণী জাতীয় গ্রন্থাগারের শ্রীবিজয়ানন্দ সেনগুপ্তের সৌজন্যে প্রাপ্ত।

১৭ UNESCO, *Index Translationum* No. 26 (Entries for the year 1963) pp. 438-451

১৮ এই অধ্যায়ে পরিবেশিত যাবতীয় তথ্যই বাণী বসু সঙ্কলিত 'বাংলা শিশুসাহিত্য: গ্রন্থপঞ্জী' পুস্তক থেকে সংগৃহীত। প্রকাশ করেছেন বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, ১৩৭২ সালে।

কলকাতায় শেক্সপীয়র

আধুনিক কালের বিদগ্ধ ভারতীয়ের মানস-সংগঠনে শেক্সপীয়রের প্রভাব তর্কাতীত। সে প্রভাবের শুধুই আংশিক স্বীকৃত ও নির্দেশ্য, কিন্তু বৃহৎ ভাগ আমাদের নির্জ্ঞান মনের, শোণিতের, অন্তর্গত হয়ে ব্যক্তিত্বে সংমিশ্রিত; মনন-চিন্তায় কতটা কোন্ নির্দিষ্ট ভঙ্গিতে শেক্সপীয়র অস্তিত্বশীল, কোথায় নয়, তা সম্ভবত কোন ভাবেই নির্ধারণ করা সম্ভব নয়। তবে, আমাদের নিশ্বাসবায়ুর মতই যে সে প্রভাব সত্য সে বিষয়েও কোন প্রশ্ন চলে না। বিগত শতাব্দীর মধ্যভাগে স্কুল-কলেজ ও পরবর্তীকালে বিশ্ববিদ্যালয়ের পঠন-পাঠন এবং নাট্য-মঞ্চে শেক্সপীয়রের নাটকের রসাস্বাদনের মাধ্যমে শেক্সপীয়র শিক্ষিত ভারতীয়ের অন্তর জয় করেন, সে বিজয়ে তিনি প্রতিদ্বন্দ্বীহীন। 'বঙ্গদর্শন'-এর নিবন্ধাদি ও পুস্তক সমালোচনার পাতায় পাতায় শেক্সপীয়র, তত্ত্বমীমাংসায় শেক্সপীয়র, এমন কি নারীত্বের আদর্শের বিশ্লেষণেও শেক্সপীয়র! তা থেকেই অনুমেয়, আমাদের চিন্তায় অভ্যাসে শেক্সপীয়রের প্রতিক্রিয়া কী ব্যাপক কী গভীর! কিন্তু, সব আরম্ভেরই আরম্ভ থাকে, তেমনি শেক্সপীয়র-তন্ময়তারও আরম্ভ ছিল। সেই আরম্ভর কারণ অন্বেষণে আমাদের অষ্টাদশ শতকের শেষার্ধের নির্মীয়মান কলকাতায় তৎকালীন ইংরেজ ব্যবসায়ী ও রাজ-পুরুষদের সাংস্কৃতিক জীবনের কিঞ্চিৎ পরিচয় গ্রহণ করতে হবে। বাংলার রূপান্তরিত সংস্কৃতির যাঁরা ছিলেন নায়ক তাঁরা তখনও অনাবির্ভূত। তাঁদের পূর্বপুরুষগণ সম্ভবত তখন ইংরেজ-সান্নিধ্যে সবে 'লাউ-পাম্পকিন, শশা—কিউকম্বার' পাঠ গ্রহণ করতে সুরু করেছেন। এবং তারই অন্তরালে, সংগোপনে, একটি শেক্সপীয়র-পরিবেশ সৃষ্টি হয়ে চলছিল। সেই আদিপর্বের কয়েকটি মনোরম চিত্র ও গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ বর্তমান নিবন্ধে পরিবেশন করা হয়েছে।

রামপ্রসাদের একটি গীতিকবিতায় 'ডিক্রী' এই ইংরেজী শব্দটি সর্বপ্রথম ব্যবহৃত হয়। কিন্তু শেক্সপীয়র কলকাতায় আবেশ বিহ্বল ও অস্থির জীবনে অনুপ্রবেশ করেন তারও আগে; ১৭৬৭ সনে কোম্পানীর কর্মচারীদের বীভৎস লালসা ও দুর্নীতিতে বিক্ষুব্ধ হয়ে ক্লাইভ আক্ষেপ করে লিখেছিলেন, 'হায়, ইংরেজ নাম কী কলঙ্কেই না নিমজ্জিত হয়েছে!' আশ্চর্য, তার আগেই বিলিতি নাট্যসম্প্রদায় কলকাতায় অন্যান্য নাটকের সঙ্গে শেক্সপীয়রের নাটকও

অভিনয় করেছেন বলে অনুমিত হয়েছে। তৎকালে সংবাদপত্রের অস্তিত্ব ছিল না; থাকলে হয়ত সে সব অভিনয়ের সংবাদ আজকের গবেষক আবিষ্কার করতে পারতেন। বাংলা তথা ভারতবর্ষের সর্বপ্রথম সংবাদপত্র হিকি'র 'বেঙ্গল গেজেট' প্রতিষ্ঠিত হয় ১৭৮০ খৃষ্টাব্দে, প্রকাশের প্রথম বৎসরেই কয়েকবার আমরা শেক্সপীয়র অথবা তাঁর নাটকের বিজ্ঞাপন ইত্যাদির উল্লেখ দেখতে পাই। এই সাপ্তাহিক পত্রিকাটির ৯ ১৬ই ডিসেম্বর, ১৭৮০, সংখ্যায় 'শেক্সপীয়রের ওথেলো নাটকে ইংরেজ চরিত্রের বিবরণ' শীর্ষক একটি সম্পাদকীয় মন্তব্যে ইয়াগো-ক্যাসিও সংলাপের কিয়দংশ উদ্ধৃত হয়। মনে হয়, উদ্ধৃত অংশটি পরবর্তীকালে শেক্সপীয়র সম্পাদকদের অপছন্দের হেতু হয়ে দাঁড়ায়; কারণ, ইদানীং কালের কয়েকটি জনপ্রিয় সংস্করণে সংশ্লিষ্ট অংশটুকু বর্জিত হয়েছে। যাই হোক, এই উদ্ধৃতি প্রকাশের পক্ষকালের মধ্যে কলকাতায় ওথেলো নাটকের আসন্ন অভিনয় সম্পর্কে অত্যন্ত কৌতুকাবহ ও সরস একটি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। ঐ বিজ্ঞপ্তির অংশবিশেষ নিম্নরূপ:

"............Mr. Soubise will appear on that night in the Character of Othello.........The part of Iago will be attempted by the Author of the Monitor, and *desdemona* (sic) by Mr. H.—, a gentleman of *doubtful Gender*." (23rd—30th Dec. 1780)

মাস তিনেক বাদে, ১৭৮১ সনের মার্চ মাসে জনৈক পত্রলেখক 'বেঙ্গল গেজেট'-এর সম্পাদকের নিকট একটি সুদীর্ঘ পত্র প্রেরণ করেন: পত্রান্তে স্বাক্ষর ছিল 'সি. ডি.'। এই পত্রে লেখক পত্রের প্রথমাংশে তৎকালীন লণ্ডনে প্রচলিত একটি বক্রোক্তির কিঞ্চিৎ রূপান্তর সাধন করেন (ঐ বক্রোক্তিটি লণ্ডনের দুটি থিয়েটারে 'রোমিও ও জুলিয়েট'-এর যুগপৎ অসামান্য অভিনয়-সাফল্যে চালু হয়েছিল) এবং পরিহাসচ্ছলে পারস্যের কবি হাফেজকে এই বিবরণের মধ্যে টেনে এনে প্রায় শেক্সপীয়রীয় কৌতুক হাস্যের অবতারণা করেন। হাফেজের বিনিময়ে এই অভাবনীয় মজা লুঠে নেওয়ার পর তিনি শেক্সপীয়রের নিরানব্বই সংখ্যক সনেটটি (The forward Violet thus I did chide) সম্পূর্ণ উদ্ধার করেন, এবং এই সনেটে বর্ণিত নারী সৌন্দর্যের সঙ্গে পরবর্তী কালের কোন এক কবির অনুরূপ বর্ণনার তুলনামূলক বিচার করেন। এই বিচারে পত্র-রচয়িতার এই উদ্দেশ্যই প্রকট ছিল যে, শেক্সপীয়রের কবি-কৃতির সহিত পরবর্তীকালের সর্বশ্রেষ্ঠ কবিকৃতির তুলনা যেমন অবাস্তব 'তেমনি

অসম্ভব। কেননা এলিজাবেথীয় যুগের কোকিল-কণ্ঠ অনন্যসাধারণ। পত্রশেষে তিনি সম্পাদকের সুচিন্তিত রায় প্রার্থনা করেছেন কে শ্রেষ্ঠ এই জিজ্ঞাসার এবং লিখেছেন এই রায়ে শুধু ব্যক্তিবিশেষের নয় পত্রিকার সহস্রাধিক পাঠকের ধন্যবাদের কারণ হবে। কিন্তু আক্ষেপের বিষয়, পত্রলেখক শেক্সপীয়রের কাব্যের সহিত তুলনায় ধন্য কবির নামোল্লেখে বিরত থেকেছেন।

১৭৮১ সনের ১লা—৮ই ডিসেম্বর সপ্তাহের সংখ্যায় 'বেঙ্গল গেজেট' পুনরায় শেক্সপীয়রের নামোল্লেখ করেছেন। এবারে প্রায় প্রবাদতুল্য স্কচ্ম্যানকে উপহাসে-বিদ্রূপে ছিন্নভিন্ন করার জন্য। আর, পৃথিবীতে এমন কে আছে যে যখন-তখন অপমানিত, ধিক্কৃত হওয়ার যে অধিকার ইংরেজরা স্কচ্ম্যানের উপর চাপিয়ে দিয়েছে তার অভিব্যক্তিতে পুলকিত না হয়! আলোচ্য কটাক্ষের উপস্থিত উৎস হলেন জনৈক স্কচ্ম্যান যিনি জন্মগত আত্মম্ভরিতার চেতনায় একটি অপরূপ রূপকর্মের রসাস্বাদন করতে পারেন নি। তার অক্ষমতার প্রয়োজনীয় বিশ্লেষণের পর নিবন্ধকার ম্যাক্‌বেথের অবিস্মরণীয় উক্তির সাহায্যে স্কচ্ম্যানের জবাব দিচ্ছেন:

It is a Tale.

Told by an Idiot, full of sound

Spite and fury, signifying No-Thing.

লক্ষ্য করার বিষয়, এই মন্তব্যে মূল থেকে একটি অতিরিক্ত শব্দ—'স্পাইট'—সংযোজিত হয়েছে; তাতে কটাক্ষ যেমন আশাতিরিক্ত শাণিত হয়েছে, তেমনি ইংরেজ-স্কচ্ পারস্পরিক বিদ্বেষের সহানুভূতিহীন ভুবনটিও আমাদের অনুভবে সত্য হয়ে উঠেছে।

১৭৮২ খৃষ্টাব্দে হিকি তাঁর 'বেঙ্গল গেজেট' বন্ধ করে দেন, কিন্তু, কলকাতার নাট্যরসিক মহলে শেক্সপীয়র শ্রদ্ধা-মমতা-ভালবাসায় প্রতিষ্ঠিত হতে থাকেন; অবশ্য, শেক্সপীয়র অনুরাগের বিবর্তনধারার প্রতিটি সূত্র সম্ভবত আবিষ্কার করা দুরূহ। ১৭৮৪ সনের ২৩শে অক্টোবর আশাতীত মঞ্চ সাফল্যের সহিত 'রোমিও ও জুলিয়েট' অভিনীত হয়, 'মার্চেণ্ট অফ ভেনিস' পরবর্তী ১৮ই অক্টোবরে; আর, 'ক্যালকাটা গেজেট'-এ ১১ই নভেম্বরে প্রকাশিত একটি সংবাদে জানা যায় পরবর্তী সপ্তাহে 'হ্যামলেট' মঞ্চস্থ হয়েছিল। এসব বিবরণ কলকাতা-প্রবাসী ইংরেজ রাজপুরুষ, কোম্পানীর কর্মচারী এবং অন্যান্য ব্যবসায়ে লিপ্ত ব্যক্তিদের মধ্যে শেক্সপীয়রের জনপ্রিয়তার উজ্জ্বল স্বাক্ষর। ১৭৮৫ সনের

২৪শে ফেব্রুয়ারী 'ক্যালকাটা গেজেট' পত্রের প্রতিষ্ঠা-বার্ষিকী উদ্‌যাপিত হয়। এ উপলক্ষে পত্রিকায় একটি বিশেষ সম্পাদকীয় নিবন্ধ মুদ্রিত হয়; তাতে অভিনেতাদের নিকট প্রদত্ত হ্যামলেটের অবিস্মরণীয় বক্তৃতার খানিকটা উদ্ধার করে সম্পাদক-মণ্ডলী পাঠকবর্গকে তাঁদের আপন দায়িত্ব ও নীতিবোধ সম্পর্কে সজাগ করেন। উদ্ধৃত অংশটি এই :

"To hold the mirror up to nature; to show virtue her own feature, scorn her own image, and the very age and body of the time his form and pressure."

তার পরের দু'চার বছর বোধ হয় শেক্সপীয়রীয় নাটকের তেমন কোন অভিনয় অনুষ্ঠিত হয়নি। কারণ ১৭৮৬ সনের ৭ই ডিসেম্বর তারিখে 'ক্যালকাটা গেজেট' 'ক্রিটিক' নামক একটি নাটকের অভিনয়ের সমালোচনায় সবিনয়ে প্রযোজকদের উদ্দেশ্যে লিখেছেন, হ্যামলেট, ম্যাকবেথ ইত্যাদি ট্র্যাজেডির স্থান জনমানসে অতিশয় উচ্চে; সুতরাং শীতকালীন মরশুম উত্তীর্ণ হওয়ার পূর্বেই তাঁরা যেন জনহিতার্থে ঐসব ট্র্যাজেডি অভিনয়ের ব্যবস্থা করেন। যাই হোক, ১৭৮৮ জানুয়ারীতে 'যোগ্য জাঁক ও সফলতার' সহিত 'তৃতীয় রিচার্ড' নাটকের অভিনয় হয়; এবং ঐ বৎসরই ১৭শে নভেম্বরে পুনরায় 'মার্চেন্ট অফ্ ভেনিস' মঞ্চে ফিরে আসে। দ্বিতীয় নাটকটি উচ্চ মূল্যাভিষিক্ত ও অভিজাত দর্শকমণ্ডলীর সম্মুখে অভিনীত হয়েছিল, এবং বিবিধ চরিত্রের রূপায়ণও হয়েছিল 'যথাযথ ও শক্তিদৃপ্ত' এবং 'কমনীয় ও মনোরম।'

অষ্টাদশ শতকের শেষ দশকটিতে শেক্সপীয়রের নাটকের অভিনয়-সংক্রান্ত কোন উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায় না। মনে হয়, জনমানস তাঁর কবি-কল্পনার ঐন্দ্রজালিক সম্মোহ এবং একই ব্যক্তির মানস-সংঘাতে বিশ্বজাগতিক সংঘাতের তন্ময় রূপায়ণ অপেক্ষা তরল চপল হাস্যরস ইত্যাদিতে মশগুল ছিল। তবে, কলকাতার থিয়েটার-অনুরাগী জনতা এবং প্রযোজক-ব্যবস্থাপকগোষ্ঠি কেউই যে শেক্সপীয়রকে বিস্মৃত হন নি, তার প্রমাণ বর্তমান। ১৭৯৮ সনের এপ্রিল-সংখ্যা 'দি ক্যালকাটা মান্থ্‌লি জার্নালে' এই মর্মে একটি সংবাদ প্রকাশিত হয়—গত মাসের ২৫শে তারিখ, রবিবার সন্ধ্যাবেলা, ধর্মতলার কোণে অবস্থিত শেক্সপীয়র বাজারে এক বিধ্বংসী আগুনে প্রভূত ক্ষতি হয়। কতকগুলো কুটির ভস্মীভূত হয়, এবং বিস্তর সম্পত্তিও নষ্ট হয়।

এই সংবাদটি থেকে এ সিদ্ধান্ত অপরিহার্য যে, ধর্মতলার কোণে আশেপাশের

থিয়েটার কোম্পানী অথবা থিয়েটারের সহিত সংযুক্ত লোকদের সুবিধার জন্য একটি বাজার গজিয়ে ওঠে; এবং কোন রসিক আনন্দের অতিশয়তায় এর নামকরণ করেন 'শেক্সপীয়র বাজার', যিনি হৈ-হুল্লোড় যেমন পছন্দ করতেন তেমনি বোধ করি ভালবাসতেন শেক্সপীয়রকেও। কিন্তু, হায়, স্ফূর্তি আর প্রেম আমাদের জীবনে শুধুই এক পলাতক স্মৃতি; তাই, ঐ বাজারটি সম্পর্কে আর কোন সংবাদ অজ্ঞাত। সম্ভবত, যেমনি অকস্মাৎ এর গজিয়ে-ওঠা তেমনি আকস্মিক এর মিলিয়ে-যাওয়া।

আরও একটি সংবাদে দেখতে পাচ্ছি, মরিস নামক জনৈক চিত্রকার ক্যালকাটা থিয়েটারের জন্য একটি নতুন প্রাচীর নির্মাণ করেন। তাতে লণ্ডনের টেম্‌স্ নদীর তীরে অবস্থিত অমর নট গ্যারিকের মনোরম বাসভবনটি তার পরিবেশসহ বিচিত্রিত হয়। তাঁর বাসভবনের অদূরে গ্যারিক শেক্সপীয়রের একটি মর্মর মূর্তি স্থাপন করেছিলেন, এবং প্রতিনিয়ত তিনি ঐ মর্মর মূর্তির পাদদেশে তাঁর শ্রদ্ধার্ঘ নিবেদন করতেন! গ্যারিকের বাসভবন, এবং ঐ মূর্তিসহ সমগ্র দৃশ্যপটটি মরিস পূর্বোক্ত প্রাচীরে পুনরুজ্জীবিত করেন। আগুনে এই থিয়েটার ভবনটিও পরবর্তীকালে বিনষ্ট হয়। যাই হোক, কলকাতায় শেক্সপীয়র পরিবেশ সৃষ্টিতে এই রূপকর্মের অবদানও স্বীকার্য। ঐ সংবাদটি মন্তব্যসহ 'ক্যালকাটা মান্‌থ্‌লি জারনাল'-এর ১৭৯৮ সনে নভেম্বরে প্রকাশিত হয়।

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদে পরিপূর্ণ প্রেক্ষাগৃহে এবং জনতার স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দোল্লাসের মধ্যে শেক্সপীয়রের বেশ কয়েকটি নাটক অভিনীত হয়। এগুলোর মধ্যে রয়েছে 'ক্যাথারিন ও প্যাট্রুকশিও'। ('দি টেইমিং অফ্ দি শ্রু' নাটকের গ্যারিক-কৃত রূপান্তর), হেনরি দি ফোর্থ, হেনরি দি ফিফ্‌থ, ম্যাকবেথ, রিচার্ড দি থার্ড, ইত্যাদি। এসব অভিনয় ঐ শতকের মধ্যভাগে অধিকতর জাঁক-জমক, উচ্ছ্বাস কলকোলাহল ও উদ্দীপনার মধ্যে অভিনীত নাটকগুলোর নান্দীমুখ মাত্র। এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়, অষ্টাদশ থেকে ঊনবিংশ শতাব্দীতে পদচারণার মধ্য দিয়ে থিয়েটার-উৎসাহী জনতা অতিশয় স্ফীত হতে আরম্ভ করে, এবং ইংরেজ দর্শকদের সঙ্গে তাঁদের দেশীয় সহচরগণও থিয়েটারে যাতায়াত আরম্ভ করেন। ফলে, বৃহত্তর সামাজিক ও ব্যক্তিক পরিবেশে শেক্সপীয়র আলোচিত ও আস্বাদিত হয়ে চলেছেন। ঐ পরিবেশ কালান্তরের সঙ্গে সঙ্গে বিস্তৃততর হয়েছে, এবং দেশীয় বুদ্ধিজীবীর আবির্ভাবের সহায়ক হয়েছে।

আমরা এই নান্দীমুখের যবনিকা টানব একটি অপরূপ নাট্যানুষ্ঠানের প্রসঙ্গ উল্লেখে। এই মজার দৃশ্যটি তদানীন্তন গভর্ণর-জেনারেল আমহার্স্ট ও তদীয় পত্নীর সম্মানার্থে স্যার চার্লস মেটকাফ্ প্রদত্ত ভোজসভায় (২১শে ডিসেম্বর, ১৮২৭) পরিদৃষ্ট হয়। সেই অনুষ্ঠানে কলকাতার অভিজাত-সমাজের চার শতাধিক নর-নারী উপস্থিত ছিলেন; সেখানে যেমন ছিলেন রূপসী তিলোত্তমার দল, তেমনি ছিলেন অশেষ গুণবান সুভদ্র পুরুষেরা। ভোজসভার কাজ চলতে থাকার মধ্যে সেখানে শেক্সপীয়রের বিভিন্ন নাটকের বিভিন্ন চরিত্রের রূপসজ্জায় সজ্জিত একদল আগন্তুক অকস্মাৎ উপস্থিত হন। এই আগন্তুক বাহিনীর পুরোভাগে প্রস্‌পেরো, এবং সর্বশেষে ডগ্‌বেরী (মাচ্ এডো এবাউট নাথিং)। গভর্ণর-জেনারেল যে শোভন অথচ বর্ণাঢ্য মঞ্চে উপবিষ্ট ছিলেন তার কাছাকাছি পৌঁছে দলনেতা প্রস্‌পেরো (টেম্‌পেষ্ট) একটি সময়োপযোগী বক্তৃতা দেন, এবং তারপর ঐ কৌতুক মিছিলের সদস্যগণ এলোমেলো ভাবে ছড়িয়ে পড়েন, এবং কালবিচারে নানাবিধ অসঙ্গতির চিত্র দর্শকমণ্ডলীকে উপহার দেন। যেমন দেখা গেল, ফলস্টাফ অতিশয় কুলীন পরিবারের এক রূপসীকে নিয়ে উধাও হয়েছে; হ্যামলেটের পিতার প্রেতাত্মা পরীদের রাণী টাইটানিয়ার (মিড সামার নাইটস্ ড্রিম) সঙ্গে সংলাপে মশগুল—অকস্মাৎ সেখানে গর্দভরূপী বটমের আবির্ভাব, এবং গর্দভীয় সঙ্গীতে ঐ আলাপনে সম্মতি জানিয়ে তার তিরোধান; শাইলককে (মার্চেণ্ট অফ ভেনিস) দেখা গেল, তার চুক্তির কথা বেমালুম বিস্মৃত হয়ে সে তার পূর্বপরিচিত একটি তরুণীর সঙ্গে মধুর আলাপে নিমগ্ন; অষ্টম হেনরিকে দেখা গেল চতুর্থ হেনরীর আমলের লেডি পার্সির সঙ্গে আলাপে রত; অষ্টম হেনরির আমলের আনা বুলেন 'মেরি ওয়াইভস্ অফ উইণ্ডসর' নাটকের ফরাসী ডাক্তার কাইয়ুস-এর সঙ্গে কথাবার্তা বলছেন; আর বুঝা গেল 'মিড সামার' নাটকের পরীরাজ ওবারনকে 'মাচ্ এডো' নাটকের ডগ্‌বেরির পেছনে ধাওয়া করতে দেখে তিনি বিন্দুমাত্রও বিচলিত নন; আর সেই উদ্ধত কার্ডিনাল ওলসি (অষ্টম হেনরি নাটক) কিনা একজন তুচ্ছাতিতুচ্ছ ভাঁড়ের সঙ্গে কথা বলছেন! (The Good Old Days of Hon. John Company—Carey, P. 124-5) এই অভূতপূর্ব সমাবেশ এবং পরিকল্পনার অপরূপ দৃশ্যপট যে প্রচুর হাসি, আনন্দ ও পরিহাসের উপকরণ যুগিয়েছিল তা বলাই বাহুল্য।

সে কালের কলকাতা প্রবাসী ইওরোপীয়দের সামাজিক উৎসব-অনুষ্ঠান,

সাংস্কৃতিক কর্ম ইত্যাদির কয়েকটি মাত্র উল্লেখিত হলো। এই সমস্ত অভিনয় ও অনুষ্ঠানের মাধ্যমেই শেক্সপীয়রের কল্পনার ভুবন, নাট্যায়িত পৃথিবীর অপার সুষমা কলকাতার দর্শকমণ্ডলীর অনুভবে সত্য হয়ে উঠেছিল, তাঁরা অবাক বিস্ময়ে তাতে বিমোহিত হয়েছেন, অবগাহন করেছেন, এবং এক আনন্দিত জগতের সন্ধানলাভ করে পুলকিত হয়েছেন। অবশ্য স্বীকার্য, এই জনসমষ্টির অধিকাংশই ছিলেন শেক্সপীয়রের আপন fine breed of men কিন্তু, এঁদের আনন্দ কোলাহল, হাসি উচ্ছলতা এবং কৌতুক-পরিহাসের ভেতর দিয়েই কলকাতার বাঙালী বুদ্ধিজীবীর মধ্যে শেক্সপীয়র সম্পর্কে এক অনির্বাণ আগ্রহ জাগ্রত হয় এবং জাগরণের উপযুক্ত সাড়াও তাঁরা দেন অচিরেই—সমগ্র উনবিংশ শতাব্দী তার উজ্জ্বল স্বাক্ষর বহন করছে।